খিলাফত ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

(শাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা)

হিযবুত তাহ্রীর

খিলাফত ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

(শাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা)

বইটি হিযবুত তাহ্‌রীর কর্তৃক
প্রণীত এবং প্রকাশিত

(‘আজহিযাহ্‌ দাউলাহ্‌ আল-খিলাফাহ্‌’ বইয়ের বাংলায় অনুবাদকৃত প্রথম ড্রাফট)

সূচীপত্র

মুখবন্ধ **০৫**

ভূমিকা **০৭**

০১. খলীফা **১৪**

পদবি ১৪

খলীফা হওয়ার শর্তাবলী ১৫

অবশ্য পূরণীয় শর্তসমূহ ১৫

পছন্দনীয় শর্তাবলী ১৭

খলীফা নিয়োগ করার প্রক্রিয়া ১৮

খলীফা নিয়োগ করা ও বাই'আত প্রদানের জন্য গৃহীত বাস্তব পদক্ষেপসমূহ ১৯

অন্তর্বর্তীকালীন আমীর ২০

মনোনীতদের তালিকা সংক্ষেপন ২২

বাই'আতের প্রক্রিয়া ২৫

খিলাফতের ঐক্য ২৬

খলীফার নির্বাহী ক্ষমতাসমূহ ২৭

খলীফা শারী'আহ্'র বিধান দিয়ে আইন গ্রহণে বাধ্য ৩১

খিলাফত কোন যাজকতন্ত্র বা মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয় ৩২

খলীফার মেয়াদকাল ৩৪

খলীফার অপসারণ ৩৫

খলীফা নির্বাচনে মুসলিমদের জন্য বরাদ্দকৃত সময়কাল ৩৫

০২. খলীফার প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী বা ডেপুটি (মু'ওয়ায়ীন আত তাফউয়ীদ - Delegated Assistants) **৩৮**

প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী হবার শর্ত ৪০

প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর দায়িত্ব ৪১

প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর নিয়োগ ও অপসারণ ৪৩

০৩. নির্বাহী সহকারীগণ (মু'ওয়ায়ীন আত তানফীদ - Executive Assistants) **৪৪**

০৪. ওয়ালী বা গভর্ণরবৃন্দ (উ'লাহ্) **৫০**

খলীফাকে ওয়ালীদের কাজ নিয়মিত তদন্ত করে দেখতে হবে ৫২

০৫. জিহাদ **৫৪**

সেনাবাহিনী ৫৪

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ৫৫

শিল্প ৫৬

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ৫৭

আমীর-উল-জিহাদ (যুদ্ধ বিভাগ) **৫৮**

সেনাবাহিনীর বিভাগসমূহ ৬০

খলীফা সেনাবাহিনীর প্রধান ৬১

০৬. আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ **৬৩**

০৭. পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ **৭০**

০৮. শিল্প বিভাগ **৭১**

০৯. বিচার বিভাগ **৭৩**

বিচারকদের প্রকারভেদ ৭৪

বিচারকের যোগ্যতার শর্তাবলী ৭৬

বিচারক নিয়োগ ৭৬

বিচারকদের সম্মানি ভাতা ৭৬

ট্রাইবুনাল গঠন ৭৭

মুহ্‌তাসিব ৮০

মুহ্‌তাসিবের আবশ্যিক ক্ষমতা ৮০

মাযালিমের বিচারক ৮১

মাযালিমের বিচারক নিয়োগ ও অপসারণ ৮২

মাযালিমের বিচারকের আবশ্যিক ক্ষমতা ৮৩

খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেকার চুক্তি, লেনদেন ও বিচারিক রায় ৮৪

১০. প্রশাসনিক ব্যবস্থা (জনকল্যাণ বিভাগ) **৮৬**

প্রশাসনিক ব্যবস্থা আর শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক নয় ৮৮

প্রশাসনিক নীতি ৮৯

প্রশাসনিক বিভাগে কাজের যোগ্যতা ৯০

১১. বাইতুল মাল **৯১**

খলীফা বাইতুল মালের আয়-ব্যয় তত্ত্বাবধান করেন ৯২

১২. তথ্য বিভাগ (আল ই'লাম) **৯৭**

প্রচারমাধ্যম সমূহের অনুমোদন প্রাপ্তি ৯৯

রাষ্ট্রের তথ্য নীতি ৯৯

১৩. মাজলিস আল উম্মাহ্ – উম্মাহ্'র কাউন্সিল (শূরা ও জবাবদিহিতা) **১০০**

শূরার অধিকার ১০০

জবাবদিহিতার অধিকার ১০১

উম্মাহ্'র কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন ১০২

উম্মাহ্'র কাউন্সিল নির্বাচন পদ্ধতি ১০৩

উম্মাহ্'র কাউন্সিলের সদস্যপদ ১০৪

উম্মাহ্'র কাউন্সিলের সদস্যপদের মেয়াদকাল ১০৫

উম্মাহ্'র কাউন্সিলের আবশ্যিক ক্ষমতাসমূহ ১০৬

নির্বিঘ্নে মতামত উপস্থাপন ও প্রকাশ করার অধিকার ১১২

১৪. খিলাফত রাষ্ট্রের পতাকা ও ব্যানার **১১৫**

১৫. খিলাফতের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত **১১৮**

بسم الله الرحمن الرحيم

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এবং দুরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), তাঁর পরিবার, সাহাবীগণ (রা.) এবং পরবর্তীযুগের অনুসারীদের প্রতি।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন :

"তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসেক।" **[সূরা আন-নূর : ৫৫]**

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ

"তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তারপর আল্লাহ্ তার সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তারও সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর আসবে যন্ত্রণাদায়ক বংশের শাসন, তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। এক সময় আল্লাহ্'র ইচ্ছায় এরও অবসান ঘটবে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। তারপর তিনি তা অপসারণ করবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত – নবুয়্যতের আদলে।" *(মুসনাদে আহমদ, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা-২৭৩, হাদীস নং-১৮৫৯৬)*

আমরা, ***হিযবুত তাহ্রীর***-এর সদস্যগণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেয়া এ প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করি এবং সেইসাথে বিশ্বাস করি, রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে যে সুসংবাদ দিয়েছেন তার উপর। এ পৃথিবীর বুকে খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্কে সাথে নিয়ে এবং এই উম্মাহ্'র মধ্যে আমরা ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছি। লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত এবং সফলতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি যেন খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে সম্মানিত করেন এবং আমাদেরকে খিলাফত রাষ্ট্রের অকুতোভয় সৈনিকে পরিণত করেন, যেন আমরা খিলাফতের পতাকা গৌরবের সাথে উত্তোলিত করতে পারি এবং এ পতাকাকে একের পর এক বিজয়ের দিকে ধাবিত করতে পারি। নিশ্চয়ই কৃত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য কোন কঠিন কাজ নয়।

বস্তুতঃ এই বইয়ের মাধ্যমে আমরা খিলাফত রাষ্ট্রের শাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার বাস্তব রূপরেখা মুসলিম উম্মাহ্'র কাছে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চেয়েছি – যাতে করে এটি মুসলিমদের খিলাফত রাষ্ট্রের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা দেয়। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, খিলাফত রাষ্ট্রের ব্যাপারে স্পষ্ট এ ধারণার মাধ্যমে মুসলিমদের হৃদয় যেন এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়, যাতে তারা খিলাফত রাষ্ট্রকে অন্তর দিয়ে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

প্রকৃতপক্ষে, এ বইটি রচনার পেছনে আমাদের মূল প্রেরণা হল, বর্তমান বিশ্বের শাসনব্যবস্থা সমূহ তাদের উৎস, ভিত্তি কিংবা কাঠামো কোনদিক থেকেই ইসলামী শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়া, মুসলিম উম্মাহ্'র কাছে এটি স্পষ্ট যে, বর্তমান শাসনব্যবস্থাসমূহ আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাব, রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ ও ইসলামী শারী'আহ্'র অন্যান্য বৈধ উৎস থেকে উৎসারিত নয়। শুধু তাই নয়, মুসলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই যে বর্তমানে প্রচলিত এসকল ব্যবস্থা ইসলামী আক্বীদাহ্'র সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

মূলতঃ যে বিষয়ে মুসলিমরা বিভ্রান্ত হন তা হল, প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে বর্তমানে বাস্তবায়িত শাসনব্যবস্থা সমূহের গঠন প্রণালী ইসলামী শাসনব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কি না। আর, এ কারণেই তারা মন্ত্রী পরিষদ ও বিভিন্ন মন্ত্রনালয় দিয়ে পরিচালিত ইসলাম বহির্ভূত মানবরচিত ব্যবস্থাগুলোর মতোই বিভিন্ন মন্ত্রী ও মন্ত্রনালয়ের অস্তিত্বকে অবলীলায় স্বীকার করে

নেন। এ বইয়ে খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ (Structure and Institutions) নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যেন এ পৃথিবীতে খিলাফত রাষ্ট্র পুণরায় আবির্ভূত হবার আগেই মুসলিমদের অন্তরে এ রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরী হয়, ইনশা'আল্লাহ্।

এ বইয়ে আমরা খিলাফত রাষ্ট্রের পতাকা ও ব্যানার ব্যবহারের বিষয়টিকেও অন্তর্ভূক্ত করেছি। এছাড়া, অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে যা নিয়ে এ বইয়ে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিনি। ইন্‌শা'আল্লাহ্, সেগুলো নির্ধারিত সময়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে খলীফা নির্বাচন পদ্ধতি, খলীফার বাই'আত বা শপথে উচ্চারিত শব্দসমূহ, খলীফা বন্দী হলে অন্তর্বর্তীকালীন আমীরের আবশ্যিক ক্ষমতাসমূহ, উলাই'য়াহ্ বা প্রদেশসমূহের পুলিশ প্রশাসন গঠন ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগে নারীপুলিশ সদস্যের নিয়োগ, উলাই'য়াহ্ প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচন করার প্রক্রিয়া, মাজলিস আল উম্মাহ্'র প্রতিনিধি নির্বাচন করার প্রক্রিয়া, ইসলামী রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছানো (official state anthem) ইত্যাদি। অবশ্য এ বইয়ে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে নির্ধারিত স্থানে আমরা প্রয়োজনানুসারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি অতিসত্ত্বর আমাদের বিজয় দান করেন, আমাদের উপর তাঁর করুণা বর্ষণ করেন এবং সর্বোপরি, তাঁর সাহায্য ও রহমতের দ্বারা আমাদের সম্মানিত করেন – যেন মুসলিম উম্মাহ্ আবারও এ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ্ হিসেবে পরিগণিত হয়। সেইসাথে, প্রথমবার প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের আদলে এ বিশ্বে খিলাফত রাষ্ট্র আবারও প্রতিষ্ঠিত হয় – যেন এ রাষ্ট্র তার অধীকৃত সমগ্র অঞ্চল ও সীমানার সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বস্তুতঃ সেটাই হবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রদত্ত বিজয়ে মুসলিমদের চিত্ত আনন্দে উদ্ভাসিত হবে এবং এ বিজয়ের মাধ্যমেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের অন্তরকে প্রশান্ত করবেন।

পরিশেষে, আমরা শুধু সন্তুষ্টচিত্তে ও অকুণ্ঠভাবে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা করি, যিনি এ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।

ভূমিকা

খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন :

১. ইসলামে শাসনব্যবস্থা বলতে খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বুঝায়, যা এ মহাবিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত এবং যেখানে রাষ্ট্রের প্রধান, খলীফা মুসলিমদের বাই'আতের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এই বিষয়টির অকাট্য দলিল হচ্ছে আল্লাহ্'র কিতাব, রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ এবং সাহাবাদের (রা.) ইজ্মা (ঐক্যমত)।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন:

"অতএব, আপনি আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে তাদের মাঝে শাসন করুন এবং আপনার কাছে যে মহান সত্য এসেছে, তা পরিত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।" **[সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৮]**

তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন:

"অতএব, আপনি আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে তাদের মাঝে শাসন করুন, আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন; যেন তারা আপনার নিকট আল্লাহ্'র প্রেরিত কোন বিধান থেকে আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে।" **[সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৯]**

রাসূল (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত শাসন সংক্রান্ত এই নির্দেশনা তাঁর উম্মাহ্'র প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য। এর অর্থ হল উম্মাহ্কে অবশ্যই রাসূল (সাঃ) এর পরে এমন একজন শাসক নিযুক্ত করতে হবে যিনি আল্লাহ্'র কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। উসূল-উল-ফিকহ্ (Islamic Jurisprudence) এর নীতি অনুসারে এই আদেশের ভাষা অকাট্য (Decisive) যা থেকে বোঝা যায় যে, নির্দেশটি অবশ্য পালনীয় অর্থাৎ ফরয।

রাসূল (সাঃ) এর পর আল্লাহ্'র আইন দ্বারা মুসলিমদের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যাকে নিয়োগ করা হবে তিনিই খলীফা। একইভাবে সেই শাসন পদ্ধতির নাম হল খিলাফত। এছাড়া, এ ব্যাপারে আরও যে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা যায় তা হল, ইসলামী শারী'আহ্ অনুযায়ী আইনী শাস্তির বিধি-বিধান (হুদুদ) এবং অন্যান্য শারী'আহ্ আইন (আহ্কাম) বাস্তবায়ন করা মুসলিমদের জন্য ফরয। আর এটা সর্বজনবিদিত যে, একজন শাসক ছাড়া হুকুম-আহকাম বা শাস্তির বিধিবিধান কোনকিছুই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। হুকুম শারী'আহ্'র মূলনীতি অনুযায়ী কোন ফরয বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত সমূহ যেহেতু ফরয, সেহেতু ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কবার ব্যাপারে কর্তৃত্বশীল একজন শাসক নিযুক্ত করাও ফরয। এক্ষেত্রে, শাসক হলেন খলীফা এবং শাসন ব্যবস্থাটির নাম হল খিলাফত।

সুন্নাহ্ ভিত্তিক দলিল-প্রমাণের দিকে আমরা আলোকপাত করলে দেখতে পাই, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বলেছেন, "আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি,

"যে আনুগত্যের শপথ (বাই'আত) থেকে তার হাত ফিরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করবেন যে, ঐ ব্যক্তির পক্ষে কোন দলিল থাকবে না এবং যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, যখন তার কাঁধে কোন আনুগত্যের শপথ নেই, তবে তার মৃত্যু হবে জাহেলি যুগের মৃত্যু।" *(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৫১)*

রাসূল (সাঃ) প্রত্যেক মুসলিমের উপর বাই'আতের শপথকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। যে বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) ছাড়া মৃত্যুবরণ করে তিনি (সাঃ) তার মৃত্যুকে ইসলামপূর্ব অজ্ঞানতার (জাহেলিয়াতের) যুগের মৃত্যু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সাঃ) এর পরে কেবলমাত্র খলীফাকেই বাই'আত দেয়া যায়। যেহেতু হাদীসটি প্রত্যেক মুসলিমের কাঁধে বাই'আতের শপথ থাকাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, তাই একইসাথে এ হাদীসটি মুসলিমদের উপর একজন খলীফা নিযুক্ত করাকেও বাধ্যতামূলক করেছে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আল-আরাজ ও সেই সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"নিশ্চয়ই, ইমাম হচ্ছেন ঢাল স্বরূপ যার পেছনে থেকে মুসলিমরা যুদ্ধ করে এবং যার মাধ্যমে নিজেদেরকে রক্ষা করে।" *(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৪১)*

আবু হাজিমের বরাত দিয়ে ইমাম মুসলিম আরও বর্ণনা করেন যে, আমি আবু হুরায়রার সাথে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেছি এবং তাঁকে বলতে শুনেছি, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"বনী ইসরাইলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখন এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন তাঁর স্থলে অন্য নবী আসতেন, কিন্তু আমার পর আর কোনও নবী নেই। শীঘ্রই অনেক সংখ্যক খলীফা আসবেন। তাঁরা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন তখন আপনি আমাদের কী করতে আদেশ করেন? তিনি (সাঃ) বললেন, তোমরা একজনের পর একজনের বাই'আত পূর্ণ করবে, তাদের হক আদায় করবে। অবশ্যই আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদেরকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করবেন।" *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৩৪৫৫; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-৪৭৫০)*

প্রথম হাদীসে খলীফাকে ঢাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে 'ঢাল' শব্দটি নিরাপত্তা বা আত্মরক্ষার প্রতীক হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে। মূলতঃ এ হাদীসে ইমামকে 'ঢাল' হিসেবে বর্ণনা করে ইমামের উপস্থিতির বিষয়টিকে প্রশংসা করা হয়েছে এবং সেইসাথে, ইমামের উপস্থিতির ব্যাপারে অনুরোধ (তালাব) জানানো হয়েছে। হুকুম শারী'আহ্'র নীতি অনুযায়ী যখন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে এমন কোন কাজের ব্যাপারে অবহিত করেন যার সাথে তিরস্কার সূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন ধরে নেয়া হয় যে মুসলিমদের সে কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বিপরীতভাবে কুর'আনের কোনও আয়াত বা রাসূলের (সাঃ) কোনও হাদীসে যদি কোনও কোন কাজের ব্যাপারে প্রশংসা সূচক শব্দ উল্লেখিত হয়, তবে ধরে নেয়া হয় যে, মুসলিমদের সে কাজটি করতে উৎসাহিত বা আদেশ করা হয়েছে। আর, এ কাজটি যদি আল্লাহ্'র কোন আদেশ বাস্তবায়নের জন্য অবশ্য পালনীয় হয় কিংবা, এ কাজে অবহেলা প্রদর্শন করলে যদি আল্লাহ্'র কোন আদেশ লঙ্ঘিত হয়, তাহলে এটি অকাট্য আদেশ (Decisive Command) বা অবশ্য পালনীয় কাজ হিসাবে গৃহীত হয়। এই হাদীসগুলো থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে, মুসলিমদের বিভিন্ন বিষয় দেখাশুনার দায়িত্ব হচ্ছে খলীফাদের – যা কিনা প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের উপর একজন খলীফা নিয়োগ করার ব্যাপারটিকেই নির্দেশ করে। এছাড়া, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) মুসলিমদের খলীফার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং খলীফার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে কেউ তার সাথে বিরোধে লিপ্ত হলে তার সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা প্রকৃতঅর্থে একজন খলীফা নিয়োগ করার বাধ্যবাধকতা ও তার খিলাফতকে যুদ্ধের মাধ্যমে হলেও রক্ষা করারই একটি নির্দেশ। আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আল আস (রা.) হতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"যখন একজন ইমামের হাতে বাই'আত গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন তাকে যথাসাধ্য মান্য করবে, এমতাবস্থায় যদি কেউ তার সাথে বিরোধ করতে আসে (বাই'আত দাবি করে) তবে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করবে।" *(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৪৪)*

অতএব, খলীফার আনুগত্যের আদেশটি প্রকৃতপক্ষে একজন খলীফা নিয়োগ করার আদেশ, কারণ একজন খলীফা উপস্থিত না থাকলে খলীফাকে মান্য করার আদেশটি রহিত হয়ে যায়। আর, যারা খলীফার সাথে দ্বন্দে লিপ্ত হয় তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশটি মূলতঃ একজন খলীফার উপস্থিতির বাধ্যবাধকতার বিষয়ে বর্ধিত দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে।

আর সাহাবীদের ইজ্মার বিষয়ে বলা যায় যে, তাঁরা (রা.) রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পর তাঁর (সাঃ) উত্তরাধিকারী হিসেবে একজন খলীফা নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন। তাঁরা সকলেই আবু বকর (রা.) কে রাসূল (সাঃ) এর উত্তরাধিকারী হিসেবে এবং আবু বকর (রা.) এর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে উমর (রা.) কে নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে একইভাবে, তাঁরা উসমান (রা.) এর মৃত্যুর পর আলী (রা.) কে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে নিয়োগ করেন। মুসলিমদের উপর একজন খলীফা নিয়োগের ব্যাপারে সাহাবীদের (রা.) ঐক্যমত রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পরপরই খুব জোরালোভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আর, এ কারণেই তাঁরা (রা.) রাসূল (সাঃ) এর দাফনকার্য সম্পাদন করার চাইতেও খলীফা নিয়োগের বিষয়টিকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যদিও তাঁদের প্রত্যেকেরই এটা জানা ছিল যে, যে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর দাফনকার্য সম্পন্ন করা মুসলিমদের জন্য অবশ্য পালনীয় কাজ।

রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পর সাহাবাদের (রা.) উপর সর্বপ্রথম আল্লাহ'র রাসূল (সাঃ) এর দাফনকার্য সম্পন্ন করা ফরয ছিল; কিন্তু তা না করে তাঁরা (রা.) মুসলিমদের প্রথম খলীফা নির্বাচনে ব্যস্ত ছিলেন। অন্যান্য সাহাবারা (রা.) নীরব থেকে রাসূল (সাঃ) এর দাফন কার্য ২ রাত বিলম্ব করার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিলেন, যদিও তাঁদের আল্লাহ'র রাসূল (সাঃ) এর দাফন কার্য শীঘ্রই সম্পন্ন করার সুযোগ ও সামর্থ্য ছিল। রাসূল (সাঃ) সোমবার সকালের শেষার্ধে ইন্তেকাল করলেন। কিন্তু, সেদিন সমস্ত দিন, এমনকি রাতেও তাঁকে দাফন করা হল না। মঙ্গলবার রাতে, আবু বকর (রা.) কে বাই'আত দিয়ে

খলীফা নিযুক্ত করার পর, আল্লাহ'র রাসূল (সাঃ) এর দাফন কার্য সম্পন্ন করা হল। সুতরাং, রাসূল (সাঃ) এর দাফন দুই রাত্রি বিলম্বিত হয়েছিল এবং তাঁর দাফন কার্য সম্পাদন হবার পূর্বেই আবু বকর (রা.) কে বাই'আত দেয়া হয়েছিল।

সুতরাং, মৃতব্যক্তিকে দাফন না করে তার পূর্বে খলীফা নিয়োগে ব্যস্ত থাকার এই কাজটি সকল সাহাবাদের (রা.) সম্মিলিত ঐক্যমতের (ইজমা আস-সাহাবা) একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। যদি না মুসলিমদের উপর একজন খলীফা নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক হত এবং মৃতব্যক্তির দাফন কার্য হতে খলীফা নিয়োগের ব্যাপারটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হত, তবে সকল সাহাবীরা (রা.) সম্মিলিতভাবে এ বিষয়ে কখনোই ঐক্যমতে পৌঁছাতেন না।

এছাড়া, মুসলিমদের উপর একজন খলীফা নিয়োগ করা যে ফরয (বাধ্যতামূলক) এ ব্যাপারে সকল সাহাবাই (রা.) সারাজীবন সম্মতি প্রকাশ করেছেন। যদিও কাকে খলীফা নির্বাচিত করা হবে এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল; কিন্তু একজন খলীফা যে নিয়োগ করতে হবে এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোন মতবিরোধ ছিল না – হোক তা রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পর কিংবা খোলাফায়ে রাশেদীনদের মৃত্যুর পর। সুতরাং, খলীফা নিয়োগের ব্যাপারে সাহাবাদের (রা.) এই সম্মিলিত ঐক্যমত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মুসলিমদের উপর একজন খলীফা নিয়োগ করা ফরয বা বাধ্যতামূলক।

২. বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত যে শাসনব্যবস্থাগুলো আছে, এগুলো তাদের ভিত্তি, চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, মাপকাঠি, গঠন, এমনকি যে বিধিবিধান দিয়ে এ ব্যবস্থাগুলো তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করে এবং যে সংবিধান ও আইন-কানুনের মাধ্যমে এ ব্যবস্থাগুলো তাদের বিধিবিধানগুলো বাস্তবায়ন ও কার্যকর করে – এ সমস্ত দিক থেকেই ইসলামী শাসনব্যবস্থা (খিলাফত) থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

খিলাফতের শাসন কাঠামো রাজতান্ত্রিক নয়:

খিলাফত কোন রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয় কিংবা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণও নয়। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজপুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে বাদশাহ্ হয় যেখানে সাধারণ জনগণের বলার কিছু থাকে না। অন্যদিকে, খিলাফত শাসনব্যবস্থায় খলীফা নিয়োগ করার পদ্ধতি হল বাই'আত। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজা-বাদশাহ্দের জন্য রয়েছে বিশেষ সুবিধা, যে কারণে সে নিজেকে সকল আইনের উর্ধ্বে রাখতে পারে। কিছু রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাদশাহ্কে জাতির প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে সে রাজ্যের মালিক কিন্তু শাসক নয়। আবার কিছু রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সে মালিক এবং একইসাথে রাজ্যের শাসকও; যেখানে সে তার রাজ্য ও জনগণকে তার ইচ্ছামত শাসন করে। জনগণের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও দুঃশাসনের মাত্রা যত ভয়াবহ হোক না কেন, এদুটি ক্ষেত্রেই সে সকল প্রকার জবাবদিহিতার উর্ধ্বে। অপরদিকে, খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা খলীফাকে বিশেষ কোন অধিকার প্রদান করে না – যা তাকে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত জনগণের উপরে স্থান দেয়। না এ ব্যবস্থায় তিনি এমন কোন অধিকার প্রাপ্ত হন যাতে বিচার বিভাগের সামনে তাকে সাধারণ জনগণ থেকে আলাদা কোন মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া, রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত তিনি জাতির কাছে কোন প্রতীকও নন। বরং, তিনি শাসন ও কর্তৃত্বের দিক থেকে জনগণের একজন প্রতিনিধি। যার অর্থ হচ্ছে, উম্মাহ্ (জনগণ) তাকে নির্বাচিত করেছে এবং বাই'আতের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় নিয়োগ দিয়েছে, যেন তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন দিয়ে তাদের শাসন করেন। খলীফার সমস্ত কাজ, সিদ্ধান্ত এবং জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ দেখভাল করার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমারেখা দ্বারা নির্ধারিত।

খিলাফত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অনুরূপ নয়:

সাম্রাজ্যবাদ ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় জাতি ও বর্ণভেদে এ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষেরা শাসিত হয়েছে। যদিও এ অঞ্চলগুলো সবসময় একটি কেন্দ্রের সাথে যুক্ত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের জনগোষ্ঠীকে কখনও এক দৃষ্টিতে দেখে না। বরং, তারা শাসন, অর্থায়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবসময় কেন্দ্রকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

ইসলামী শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে এর অধীনস্থ সকল অঞ্চলের জনগণের মাঝে সমতা তৈরী করা। ইসলাম গোত্রবাদকে প্রত্যাখান করেছে এবং শারী'আহ্ আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার দিয়েছে ও সেইসাথে তাদের নাগরিক কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে ইসলাম অমুসলিমদেরকেও মুসলিমদের মতোই জবাবদিহিতার সম্মুখীন করেছে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে ইসলামী রাষ্ট্র সমান

নাগরিক সুবিধা প্রদান করেছে। বিপরীতভাবে, ইসলামী রাষ্ট্রের বাইরে বসবাসরত মুসলিমদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিক সুবিধা প্রদান থেকে বিরত থেকেছে। সকল নাগরিককে সমান অধিকার প্রদানের দিক থেকে ইসলামী শাসনব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো তাদের ক্ষমতাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ (Colony) স্থাপন করে সে অঞ্চলসমূহকে শোষণ করে কেন্দ্রকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে। অপরদিকে, খিলাফত রাষ্ট্র কখনই তার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহকে উপনিবেশ হিসেবে দেখে না এবং এ অঞ্চলগুলো থেকে ধনসম্পদ লুটপাট করে কেন্দ্রকেও সম্পদশালী করে না। বরং খিলাফত রাষ্ট্র সব অঞ্চলকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখে, তা কেন্দ্র থেকে যত দূরেই অবস্থিত হোক না কেন, কিংবা, সে অঞ্চলের মানুষ যে বর্ণেরই হোক না কেন। এ রাষ্ট্র প্রতিটি অঞ্চলকে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে এবং প্রতিটি অঞ্চলের জনগণ কেন্দ্রে বসবাসকারী নাগরিকের মতই সমান নাগরিক সুবিধা ভোগ করে। একই সাথে, এ রাষ্ট্র এর অধীনস্থ সকল অঞ্চলে একই শাসন কর্তৃত্ব, কাঠামো এবং আইন-কানুন প্রয়োগ করে।

খিলাফত ফেডারেল রাষ্ট্রও নয়:

খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা ফেডারেল রাষ্ট্রব্যবস্থার মতোও নয়, যেখানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করে এবং সাধারণ কিছু আইনকানুন দিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকে। প্রকৃত অর্থে, খিলাফত একটি ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা। যেখানে পশ্চিমের মারাকেশ পূর্বের খোরাসানের মতই সমান গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। আবার, আল ফায়ূম প্রদেশ কায়রোর মতই বিবেচিত হয় – যদিও বা এটা হয় ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী। এ রাষ্ট্রে সব অঞ্চলের জন্য সমানভাবে অর্থায়ন করা হবে, একইভাবে নির্ধারণ করা হবে বাজেট। প্রতিটি প্রদেশের জন্য ন্যায্যভাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন প্রদেশ হতে সংগৃহীত ট্যাক্স উক্ত প্রদেশের প্রয়োজনের দ্বিগুণ হয়, তাহলেও ঐ প্রদেশের প্রয়োজন অনুযায়ীই ব্যয় নির্ধারণ করা হবে, উক্ত প্রদেশ থেকে কতটুকু ট্রাক্স সংগৃহীত হল তার উপর নির্ভর করে নয়। আবার, অন্য কোন প্রদেশের সংগৃহীত ট্যাক্স যদি প্রয়োজনীয় ব্যয়ের চাইতে কম হয়, তাহলে সাধারণ বাজেট থেকে ঐ প্রদেশের ব্যয় মেটানো হবে; সে প্রদেশের ট্যাক্স যাই সংগৃহীত হোক না কেন।

খিলাফত প্রজাতান্ত্রিক (Republic) ব্যবস্থা নয়:

রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিষ্ঠুর আচরণের ফলস্বরূপ প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়, যেখানে রাজা-বাদশাহরা ছিল স্বাধীন, সার্বভৌম ও স্বেচ্ছাচারী এবং তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী রাজ্য ও জনগণকে শাসন করত। সুতরাং, রাজতন্ত্রে রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন। প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের কাছে সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব হস্তান্তরের চেষ্টা চালায়। ফলে, মানুষ আইন প্রণয়ন করতে শুরু করে এবং সেইসাথে, জনগণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোনকিছু অনুমোদন ও নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এ ব্যবস্থায় শাসন-কর্তৃত্ব বাস্তবিকভাবে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট, তার কেবিনেট বা মন্ত্রী পরিষদের হাতে ন্যস্ত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শাসন-কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রী ও তার কেবিনেটের হাতে অর্পণ করা হয় এবং এক্ষেত্রে, রাজা বা রাণীকে নেহায়েত প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

উপরে বর্ণিত প্রতিটি (প্রজাতান্ত্রিক) ব্যবস্থা থেকে ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামে মানুষের আইন তৈরির কোন অধিকার নেই। এ অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কোন ব্যাপারে অনুমতি প্রদান বা নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষমতা নেই। ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে মানুষকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা অত্যন্ত ভয়াবহ অপরাধ। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"তারা আল্লাহ্'র পরিবর্তে তাদের ধর্মযাজক ও সাধুদেরকে নিজেদের প্রভূ বানিয়ে নিয়েছে।" **[সূরা আত-তাওবা : ৩১]**

রাসূল (সাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, বনী ইসরাইলীরা তাদের ধর্মযাজক ও সাধুদের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছিল, যা তাদের কাছে প্রেরিত আল্লাহ্'র বিধানের বিপরীত ছিল। অর্থাৎ, তাদের ধর্মযাজকেরা যে কাজকে অনুমোদন দিত তারা তাই করতো, আর যার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতো তারা তা থেকে বিরত থাকতো। এটাই হচ্ছে আল্লাহ্'র পরিবর্তে তাদের (ধর্মযাজকদের) প্রভু হিসাবে মেনে নেয়ার অর্থ। ইসলামে আল্লাহ্'র পরিবর্তে কাউকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করাকে *শিরক* বলা হয়, যা কিনা ভয়ঙ্কর অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়।

সুতরাং, উপরোক্ত আয়াতটি সেই সমস্ত মানুষের ভয়ঙ্কর অপরাধের দিকে নির্দেশ করছে যারা আল্লাহ্‌'র আইন অনুসরণের পরিবর্তে নিজেদের হাতে আইন প্রণয়ের ক্ষমতা তুলে নিয়েছে। আদি ইবনে হাতিমের রেওয়াতে তিরমিযী বর্ণনা করেন,

"আমি একদিন একটি স্বর্ণের ক্রস গলায় ঝুলানো অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি (সাঃ) বললেন, 'হে আদি! এই মূর্তিকে ছুঁড়ে ফেলে দাও।' তখন আমি তাঁকে (সাঃ) পবিত্র কালামের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে শুনেছি যে, তারা আল্লাহ্‌'র পরিবর্তে তাদের ধর্মযাজক ও সাধুদের নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন, **"তারা এইসব আলেম ও দরবেশদের উপাসনা করে না; কিন্তু, (আল্লাহ্‌'র পক্ষ থেকে) তাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তারা (ধর্মযাজকেরা) তাদের জন্য তা হালাল করেছে। আর, তাদের জন্য যা হালাল করা হয়েছিল তারা (ধর্মযাজকেরা) তাদের জন্য তা নিষিদ্ধ করেছে।"** *(সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-৩০৯৫)*

বস্তুতঃ ইসলাম মন্ত্রী পরিষদ দ্বারা শাসিত কোন ব্যবস্থা নয় – যেখানে মন্ত্রীদের রয়েছে নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও পৃথক বাজেট। এই ধরনের ব্যবস্থায় (প্রজাতন্ত্রে) সাধারণত এতবেশী প্রশাসনিক জটিলতা (red tape) থাকে, যে কারণে এক মন্ত্রনালয়ের উদ্বৃত্ত বাজেট সহজে অন্য মন্ত্রনালয়ে স্থানান্তরিত হয় না; যা জনগণের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তাছাড়া, এক বিষয়ে একাধিক মন্ত্রনালয়ের হস্তক্ষেপের ফলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। অথচ জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে একটি একক প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসলে খুব সহজেই এসব সমস্যা এড়ানো সম্ভব হয়।

রিপাবলিকান বা প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব বিভিন্ন মন্ত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয় এবং প্রতিটি মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীগণ একত্রিত হয়ে একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। এভাবে সম্মিলিতভাবে মন্ত্রী পরিষদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রজাতন্ত্রের মতো কোন মন্ত্রীপরিষদ নেই যারা কিনা সম্মিলিতভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। বরং, এখানে খলীফাকে জনগণ আল্লাহ্‌'র কিতাব ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্‌ অনুসারে শাসন করার জন্য বাই'আত দিয়ে থাকে। তবে, এক্ষেত্রে খলীফা তার গুরুভার লাঘব করার জন্য প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী (Delegated Assistants) নিয়োগ করতে পারেন। এদের আক্ষরিক অর্থেই খলীফার সহকারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যারা খিলাফতের গুরুদায়িত্ব পালনে খলীফাকে সহায়তা করেন।

খিলাফত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়:

জনগণকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নয়; যেখানে জনগণই তাদের ইচ্ছানুযায়ী কোন বিষয়কে অনুমোদন দেয়, নিষিদ্ধ করে, উৎসাহিত করে কিংবা তিরস্কার করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোন অবস্থাতেই শারী'আহ্‌ আইনের কাছে দায়বদ্ধ নয়। বরং, তাদের আইনু-কানুনের মূলভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতা (freedom)। অবিশ্বাসীরা জানে যে, মুসলিমরা গণতন্ত্রকে এর প্রকৃত চেহারায় গ্রহণ করবে না। এ কারণে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, একথা বলে মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রের বিস্তার ঘটাতে চেয়েছে যে, গণতন্ত্র শুধুমাত্র শাসক নির্বাচনের একটি পদ্ধতি। এভাবেই তারা মুসলিম উম্মাহ্‌কে প্রতারিত করেছে এবং উম্মাহ্‌কে শাসনব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্রকে মেনে নিতে প্ররোচিত করেছে। যেহেতু মুসলিম দেশসমূহ ইতিমধ্যে প্রকৃত রাজতান্ত্রিক কিংবা প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মোড়কে বিভিন্ন স্বৈরশাসকদের স্বৈরাচারী শাসনের নীচে নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং সেইসাথে, মুসলিম বিশ্বে জনগণের আবেগ-অনুভূতিকে প্রচন্ডভাবে অবদমিত রাখা হয়েছে, তাই এ ভূমিগুলোতে নতুন শাসক নির্বাচনের পদ্ধতি হিসাবে গণতন্ত্রের বিস্তার ঘটানো সহজ। এভাবেই তারা গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে আলোচনাকে সযত্নে এড়িয়ে গেছে – যা হচ্ছে স্রষ্টার পরিবর্তে তাঁর সৃষ্ট মানুষকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বিষয়টি।

দূর্ভাগ্যবশত কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ, যাদের মধ্যে কিছু উলামাও আছেন, তারা সৎ কিংবা অসৎ নিয়তে এই প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়েছেন। যদি তাদের কাছে গণতন্ত্র সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়, তাহলে তারা বলেন এটা শাসক নির্বাচন করার একটি পদ্ধতি মাত্র। আর, এদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসীদের মতোই মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করতে চায়, তারা গণতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থটি এড়িয়ে গিয়েই এ বিষয়ে জনগণকে তথ্য প্রদান করে। তারা এ বিষয়ে আলোচনা সবসময় পরিহার করতে চায় যে, গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে মানুষকে সার্বভৌমত্ব প্রদান করা, মানুষের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা, সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছানুযায়ী আইন প্রণয়ন করা; এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠের

ইচ্ছানুযায়ীই যে কোন বিষয়ে অনুমোদন, নিষেধাজ্ঞা, উৎসাহ প্রদান কিংবা তিরষ্কার করা। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পরিবর্তে এ মতবাদের প্রচারকরা শুধুমাত্র নির্বাচনের বিষয়টি জনসম্মুখে তুলে ধরে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছানুযায়ী যা খুশী তাই করার জন্য অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে (তা না হলে সে সার্বভৌম হবে কিভাবে?) অতএব, এ ব্যবস্থায় সে চাইলে মদ পান করতে পারে, যিনাহ্ করতে পারে, ধর্মত্যাগ করতে পারে কিংবা পবিত্র বিষয় নিয়ে কটুক্তিও পারে। এ সবকিছুই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে অনুমোদিত। মূলতঃ এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রকৃত বাস্তবতা এবং প্রকৃত অর্থ। এ সবকিছু অনুধাবন করার পরেও কিভাবে একজন মুসলিম, যে কিনা ইসলামী আক্বীদাহ্'র উপর বিশ্বাস করে বলতে পারে যে, গণতন্ত্র মুসলিমদের জন্য অনুমোদিত কিংবা গণতন্ত্র ইসলাম থেকেই উত্থিত?

ইসলাম জনগণ কর্তৃক খলীফা নির্বাচনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। যদিও ইসলামে সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণভাবে শারী'আহ্'র, কিন্তু উম্মাহ্'র (জনগণ) বাই'আতের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়া যে কারও খলীফা হবার একটি মৌলিক শর্ত। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় সেই সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই খলীফা নির্বাচন হয়েছে, যখন সমগ্র বিশ্ব স্বৈরশাসক ও রাজা-বাদশাহদের ভয়ঙ্কর অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল। কেউ যদি খোলাফায়ে রাশেদীন অর্থাৎ, আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) এবং আলী (রা.) এর নির্বাচন প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন, তবে এটা তার কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, এদের প্রত্যেককে খলীফা হিসাবে নির্বাচনের ক্ষেত্রেই মুসলিম উম্মাহ্'র প্রভাবশালী অংশ এবং উম্মাহ্'র প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করা হয়েছিল। উমর (রা.) এর শাসনামলের শেষের দিকে আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) কে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল মুসলিম উম্মাহ্'র প্রতিনিধিদের (তৎকালীন মদীনার জনগণ) কাছ থেকে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে মতামত সংগ্রহের জন্য। মদীনার জনগণ খলীফা পদে কাকে নির্বাচিত করতে চায় এ তথ্য অনুসন্ধানে তিনি মদীনার বহুসংখ্যক মানুষের বাসগৃহে প্রবেশ করে জনগণের মতামত যাচাই করেছিলেন। তিনি মদীনার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, সামগ্রিকভাবে জনমতের পাল্লা উসমান (রা.) এর দিকেই ভারী হয়েছে। এরপর, উসমান (রা.)কে বাই'আতের মাধ্যমে খলীফা হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, গণতন্ত্র একটি কুফরী ব্যবস্থা। এটি এ কারণে নয় যে, এটা মানুষকে শাসক নির্বাচনের ক্ষমতা দেয়; কারণ এটি প্রকৃতঅর্থে মূল আলোচ্য বিষয়ও নয়। বরং এটি এ কারণে যে, যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলভিত্তিই হল মানুষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"বস্তুত সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্য নয়।" **[সূরা ইউসুফ: ৪০]**

"কিন্তু না, তোমার রব এর শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেবে। অতঃপর তুমি যাই ফায়সালা করবে, সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুন্ঠাবোধ করবে না, বরং এর সম্মুখে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে।" **[সূরা আন-নিসা : ৬৫]**

এরকম আরও অনেক প্রসিদ্ধ দলিল রয়েছে যা নিশ্চিত করে যে, আইন প্রণয়নের একমাত্র ক্ষমতা হল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার।

এছাড়া, আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়, যেখানে কোন নারী বা পুরুষ হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য না করেই যা খুশী তাই করতে পারে। গণতন্ত্র ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে ধর্মত্যাগের অধিকার প্রদান করে এবং ধর্ম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনরূপ বাঁধা আরোপ করে না। এছাড়া, মালিকানা অর্জনের স্বাধীনতা মূলতঃ ধনীকে অসৎ ও প্রতারণাপূর্ণ উপায়ে দূর্বলকে শোষণ করার অনুমোদন দেয়; ফলে, ধনীর সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দরিদ্র আরও বেশী দরিদ্র হতে থাকে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সত্য বলাকে উৎসাহিত করে না, বরং উম্মাহ্'র পবিত্র আবেগ-অনুভূতিকে নির্মম আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করতেই তা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি এ পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যে, যারা মত প্রকাশের ছদ্মাবরণে ইসলামকে আক্রমণ করে তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার মানুষ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এ হীনচেষ্টার জন্য তাদেরকে পুরস্কৃতও করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থা (খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা) রাজতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদী, ফেডারেল, প্রজাতান্ত্রিক কিংবা গণতান্ত্রিক কোনটিই নয়।

৩. খিলাফত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমান প্রচলিত শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুরূপ নয়, যদিও কোন কোন অংশকে আপাতদৃষ্টিতে সদৃশ মনে হতে পারে। বস্তুতঃ খিলাফত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহ উদ্ভুত হয়েছে হিজরতের পর মদীনা আল-মুনাওওরায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে। এই শাসনব্যবস্থাই পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীন (রা.) কর্তৃক অনুসৃত হয়েছিল, যারা শাসক হিসাবে রাসূল (সাঃ) এর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

(এ বিষয়ের সাথে) প্রাসঙ্গিক ইসলামী দলিল-প্রমাণগুলোর সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ এটা নিশ্চিত করে যে, খিলাফত রাষ্ট্র নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে গঠিত ছিল:

১. খলীফা

২. খলীফার প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী (মু'ওয়ায়ীন আত তাফউয়ীদ বা Delegated Assistants)

৩. খলীফার নির্বাহী সহকারী (মু'ওয়ায়ীন আত তানফীদ - Executive Assistants)

৪. গভর্ণরবৃন্দ (উ'লাহ্ - Wulah)

৫. আমীর-উল-জিহাদ

৬. আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ

৭. পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ

৮. শিল্প বিষয়ক বিভাগ

৯. বিচার বিভাগ

১০. প্রশাসনিক বিভাগ

১১. বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)

১২. তথ্য বিভাগ (আল ই'লাম - I'laam)

১৩. উম্মাহ্ কাউন্সিল (মাজলিস আল-উম্মাহ্ - Majlis al-Ummah)

এই বইয়ের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিস্তৃত আকারে শারী'আহ্ দলিল-প্রমাণের বিশ্লেষণসহ উৎস থেকে বিশদভাবে আলোচনা করা। আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি বিজয়ের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেন এবং দ্বিতীয় খোলাফায়ে রাশেদীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করে ইসলাম এবং মুসলিমদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে দেন। সেইসাথে, এ খিলাফতের মাধ্যমেই কাফের ও মুশরিকদের অপমানিত করেন। সর্বোপরি, সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইসলামের সুসংবাদকে ছড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করেন।

"আল্লাহ্ তো নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসের জন্য একটি তকদীর বা মাত্রা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" **[সূরা আত-তালাক : ৩]**

১৪ই জ্বিল-হজ্ব ১৪২৫ হিজরী
২৪/০১/২০০৫ই

খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ
(শাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা)

খলীফা

খলীফা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি শাসন, কর্তৃত্ব এবং শারী'আহ্'র বিধি-বিধান সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ্'র প্রতিনিধিত্ব করেন। ইসলাম এটি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, শাসন এবং কর্তৃত্ব থাকবে উম্মাহ্'র অধিকারে। এজন্যই উম্মাহ্ শাসনকার্য পরিচালনা ও তাদের উপর শারী'আহ্'র হুকুম-আহ্কাম সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার পক্ষ হতে একজনকে নিযুক্ত করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতিটি শারী'আহ্ আইন বাস্তবায়ন করা উম্মাহ্'র জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। যেহেতু খলীফা মুসলিমদের দ্বারা নির্বাচিত হন, সেহেতু স্বভাবতই তাকে শাসন, কর্তৃত্ব ও শারী'আহ্ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উম্মাহ্'র প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং, কোন ব্যক্তিই ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফা হতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি উম্মাহ্'র কাছ থেকে বাই'আত প্রাপ্ত হবেন; কারণ, মূলতঃ শাসন, কর্তৃত্ব ও শারী'আহ্ আইনসমূহ বাস্তবায়ন করা উম্মাহ্'র এখতিয়ারে। প্রকৃতঅর্থে, একজন ব্যক্তিকে খলীফা হিসাবে বাই'আত দিয়েই মুসলিম উম্মাহ্ কার্যকরীভাবে তাকে উম্মাহ্'র প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করে। আর, এই বাই'আতের মাধ্যমেই তার উপর খিলাফত রাষ্ট্রের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, খলীফাকে (উম্মাহ্'র উপর) কর্তৃত্বশীল করা হয় এবং সর্বোপরি, উম্মাহ্কে তার আনুগত্য করতে বাধ্য করা হয়।

বস্তুতঃ যিনি মুসলিমদের শাসন করবেন, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফা হতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না উম্মাহ্'র মধ্য হতে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ (আহ্লুল হাল ওয়াল আকদ্) স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে বাই'আত প্রদান করেন। খলীফা হিসেবে নিয়োগ পাবার জন্য তাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে এবং তারপর তাকে শারী'আহ্ বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

পদবি

খলীফার পদবি হতে পারে খলীফা অথবা 'ইমাম' কিংবা 'আমীর উল মু'মিনীন (বিশ্বাসীদের নেতা)। এই পদবিসমূহ সহীহ্ হাদীস এবং ইজ্মা আস্ সাহাবা (রা.) থেকে পাওয়া যায়। খোলাফায়ে রাশেদীনদের (প্রথম চার খলীফা) এইসব পদবী দেয়া হয়েছিল। আবু সা'ঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"যদি দুই জন খলীফাকে আনুগত্যের শপথ দেয়া হয়, তাহলে দ্বিতীয় জনকে হত্যা কর।" *(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৪২)*

আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আল আস্ (রা.) থেকে হতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"যখন একজন ইমামের হাতে বাই'আত গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন তাকে যথাসাধ্য মান্য করবে..." *(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৪৪)*

আউফ ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, "রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"তোমাদের ইমামদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তারা যারা তোমাদেরকে ভালবাসে এবং তোমরা তাদেরকে ভালবাসো এবং যারা তোমাদের জন্য প্রার্থনা করে এবং তোমরা যাদের জন্য প্রার্থনা কর;... " *(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-৪৭৮২)*

এসব হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামের নিয়ম অনুসারে শাসকদের পদবি হল খলীফা অথবা ইমাম।

"আমীর উল মু'মিনীন" উপাধির ব্যাপারে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য হাদীসটি এসেছে শিহাব আল জুহরী'র বর্ণনা থেকে। এ হাদীসটি আল-হাকিম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে (খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭৩, হাদীস নং-৪৪৮০) উল্লেখ করেছেন এবং আল-জাহাবী (তালখিস গ্রন্থে) এটিকে সহীহ্ হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। একই বিষয়ে আল-তাবারাণীর একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যেটি সম্পর্কে আল-হাইছামী বলেছেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আল-হাকিম হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে :

"ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবন আব্দুল আজিজ, আবু বকর ইবন সুলাইমান ইবন আবি হাইছামাকে জিজ্ঞেস করেন যে, "কে প্রথম আমীর উল মু'মিনীন উপাধি লিখতে আরম্ভ করেন? তিনি বলেন, "আশ-শাফা', যিনি নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হিজরতকারী ছিলেন, আমাকে বললেন যে, উমর ইবন আল-খাত্তাব (রা.) ইরাকের গভর্ণরকে পত্র মারফত দু'জন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে পাঠানোর আদেশ দিলেন যেন তিনি (রা.) তাদের কাছ থেকে ইরাক এবং সেখানকার জনগণ সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পারেন। তিনি (ইরাকের গভর্ণর) লাবিদ ইবন রাবিয়াহ্ এবং আদি ইবন হাতিমকে তাঁর কাছে পাঠালেন। মদিনায় এসে পৌছানোর পর তারা তাদের উটগুলোকে (মদিনার) মসজিদ প্রাঙ্গনে থামালেন এবং মসজিদের ভেতর প্রবেশ করলেন। হঠাৎ তারা আমর ইবন আল-আসকে দেখলেন এবং বললেন, "হে আমর! আমীর উল মু'মিনীনের সাথে আমাদের সাক্ষাতের অনুমতির ব্যবস্থা করে দাও!" আমর বললেল, "আল্লাহ'র কসম, তোমরা তাঁকে সঠিক নামেই ডেকেছো। তিনি হচ্ছেন আমাদের আমির, আর আমরা হচ্ছি বিশ্বাসী (মু'মিনীন)।" তারপর আমর লাফিয়ে উঠে উমর, আমির উল মু'মিনীনের কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম, হে আমীর উল মু'মিনীন (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে বিশ্বাসীদের আমীর)। উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মাথায় এ উপাধি কিভাবে আসলো, হে আমর? আল্লাহ্'র কসম, তুমি যা বলেছো (এটা যে ঠিক) তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে।" তখন তিনি (আমর) বললেন, "লাবিদ ইবন রাবিয়াহ্ এবং আদি ইবন হাতিম মদিনায় এসে পৌছেছে এবং তারা তাদের উটগুলো মসজিদ প্রাঙ্গনে বেঁধে রেখে আমাকে বলেছে, "হে আমর! আমীর উল মু'মিনীদের সাথে আমাদের সাক্ষাতের অনুমতির ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ্'র কসম! তারা আপনাকে সঠিক উপাধিই দিয়েছে। কারণ, আমরা হলাম বিশ্বাসী (মু'মিনীন) আর আপনি হলেন আমাদের আমীর (নেতা)।" তারপর থেকেই তারা তাদের লেখনীতে আমীর উল মু'মিনীন উপাধি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।" আশ-শিফা (রা.) ছিলেন আবু বকর ইবন সুলাইমানের নানী। এরপর থেকে উমর (রা.) এর পরের খলীফাদেরও মুসলিমরা এই উপাধিতে সম্বোধন করতে আরম্ভ করে।"

খলীফা নিয়োগের শর্তাবলী

খলীফা পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য একজন ব্যক্তিকে সাতটি অবশ্য পূরণীয় চুক্তিবদ্ধ শর্ত পূরণ করতে হবে। এদের মধ্যে কোন একটির ব্যাত্যয় ঘটলে, খলীফার পদে তার নিয়োগ বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

অবশ্য পূরণীয় শর্ত সমূহঃ

১. খলীফা অবশ্যই মুসলিম হবেন।

একজন কাফির বা অবিশ্বাসীকে কোন অবস্থাতেই বাই'আত দেয়া যাবে না। কোন কাফির যদি উম্মাহ্'র নেতা নির্বাচিত হয়ও তবে মুসলিমদের তার আনুগত্য করা শারী'আহ্ সম্মত হবে না। কারণ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন :

"*আর মুসলিমদের উপর কাফেরদের কর্তৃত্ব করার কোন পথই আল্লাহ্ অবশিষ্ট রাখেননি।*" **[সূরা আন-নিসা : ১৪১]**

একজন শাসক যাদেরকে শাসন করেন, পদাধিকার বলে তিনি তাদের উপর কর্তৃত্বশালী হন। উপরোক্ত আয়াতে ব্যবহৃত 'লান' (কক্ষণো না) শব্দটি দিয়ে মুসলিমদের উপর কাফিরদের যে কোন প্রকার কর্তৃত্ব করবার ব্যাপারটি সর্বোতোভাবে নিষিদ্ধ (catergorical prohibition) ঘোষণা করা হয়েছে। মূলতঃ এ আয়াতের মাধ্যমেই কাফিরদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

আবার, অন্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যিনি মুসলিমদের বিষয়াদি দেখাশুনার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকবেন তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"*হে ঈমানদারগণ; তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল* (উলীল আমর) *তাদের।*" **[সূরা আন-নিসা : ৫৯]**

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,

"তারা যখনই কোন প্রকার জননিরাপত্তা সংক্রান্ত কিংবা ভীতিকর খবর শুনতে পায়, তখনি তা সর্বত্র প্রচার করে দেয় অথচ তারা যদি তা রাসূল ও তাদের উপর কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিদের (উলীল আমর) *কাছে পৌছে দিত।"* **[সূরা আন-নিসা : ৮৩]**

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে 'উলীল আমর' শব্দটি সব সময় মুসলিমদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে, কখনোই অমুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি। সুতরাং, এ আয়াতগুলো থেকেও প্রমাণিত হয় যে যারা মুসলিমদের উপর কর্তৃত্বশীল থাকবেন তাদেরকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। যেহেতু খলীফা হচ্ছে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশীল পদ এবং তিনিই অন্যান্যদের কর্তৃত্বশীল পদে নিযুক্ত করবেন, যেমনঃ তার সহকারীগণ, ওয়ালী, আমীল প্রমুখ, সেহেতু তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে।

২. খলীফাকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে।

খলীফাকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে, কোন নারীকে খলীফা নিযুক্ত করা যাবে না। বুখারী থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) যখন শুনলেন পারস্যের জনগণ কিসরার কন্যাকে তাদের রাণী হিসেবে নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি (সাঃ) বললেন,

"যারা নারীদেরকে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করে তারা কখনওই সফল হবে না।" *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৪৪২৫)*

উপরোক্ত হাদীসে নারীদের শাসক হিসাবে নিযুক্ত করার সাথে 'ব্যর্থতা' শব্দটি যুক্ত করে মূলতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এ হাদীসে যারা নারীদের শাসক হিসেবে নিযুক্ত করবে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ, তিরস্কারের মাধ্যমে এ হাদীসটি আমাদের এমন একটি নির্দেশ দিচ্ছে যা অকাট্য। যার অর্থ, নারীদের শাসক হিসাবে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ।

আবার, হাদীসের ভাষাটি এমনভাবে এসেছে যে, এখানে যারা তাদের বিষয়াদি দেখাশুনার জন্য নারীদের শাসক হিসাবে নিযুক্ত করবে তাদের সফলতাকে সরাসরি অস্বীকার করেও বিষয়টির অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। সুতরাং, এ কারণেও এ নিষেধাজ্ঞাটি অকাট্য (Decisive) বলে গণ্য হবে; অর্থাৎ, এদিক থেকেও একজন নারীকে শাসক হিসেবে নিয়োগ দান করা নিষিদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হবে। শুধু তাই নয়, নারীদের শাসন সংক্রান্ত যে কোন পদ অলংকৃত করা, সেটি খলীফা কিংবা ওয়ালী বা আমিল, যাই হোক না কেন তা নিষিদ্ধ বলেই বিবেচিত হবে। এর কারণ হচ্ছে, হাদীসের বিষয়বস্তু কিস্‌রার কন্যার রাণী (শাসক) হিসাবে নিয়োগ দেবার সাথে সম্পর্কিত, যা কিনা সরাসরি শাসন-কর্তৃত্বের সাথে জড়িত। এখানে হাদীসের বিষয়বস্তু কিস্‌রার কন্যা হিসাবে তার মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত নয়। আবার হাদীসটি অর্থের দিক থেকে 'আম (সাধারণ) নয়; অর্থাৎ, এক্ষেত্রে বিচারিক কাজে নিযুক্ত হওয়া, শূরা কাউন্সিলের সদস্য হওয়া, শাসককে জবাবদিহি করা কিংবা শাসক নির্বাচন করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত হবে না। বরং, এসবই নারীদের জন্য বৈধ, যা পরবর্তীতে নির্ধারিত অধ্যায়গুলোতে আলোচিত হবে।

৩. খলীফাকে অবশ্যই বালেগ হতে হবে।

শিশুকাল অতিক্রম করে স্বাবালকত্ব অর্জন করার পূর্বে অর্থাৎ, নাবালেগ ব্যক্তিকে খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আবু দাউদ, আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ

"জবাবদিহিতা তিন ব্যক্তির জন্য নয়ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জেগে উঠে, বালক যতক্ষণ না পরিণত হয় এবং উম্মাদ ব্যক্তি যতক্ষণ না সে মানসিকভাবে সুস্থ হয়।" *(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৩৯৮)*

এছাড়া, আলী (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন :

"তিন ব্যক্তির আমলনামায় কিছুই লেখা হয় নাঃ উম্মাদ ব্যক্তি যতক্ষণ না সে সুস্থ্ হয়, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জেগে উঠে এবং নাবালেগ যতক্ষণ না সে বালেগ হয়।"

অর্থাৎ, যার উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে সে তার কাজের জন্য দায়ী হবে না। শারী'আহ্ আইনের দৃষ্টিকোন থেকে কোন কাজের জন্য তাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা হবে না। এজন্য তাকে খলীফা হিসাবে নিযুক্ত করা কিংবা, শাসনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত কোন পদে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ। কারণ, নাবালেগ হিসাবে সে তার কোন কাজের জন্য দায়ী নয়। যে ব্যক্তি নিজের কর্মকান্ডের জন্য দায়িত্বশীল নয় তাকে খলীফা পদেও নিযুক্ত করা যাবে না। এ ব্যাপারে আরও

দলিল পাওয়া যায় বুখারীর কাছ থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন আবু আকীল জাহরা ইবনে মা'বাদ থেকে; তিনি বর্ণনা করেছেন তার দাদা আবদুল্লাহ্ ইবনে হিশাম থেকে যিনি রাসূল (সাঃ) এর সময় জীবিত ছিলেন। ইবনে হিশামের মা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, **'হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করুন।' তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, 'সে তো ছোট'। অতঃপর তিনি (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে হিশামের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন।"** *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৭২১০)*

সুতরাং, হুকুম শারী'আহ্'র দৃষ্টিকোন থেকে, নাবালেগের বাই'আত যেহেতু গ্রহণযোগ্য নয় এবং নাবালেগ ব্যক্তি খলীফাকে বাই'আত দিতে সক্ষম নয়, সেহেতু তার নিজের পক্ষে খলীফা হওয়াও সম্ভবপর নয়।

৪. খলীফাকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে।

উম্মাদ বা অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তিকে খলীফা হিসাবে নিয়োগ দেয়া নিষিদ্ধ। কারণ রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"তিন ব্যক্তির আমল নামায় কিছুই লেখা হয় নাঃ উম্মাদ ব্যক্তি যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়..."। এ হাদীসের মাধ্যমেই এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত জবাবদিহিতার আওতায় আসবে না যতক্ষণ সে মানসিকভাবে সুস্থ হয়। কারণ, মানসিক সুস্থতা যে কোন দায়িত্ব পালন করার পূর্বশর্ত। খলীফা শারী'আহ্ আইনকে কার্যকর করেন এবং সেইসাথে, শারী'আহ্ প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। সে কারণে একজন অপ্রকৃতস্থ খলীফা থাকা বৈধ নয়। কারণ, একজন অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তি নিজের কাজের ব্যাপারেই দায়িত্বশীল নয়, সুতরাং বৃহত্তর যুক্তিতে (by greater reason) সে ব্যক্তি কিভাবে উম্মাহ্'র ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবে?

৫. খলীফা ন্যায় বিচারক হবেন।

কোন ফাসিক ব্যক্তি – যে নির্ভরযোগ্য নয় সে খলীফা হতে পারবে না। সত্যনিষ্ঠতা ও দৃঢ় নৈতিক গুণাবলী খলীফা হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত ও এ দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তি অবশ্যই সৎ হয়। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন :

"আর এমন দু'জন লোককে সাক্ষী বানাবে যারা তোমাদের মাঝে সত্যনিষ্ঠ হবে।" **[সূরা আত-তালাক : ২]**

যেহেতু সাক্ষ্যদানকারীদের সত্যনিষ্ঠ হতে হবে, সেহেতু যিনি ঐসব সাক্ষ্য দানকারীদের উপর কর্তৃত্ব করবেন এবং যিনি সর্বোচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন, বৃহত্তর যুক্তিতে (By greater reason) তাকে অবশ্যই সৎ হতে হবে।

৬. খলীফা অবশ্যই আযাদ বা মুক্ত মানুষ হতে হবে।

যেহেতু একজন ক্রীতদাস সম্পূর্ণভাবে তার প্রভূর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সে নিজেই তার নিজের ব্যাপারে কোনরকম সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম, সেহেতু তার পক্ষে জনগণের বিষয়াবলী দেখাশুনা করা কিংবা তার উপর তাদের শাসনভার অর্পণ করা সম্ভব নয়।

৭. খিলাফতের গুরুদায়িত্ব পালনে খলীফাকে অবশ্যই সক্ষম হতে হবে।

কোন ব্যক্তি যে কোন কারণেই হোক না কেন, যদি দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়, তবে বাই'আতের চুক্তি অনুসারে পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী সে মানুষের বিষয়াদি দেখাশুনার দায়িত্ব নিতে পারবে না। কারণ, উম্মাহ্'র বিষয়াদি দেখাশুনা করার জন্যই খলীফাকে বাই'আত দেয়া হয়। খলীফার দায়িত্ব পালনে অযোগ্যতা আছে কিনা কিংবা অযোগ্যতা থাকলে তা কি ধরনের, তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব মাযালিম আদালতের (The Court of Unjust Acts)।

<u>পছন্দনীয় শর্তাবলী:</u>

উপরে উল্লেখিত শর্তাবলী একজন খলীফা নিযুক্ত হবার জন্য আবশ্যিক। এ সাতটি বাদে বাকী কোন শর্তই খলীফা নিযুক্ত হবার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এছাড়া, কিছু শর্তাবলী রয়েছে যেগুলো সহীহ্ দলিল প্রমাণের মাধ্যমে যদি জরুরী প্রমাণিত হয় তাহলে এগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে সেগুলো হবে পছন্দনীয় শর্তাবলী। যদি কোন নির্দেশ অকাট্য (Decisive)

বলে প্রমাণিত হয় তাহলে সেটাকে আবশ্যিক শর্তাবলীর আওতায় নেয়া হবে। আর যদি দলিলের ভিত্তিতে সেটি অকাট্য বা চূড়ান্ত (Decisive) বলে প্রমাণিত না হয় তাহলে সে শর্তটি পছন্দনীয় বলে পরিগণিত হবে। এখন পর্যন্ত উল্লেখিত সাতটি আবশ্যিক শর্তাবলী ব্যতীত আর কোন গুণাবলী আবশ্যিক বলে প্রমাণিত হয়নি। সে কারণে এই সাতটিই খলীফা নিয়োগের জন্য আবশ্যিক শর্তাবলী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর, সহীহ্ দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত বাকী শর্তাবলী শুধুমাত্র পছন্দনীয় শর্তাবলী বলেই বিবেচিত হবে। যেমনঃ খলীফাকে কুরাই'শ বংশোদ্ভুত, মুজতাহিদ কিংবা অস্ত্র চালনায় পারদর্শী হতে হবে ইত্যাদি। তবে, এগুলোর কোনটিই আবশ্যিক হিসাবে বিবেচনা করার মতো অকাট্য দলিল নেই।

খলীফা নিয়োগ করার প্রক্রিয়া

শারী'আহ্ যখন উম্মাহ্'র উপর একজন খলীফা নিয়োগ করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, একইসাথে, শারী'আহ্ খলীফা নিয়োগ করার পদ্ধতিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ পদ্ধতি আল্লাহ্'র কিতাব ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। যে সমস্ত মুসলিম খলীফাকে বাই'আত দিবে তাদের অবশ্যই সে সময়ে খিলাফত রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। আর, যদি পরিস্থিতি এরকম হয় যে, যখন কোন খিলাফত রাষ্ট্র নেই, তখন সে অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর উপরই বাই'আত দেবার দায়িত্ব বর্তাবে যেখানে খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যকর করা হবে।

বাই'আত যে খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি তা প্রমাণিত হয়, রাসূল (সাঃ) কে মুসলিমদের বাই'আত দেবার ঘটনা ও ইমামকে বাই'আত দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ থেকে। তৎকালীন মুসলিমরা রাসূল (সাঃ) কে নবী হিসাবে বাই'আত দেয়নি; বরং শাসক হিসাবে বাই'আত দিয়েছিল। কারণ, তাদের এ বাই'আত বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত ছিল না, বরঞ্চ তাদের কাজের সাথে সম্পর্কিত ছিল। সুতরাং, রাসূল (সাঃ) কে নবী বা রাসূল হিসেবে বাই'আত দেয়া হয়নি বরং শাসক হিসেবেই বাই'আত দেয়া হয়েছিল। কারণ, নবুয়্যতকে স্বীকৃতি দেবার বিষয়টি মূলতঃ বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত এবং এখানে বাই'আতের প্রক্রিয়াটি প্রযোজ্য নয়। সুতরাং, আল্লাহ্'র রাসূলকে বাই'আত দেবার বিষয়টি তাকে শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া বলেই বিবেচিত হবে।

পবিত্র কুর'আন ও হাদীসেও বাই'আতের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

"হে নবী ! তোমার নিকট মুমিন স্ত্রী লোকেরা যদি একথার উপর বাই'আত করবার জন্য আসে যে, তারা আল্লাহ্'র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, আপন গর্ভজাত জারজ সন্তানকে স্বামীর সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং কোন ভাল কাজের ব্যাপারে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তবে তুমি তাদের বাই'আত গ্রহণ কর।" **[সূরা মুমতাহিনা : ১২]**

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"হে নবী! যেসব লোক তোমার নিকট বাই'আত গ্রহণ করেছিল তারা আসলে আল্লাহ্'র নিকট বাই'আত করছিল। তাদের হাতের উপর আল্লাহ্'র হাত ছিল।" **[সূরা আল ফাত্হ : ১০]**

বুখারী থেকে বর্ণিত হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা.) বর্ণনা করেন,

"আমরা রাসূল (সাঃ) এর নিকট সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় শ্রবন ও আনুগত্য করার শপথ নিয়েছি। একথার উপরও শপথ নিয়েছি যে, আমরা উলূল আমর (শাসন কর্তৃত্বশীল)-এর সাথে বিবাদ করবনা। আমরা এই মর্মেও শপথ নিয়েছি যে, হকের জন্য উঠে দাঁড়াবো কিংবা হক কথা বলব যে অবস্থায়ই থাকি না কেন। আর, আল্লাহ্'র কাজের ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবো না।" *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭০৫৪; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-৪৭৪৮)*

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্'র রাসূলকে (সাঃ) বলতে শুনেছি যে,

"যে ব্যক্তি কোন ইমামকে বাই'আত প্রদান করল, সে যেন তাকে নিজ হাতের কর্তৃত্ব ও স্বীয় অন্তরের ফল (অর্থাৎ সব কিছু) দিয়ে দিল। এরপর তার উচিৎ উক্ত ইমামের আনুগত্য করা। যদি অন্য কেউ এসে (প্রথম নিযুক্ত) খলীফার সাথে (ক্ষমতার ব্যাপারে) বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে দ্বিতীয় জনের গর্দান উড়িয়ে দাও।" *(মুসনাদে আহমাদ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা-১০)*

এছাড়াও মুসলিম বর্ণনা করেন আবু সাইদ খুদ্‌রী (রা.) রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন:

"যদি দু'জন খলীফাকে বাই'আত দেয়া হয়, তাহলে দ্বিতীয়জনকে হত্যা কর।" *(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৫৩)*

আবু হাজিমের বরাত দিয়ে ইমাম মুসলিম আরও বর্ণনা করেন যে, আমি আবু হুরায়রার সাথে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেছি এবং তাঁকে বলতে শুনেছি, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"বনী ইসরাইলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখন এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন তাঁর স্থলে অন্য নবী আসতেন, কিন্তু আমার পর আর কোনও নবী নেই। শীঘ্রই অনেক সংখ্যক খলীফা আসবেন। তাঁরা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন তখন আপনি আমাদের কী করতে আদেশ করেন? তিনি (সাঃ) বললেন, তোমরা একজনের পর একজনের বাই'আত পূর্ণ করবে, তাদের হক আদায় করবে। অবশ্যই আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদেরকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন।" *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৩৪৫৫)*

উপরোক্ত দলিল সমূহ এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্'র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্ অনুযায়ী খলীফা নিয়োগ করার প্রক্রিয়া হল বাই'আত। সকল সাহাবী (রা.) এটি জানতেন এবং তাদের জীবনে তা কার্যকর করেছিলেন। সুতরাং, খোলাফায়ে রাশেদীনদের কেন বাই'আত দেয়া হয়েছিল, এ সমস্ত দলিল-প্রমাণ থেকে তা পরিষ্কার ।

খলীফা নিয়োগ করা ও বাই'আত প্রদানের জন্য গৃহীত বাস্তব পদক্ষেপসমূহ

বাই'আত প্রদানের পূর্বে খলীফা নিয়োগের বাস্তব পদক্ষেপসমূহ বিভিন্ন রকম হতে পারে। যে রকমটি হয়েছিল খোলাফায়ে রাশেদীনদের সময়ে, যারা আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) এর ইন্তিকালের পরপরই উম্মাহ্'র খলীফা হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন – যেমন: আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী (রা.)। এ সমস্ত পদক্ষেপের ব্যাপারে সকল সাহাবী (রা.) নীরব থেকে তাঁদের স্বীকৃতি ও সম্মতি প্রদান করেছিলেন। এ বিষয়সমূহ যদি শারী'আহ্ সম্মত না হত তাহলে তাঁরা তা কোনক্রমেই মেনে নিতেন না। কারণ, এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার উপর মুসলিমদের মর্যাদা ও শারী'আহ্ হুকুম-আহ্কাম বাস্তবায়ন নির্ভর করে। আমরা যদি খোলাফায়ে রাশেদীনদের নিয়োগের বিভিন্ন ধাপসমূহের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, বনু সা'ইদার প্রাঙ্গনে কিছু মুসলিমের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। (আল্লাহ্'র রাসূলের পর) সম্ভাব্য খলীফা হিসাবে সা'দ, আবু উবাইদাহ্, উমর ও আবু বকর (রা.) প্রাথমিকভাবে মনোনীত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে, উমর ও আবু উবাইদাহ্ (রা.) আবু বকর (রা.) কে চ্যালেঞ্জ করতে অস্বীকৃতি জানান। অর্থাৎ, বিষয়টি তখন সা'দ এবং আবু বকর (রা.) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার পর আবু বকর (রা.) কে খলীফা হিসাবে বাই'আত দেয়া হয়। পরদিন মুসলিমদেরকে মসজিদে আহ্বান করা হয় এবং তারা সেখানে আবু বকর (রা.) কে বাই'আত দেয়। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, বনু সা'ইদার প্রাঙ্গনের বাই'আতটি ছিল খলীফা হিসাবে নিয়োগের বাই'আত – যার মাধ্যমে আবু বকর (রা.) মুসলিমদের খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হন। আর তার পরের দিন, মসজিদে গৃহীত বাই'আতটি ছিল আনুগত্যের বাই'আত।

আবু বকর (রা.) যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁর অসুস্থতা তাঁকে ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে ধাবিত করছে, ঠিক সে সময়ে মুসলিম সেনাবাহিনী পারস্য ও রোমান পরাশক্তিগুলোর সাথে যুদ্ধ করছিল। তখন তিনি তাঁর মৃত্যুর পর কে খলীফা হবেন এ ব্যাপারে মুসলিমদের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তিনি প্রায় ৩ মাস ব্যাপী মদীনার মুসলিমদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে যখন তিনি অধিকাংশ মুসলিমের মনোভাব বুঝতে পারলেন, তখন তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে তিনি উমর (রা.) এর নাম ঘোষণা করলেন। তবে, তাঁর এই মনোনয়ন উমরকে তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসেবে নিয়োগের চূড়ান্ত চুক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়নি। কারণ, আবু বকরের মৃত্যুর পর মুসলিমরা মসজিদে এসে উমর (রা.) কে বাইয়াত দেয় এবং এভাবেই খলীফা হিসাবে তাঁর নিয়োগ চূড়ান্ত হয়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, উমর (রা.) শুধুমাত্র বাই'আতের মাধ্যমেই খলীফা হয়েছিলেন; মুসলিমদের সাথে আবু বকর (রা.) এর আলাপ-আলোচনা বা তাঁর মনোনয়নের মাধ্যমে নয়। যদি আবু বকর (রা.) এর মনোনয়নই খলীফা নিয়োগের চূড়ান্ত চুক্তি হত, তাহলে উমর (রা.) কে মুসলিমদের বাই'আত দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং, এ ঘটনা আমাদের স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে যে, মুসলিমদের বাই'আত ছাড়া কেউ খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হতে পারবে না।

খলীফা থাকাকালীন সময়ে উমর (রা.) যখন গুরুতরভাবে আহত হলেন তখন মুসলিমরা তাঁকে একজন খলীফা মনোনীত করার জন্য অনুরোধ করলেন; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু, এ ব্যাপারে তাদের ক্রমাগত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ছয়জনকে খলীফা পদের জন্য মনোনীত করেন। অতঃপর তিনি শুয়াইব (রা.) কে ইমাম নিযুক্ত করলেন

এবং তাঁর মনোনীত ছয়ব্যক্তিকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে (তাঁর মৃত্যুর) তিনদিনের মধ্যে শুয়াইব (রা.) কে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিলেন। উমর (রা.), শুয়াইব (রা.) কে বললেন, "...যদি (ছয়জনের মধ্যে) পাঁচজন একব্যক্তির (খলীফা হবার) ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে এবং একজন দ্বিমত পোষণ করে তাহলে তরবারি দিয়ে তার মস্তক উড়িয়ে দেবে...।" এ ঘটনাটি তাবারণী তার তা'রিখ গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন; এছাড়া, আরও উল্লেখিত আছে ইবন কুতাইবা'র গ্রন্থ *আল ইমামা ও সিয়াসাহ*, যা কিনা 'খিলাফতের ইতিহাস' (দ্যা হিস্ট্রি অফ খিলাফাহ্) নামে পরিচিত এবং ইবন সা'দ এর গ্রন্থ *আত-তাবাকাত আল-কুবরাহ্*'তে। তারপর উমর (রা.) আবু তাল্হা আল-আনসারীকে পঞ্চাশ জন ব্যক্তির সহায়তায় তাঁর মনোনীত ছয়ব্যক্তির নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন এবং সেই সাথে, আল মিকদাদ ইবনে আল-আসওয়াদকে উক্ত ছয়প্রার্থীর মিলিত হবার স্থান নির্ধারণের দায়িত্ব দিলেন। উমর (রা.) এর মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত ছয় ব্যক্তি একত্রিত হলেন। এরপর, আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) তাদের প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচিত করার জন্য কে নিজেকে এ পদ থেকে সরিয়ে নিতে চাও?" এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে নিশ্চুপ থাকলে তিনি বললেন, "আমি স্বেচ্ছায় খলীফার পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি।" তারপর তিনি এক এক করে প্রত্যেকের সাথে আলাদাভাবে আলোচনা করলেন। তিনি প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলেন, "নিজেকে ছাড়া ছয়জনের মধ্যে আর কাকে তুমি এ পদের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে কর?" তাদের সকলের উত্তর আলী (রা.) এবং উসমানের (রা.) মধ্যে সীমাবদ্ধ হল। এরপর, আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) এ দু'জনের মধ্যে কাকে জনগণ খলীফা নির্বাচিত করতে চায়, সে বিষয়ে মতামত সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। জনমত যাচাই এর জন্য তিনি মদীনার নারী-পুরুষ সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং খলীফা নির্বাচনের এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি দিনরাত কাজ করেছিলেন। আল মুসওয়ার ইবনে মাখরামা'র বরাত দিয়ে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, "রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর আব্দুর রহমান বিন আউফ আমার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছিল যে পর্যন্ত না আমি জেগে উঠলাম। তিনি বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি ঘুমাচ্ছো, কিন্তু আল্লাহ্'র কসম, গত তিন রাত আমি খুব কমই ঘুমের আনন্দ উপভোগ করেছি।" এরপর মদীনার জনগণ ফজরের সালাত আদায় করার পর উসমান (রা.) কে খলীফা হিসেবে বাই'আত দিল এবং এভাবেই তিনি মুসলিমদের বাই'আতের মাধ্যমে খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হলেন। সুতরাং, উসমান (রা.) মুসলিমদের বাই'আতের মাধ্যমেই খলীফা হয়েছিলেন, উমর (রা.) কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে নয়।

উসমান (রা.) নিহত হওয়ার সময় মদীনার সাধারণ জনগণ এবং কুফাবাসী আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) কে খলীফা হিসেবে বাই'আত দেন। এভাবে তিনিও মুসলিমদের বাই'আতের মাধ্যমে খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হন।

সাহাবীদের বাই'আত দেয়ার প্রক্রিয়াকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে এটা পরিস্কারভাবে বোঝা যায় যে, প্রথমে জনগণের কাছে খলীফা পদপ্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হতো এবং এদের প্রত্যেককে অবশ্যই খলীফা হবার আবশ্যিক শর্তাবলী পূরণ করতে হত। তারপর উম্মাহ্'র প্রভাবশালী ব্যক্তি – যারা উম্মাহ্কে প্রতিনিধিত্ব করতেন তাদের মতামত সংগ্রহ করা হত। খোলাফায়ে রাশেদীনদের সময়ে উম্মাহ্'র প্রতিনিধি ছিলেন সাহাবা (রা.) কিংবা মদীনার অধিবাসীগণ। যে ব্যক্তি সাহাবীদের (রা.) অথবা অধিকাংশ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন, তাকেই বাই'আত দেয়া হত এবং তার আনুগত্য করা তখন মুসলিমদের উপর ফরয হয়ে যেত। এভাবেই মুসলিমরা খলীফাকে আনুগত্যের বাই'আত প্রদান করতো এবং তাদের নির্বাচিত খলীফাই শাসন ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে উম্মাহ্'র প্রতিনিধি হয়ে যেতেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনদের (রা.) বাই'আত দেবার ঘটনাসমূহ থেকে মূলতঃ এ বিষয়গুলোই বোঝা যায়। এছাড়া, উমর (রা.) এর ছয়জন ব্যক্তি মনোনীত করার বিষয়টি এবং উসমান (রা.) কে বাই'আত দেবার সময় যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছিল, তা থেকে আরও দু'টি বিষয় পরিস্কারভাবে বোঝা যায়। আর তা হল, প্রথমত একজন অন্তর্বর্তীকালীন আমীর (নেতা) এর উপস্থিতি, যিনি নতুন খলীফা নির্বাচিত হওয়া কালীন সময় উম্মাহ্'র দায়িত্বে থাকবেন এবং দ্বিতীয়ত খলীফার জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছয়জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

অন্তর্বর্তীকালীন আমীর

একজন খলীফার কাছে তার মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে কিংবা খলীফার পদ শূন্য হবার মত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে নতুন খলীফা নির্বাচিত হওয়া কালীন সময়ে মুসলিমদের বিষয়াবলী দেখশুনা করার জন্য একজন অন্তর্বর্তীকালীন আমীর নিয়োগ করার ক্ষমতা খলীফার রয়েছে। পূর্ববর্তী খলীফার মৃত্যুর পর তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং তার প্রধান কাজ হবে তিনদিনের ভেতর নতুন খলীফা নির্বাচিত করা।

নতুন কোন আইন গ্রহণ করবার ক্ষমতা অন্তর্বর্তীকালীন খলীফার নেই। কারণ, এটি কেবলমাত্র উম্মাহ্'র বাই'আতের মাধ্যমে নির্বাচিত খলীফার জন্য সংরক্ষিত। খলীফা পদের জন্য মনোনীতদের মধ্য হতে কেউ অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হতে পারবেন না কিংবা মনোনীতদের কাউকে তিনি সমর্থন করতে পারবে না। কারণ, উমর (রা.) তাঁর মনোনীত ছয়জনের মধ্য হতে কাউকে অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হিসেবে নিয়োগ দেননি।

নতুন খলীফা নির্বাচিত হওয়া মাত্রই অন্তর্বর্তীকালীন আমীরের কার্যকাল শেষ হয়ে যাবে, কারণ তার মেয়াদ অস্থায়ী এবং দায়িত্ব একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের (নতুন খলীফা নির্বাচিত করা) মধ্যেই সীমিত।

শুয়াইব (রা.) যে উমর (রা.) কর্তৃক নির্বাচিত অন্তর্বর্তীকালীন আমীর ছিলেন তা উমর (রা.) এর মনোনীত ছয়ব্যক্তি সম্পর্কিত উক্তি থেকে বোঝা যায়: "যে তিনদিন তোমরা আলোচনা করবে সে সময় শুয়াইব তোমাদের সালাতে ইমামতি করবে।" এরপর তিনি বলেছিলেন, "...যদি (ছয়জনের মধ্যে) পাঁচজন একব্যক্তির (খলীফা হবার) ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছে এবং একজন দ্বিমত পোষণ করে তাহলে তরবারি দিয়ে তার মস্তক উড়িয়ে দেবে...।" এটা প্রমাণ করে যে, শুয়াইব (রা.) কে তাদের উপর কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল। এছাড়া, শুয়াইব (রা.) কে সালাতের ইমামও নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সে সময়ে সালাতে ইমামতির অর্থ ছিল জনগণের উপরও ইমাম (নেতা) নিযুক্ত হওয়া। এছাড়া, তাঁকে শাস্তি প্রদানের (মস্তক উড়িয়ে দেয়ার) ক্ষমতাও দেয়া হয়েছিল এবং আমরা জানি যে, একমাত্র আমীরই কোন ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করার ক্ষমতা রাখেন।

আমীর নির্বাচনের এ ঘটনাটি একদল সাহাবীদের সম্মুখেই ঘটেছিল এবং এ বিষয়ে তারা কেউ কোন দ্বিমত পোষণ করেননি। সুতরাং, এটি ইজমা আস-সাহাবা বা সাহাবীগণের ঐক্যমত যে, নতুন খলীফা নির্বাচিত হবার পূর্বে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে উম্মাহ্'র বিষয়াবলী এবং নতুন খলীফা নিযুক্ত করার প্রক্রিয়া সমূহ দেখাশুনা করার জন্য একজনকে আমীর নিযুক্ত করার ক্ষমতা খলীফার রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, খলীফা তার জীবদ্দশায় রাষ্ট্রের সংবিধানে এ অনুচ্ছেদটি সংযুক্ত করতে পারেন যে, যদি কোন খলীফা অন্তর্বর্তীকালীন আমীর নিযুক্ত না করেই ইন্তেকাল করেন, তবে একজনকে অবশ্যই অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হিসাবে নিযুক্ত করতে হবে।

একইভাবে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, খলীফার শাসনকালের শেষের দিকে যদি তার পক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন আমীর নিয়োগ করা সম্ভব না হয়, তবে খলীফার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ্য প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী (Next Eldest Delegated Assistant) অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হবেন যদি না তাকে খলীফা পদের জন্য মনোনীত করা হয়। যদি তিনি খলীফা পদের জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হন, তাহলে তার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ্য প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হবেন। যদি খলীফার সব প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীই পরবর্তী খলীফা পদের জন্য মনোনীত হন, তবে খলীফার জ্যেষ্ঠ্য নির্বাহী সহকারীকে আমীর নিযুক্ত করা হবে এবং পূর্বের মতোই ব্যাপারটি চলতে থাকবে। যদি উল্লেখিত সকলেই মনোনীত হন তবে কনিষ্ঠ নির্বাহী সহকারী অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন।

যদি খলীফাকে কোন কারণে তার পদ থেকে অপসারণ করা হয় তাহলেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রেও একইভাবে খলীফার জ্যেষ্ঠ্য প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হবেন, যদি না তিনি মনোনীতদের মধ্যে কেউ হন। আর, যদি তিনি মনোনীতদের একজন হন তাহলে তার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ্য প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী আমীর নিযুক্ত হবেন এবং এভাবে প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীদের শেষব্যক্তি পর্যন্ত ব্যাপারটি চলতে থাকবে। প্রতিনিধিত্ব সহকারীদের সকলেই মনোনীত হলে, জ্যেষ্ঠ্য নির্বাহী সহকারী আমীর হবেন এবং পূর্বের মতোই ব্যাপারটি চলতে থাকবে। যদি উল্লেখিত সকলেই মনোনীত হন তবে কনিষ্ঠ নির্বাহী সহকারী অন্তর্বর্তীকালীন আমীর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন।

খলীফা যদি শত্রুর হাতে বন্দী হন সেক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। তবে, এক্ষেত্রে খলীফাকে উদ্ধার করার কোন সম্ভাবনা না থাকলে অন্তর্বর্তীকালীন আমীরের নির্বাহী ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ থাকতে হবে। এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা যথাযথ সময়ে উম্মাহ্'র কাছে উপস্থাপন করা হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই অন্তর্বর্তীকালীন আমীর খলীফা জিহাদে বা ভ্রমণে যাবার সময় যে ধরনের ডেপুটি বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন সেরকম কিছু নয়। রাসূল (সাঃ) যখন জিহাদে বা হিজ্জাত আল ওয়াদাতে যেতেন তখন এ রকম ডেপুটি নিয়োগ করতেন। জনগণের বিষয়াদি দেখাশুনা করার জন্য যতটুকু নির্বাহী ক্ষমতার দরকার হয়, সাধারণত এ ধরনের ডেপুটি খলীফা কর্তৃক ততটুকু নির্বাহী ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

মনোনীতদের তালিকা সংক্ষিপ্তকরণ

খোলাফায়ে রাশেদীনদের খলীফাপদে নিযুক্ত করার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকা সংক্ষিপ্তকরণের একটি বিষয় ছিল। বানু সা'ইদার প্রাঙ্গনে মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর (রা.), উমর (রা.), আবু উবাইদাহ (রা.) এবং সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)। কিন্তু, উমর (রা.) এবং আবু উবাইদাহ (রা.) নিজেদেরকে আবু বকরের সমতুল্য মনে করেননি, এজন্য তাঁরা আবু বকরকে চ্যালেঞ্জও করেননি। এ কারণে প্রতিযোগিতা আবু বকর ও সা'দ বিন উবাদাহ্র মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে, বানু সাইদা'র প্রাঙ্গণে উপস্থিত মদীনার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ আবু বকরকে বাই'আত দিয়ে খলীফা হিসাবে নির্বাচিত করলেন এবং এর পরদিন জনগণ আবু বকর (রা.) কে আনুগত্যের বাই'আত দিলেন।

আবু বকর (রা.) শুধুমাত্র উমর (রা.) কে তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। এ পদের জন্য তিনি অন্য আর কাউকেই মনোনীত করে যাননি। পরবর্তীতে, মদীনার মুসলিমরা প্রথমে উমরকে নিযুক্তির বাই'আত ও পরে আনুগত্যের বাই'আত প্রদান করে।

উমর (রা.) ছয়ব্যক্তিকে খলীফা পদের জন্য মনোনীত করেছিলেন এবং খিলাফতকে এদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছিলেন। সেইসাথে, তিনি জনগণকে ছয়জনের মধ্য হতে একজনকে পছন্দ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। মনোনীতদের মধ্য হতে আব্দুর রহমান (রা.) নিজেকে এ পদ থেকে সরিয়ে নিয়ে বাকী পাঁচজনের সাথে একান্তে আলোচনা করে সংখ্যাটি দুইয়ে নামিয়ে এনেছিলেন - এরা ছিলেন আলী (রা.) এবং উসমান (রা.)। পরবর্তীতে জনগণের মতামত যাচাই-বাছাই এর পর উসমান (রা.) দিকে পাল্লা ভারী হয় এবং উসমান (রা.) মুসলিমদের খলীফা নিযুক্ত হন।

আলী (রা.) কে খলীফা হিসাবে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে সে সময় খলীফা পদের জন্য আর কেউ মনোনীত না হওয়ায় মদীনা ও কুফার অধিকাংশ মুসলিম তাঁকেই বাই'আত দেয়। আর, এভাবেই তিনি চতুর্থ খলীফা হিসাবে নিযুক্ত হন।

যেহেতু উসমান (রা.) কে খলীফা হিসাবে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে (শারী'আহ্) অনুমোদিত সর্বোচ্চ সময়ের সবটুকুই নেয়া হয়েছিল; অর্থাৎ, তিনদিন ও এই দিনগুলোর মধ্যবর্তী দুই রাত এবং মনোনীত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছয়জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত করে দুই ব্যক্তিতে নামিয়ে আনা হয়েছিল, সেহেতু গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে সঠিকভাবে বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা বিস্তারিতভাবে এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করবো :

১. ২৩ হিজরীর জিলহজ্ব মাস শেষ হবার চারদিন আগে বুধবার ভোরে মিহরাবে নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় উমর (রা.)কে ছুরিকাঘাত করা হয়। অভিশপ্ত আবু লু'লুয়া'র ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে ২৪ হিজরীর মহররম মাসের প্রথমদিন রবিবার সকালে উমর (রা.) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উমর (রা.) এর ইচ্ছা অনুসারে শুয়াইব (রা.) তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান।

২. উমর (রা.) এর দাফনের পর, তাঁর পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুসারে আল মিকদাদ (রা.) উমরের মনোনীত ছয়ব্যক্তিকে একটি বাড়ীতে একত্রিত করেন; যাদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ছিল আবু তাল্হা'র উপর। এরপর, তাঁরা একে অন্যের সাথে আলোচনায় বসেন। পরবর্তীতে তাঁরা আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) কে তাঁদের মধ্য হতে এবং তাঁদের সম্মতিক্রমে খলীফা নির্বাচিত করার ব্যাপারে প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেন।

৩. আব্দুর রহমান (রা.) তাঁদের সাথে একান্তে আলোচনা করেন এবং প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলেন, "নিজেকে ছাড়া ছয়জনের মধ্যে আর কাকে তুমি এ পদের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে কর?" তাঁদের উত্তর আলী (রা.) এবং উসমানের (রা.) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছিল। এভাবে আব্দুর রহমান (রা.) বিষয়টি ছয়ব্যক্তি থেকে বিষয়টি দুইব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন।

৪. এরপর আব্দুর রহমান (রা.) মদীনার জনগণের সাথে আলোচনা করা শুরু করেন।

৫. বুধবার রাতে, অর্থাৎ (রবিবার) উমর (রা.) ইন্তেকালের পর তৃতীয় দিন রাতে আব্দুর রহমান তাঁর ভাতিজা আল মুসওয়ার ইবনে মাখরামার বাড়িতে গেলেন। এ বিষয়ে ইবনে কাসীর তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াতে বর্ণনা করেছেন যে :

"যখন উমরের মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনের রাত শুরু হল আবদুর রহমান তাঁর ভাতিজা আল মুসওয়ার ইবনে মাখরামার বাড়িতে গেলেন এবং বললেন, "দেখতে পাচ্ছি তুমি ঘুমাচ্ছো, কিন্তু আল্লাহ্'র কসম! গত তিনরাত আমি খুব কমই ঘুমের আনন্দ উপভোগ করেছি।" তিনরাত মানে রবিবার সকালে উমর (রা.) মারা যাবার পরে অর্থাৎ, সোম, মঙ্গল ও বুধবারের রাত। তারপর তিনি বললেন, "...যাও আলী এবং উসমানকে ডেকে নিয়ে এসো...", তারপর তিনি তাঁদেরকে (আলী ও উসমানকে) মসজিদে ডেকে নিয়ে আসলেন এবং জনসাধারণকে নামাজের জন্য ডাকা হলো। এটা ছিল বুধবার ভোরের ঘটনা। তারপর তিনি আলী (রা.) এর হাত ধরলেন এবং তাঁকে আল্লাহ্'র কিতাব, রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ ও আবু বকর ও উমর (রা.) এর কর্মের উপর বাই'আত করতে বললেন। আলী (রা.) তাঁকে তার সেই বিখ্যাত উত্তরটি দিলেন, "আল্লাহ্'র কিতাব ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্'র উপর আমি বাই'আত নিলাম। কিন্তু, আবু বকর ও উমরের কর্মের বিষয়ে তিনি বললেন যে, এ সকল বিষয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব ইজ্‌তিহাদ প্রয়োগ করবেন। এ কথা শুনার পর আব্দুর রহমান, আলীর হাত ছেড়ে দিলেন। এরপর, আব্দুর রহমান বিন আউফ, উসমান (রা.) এর হাতটি ধরলেন ও তাঁকেও একই কথা বলতে বললেন। উসমান (রা.) বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহ্'র নামে।' এভাবে উসমান (রা.) এর বাই'আত সম্পন্ন হল।

শুয়াইব (রা.) সেদিনের ফযর ও জোহরের নামাযে ইমামতি করলেন। এরপর, উসমান (রা.) মুসলিম উম্মাহ্'র খলীফা হিসেবে আসর থেকে ইমামতি শুরু করলেন। এর অর্থ হচ্ছে, যদিও উসমান (রা.) ফজরের সময় নিযুক্তির বাই'আত পেয়েছিলেন, কিন্তু মদীনার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের বাই'আত পাবার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিমদের আমীর হিসেবে শুয়াইব (রা.) এর কর্তৃত্বই বহাল ছিল। প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের বাই'আত দেবার পর্ব শেষ হয়েছিল মূলতঃ আসরের কিছু আগে, যখন সাহাবারা উসমান (রা.) কে বাই'আত দেয়ার ব্যাপারে একে অপরকে আহ্বান করছিলেন। আসরের কিছুকাল পূর্বে বাই'আত গ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথে আমীর হিসাবে শুয়াইব (রা.) এর কার্যকালও শেষ হয়ে যায় এবং আসরের নামায থেকে উম্মাহ্'র খলীফা হিসাবে উসমান (রা.) ইমামতি শুরু করেন।

'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থের রচয়িতা ব্যাখ্যা করেছেন, কেন উসমান (রা.) ফজরের সময় বাই'আত নেয়া সত্ত্বেও শুয়াইব (রা.) জোহরের নামাযে ইমামতি করেছিলেন। এ বিষয়ে তার ব্যাখ্যা হলঃ "কিছু মানুষ মসজিদে উসমানকে বাই'আত দেয়ার পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মাজলিশ আশ্-শুরা ভবনে (যেখানে শুরা কমিটির লোকজন মিলিত হতেন)। সেখানে বাকীরা তাঁকে বাই'আত দেয়। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, জোহর নামায অতিক্রান্ত হবার পরও উসমানের বাই'আত গ্রহণ পর্ব চলছিল। আর, এ কারণেই মসজিদে নববীতে জোহরের নামাযে শুয়াইব (রা.) ইমামতি করেছিলেন। সুতরাং, মুসলিম উম্মাহ্'র খলীফা হিসাবে উসমান (রা.) প্রথম যে নামাযে ইমামতি করেছিলেন তা ছিল আসরের নামায।"

বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে উমর (রা.) ছুরিকাহত হওয়ার দিন, আহত হবার পর তাঁর ইন্তিকালের দিন এবং উসমান (রা.) এর বাই'আতের দিনগুলোর ব্যাপারে কিছু মতপার্থক্য আছে। তবে, আমরা চেষ্টা করেছি দলিল-প্রমাণের দিক থেকে যেটি সবচাইতে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য সেটি উপস্থাপন করতে।

উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে, (খলীফার ইন্তিকাল কিংবা অপসারণের মাধ্যমে) খলীফার পদ শূন্য হওয়ার পর নতুন খলীফা মনোনয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে :

১. খলীফা নিয়োগের কাজটি দিন-রাত ব্যাপী করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি সম্পন্ন হয়।

২. খলীফা নিযুক্ত হবার আবশ্যিক শর্তাবলী পূরণের মাধ্যমে মনোনীতদের তালিকা করতে হবে এবং এ বিষয়টি মূলতঃ পরিচালিত হবে মাহ্‌কামাতুল মাযালিমের মাধ্যমে।

৩. তারপর মনোনীতদের তালিকা সংক্ষিপ্ত করা হবে দু'বারঃ প্রথমে ছয় এবং পরে দুই। উম্মাহ্'র প্রতিনিধি হিসাবে মাজলিশ আল-উম্মাহ্ এই সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরীর কাজ করবে। এর কারণ হল, উম্মাহ্ উমর (রা.) কে তাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিল এবং উম্মাহ্'র প্রতিনিধি হিসাবেই তিনি সম্ভাব্য ছয়জনের তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। পরবর্তীতে, মনোনীত এই ছয়জন তাঁদের মধ্য হতে একজনকে অর্থাৎ, আব্দুর রহমান বিন আউফকে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন। যিনি আবার আলোচনার ভিত্তিতে এই তালিকা সংক্ষিপ্ত করে তা দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিলেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি পর্যায়ে উম্মাহ্'র প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই বিষয়টি সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং, এটি উম্মাহ্'র প্রতিনিধিত্বকারী মাজলিশ আল-উম্মাহ্'র কাজ।

৪. নতুন খলীফা নির্বাচনের ঘোষণার সাথে সাথে অন্তর্বর্তীকালীন আমীরের কার্যকাল শেষ হবে না; বরং বাই'আত গ্রহণ পর্ব পুরোপুরি সম্পন্ন হবার পর তার কার্যকাল শেষ হয়ে যাবে। কারণ, শুয়াইব (রা.) এর কার্যকাল উসমান (রা.) খলীফা নির্বাচিত হবার সাথে সাথে শেষ হয়নি; বরং বাই'আত গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হবার পরই তা শেষ হয়েছিল।

তিন দিন এবং এদের অর্ন্তবর্তী রাত সমূহের ভেতর কিভাবে নতুন খলীফা নির্বাচিত করা যায় সে ব্যাপারে একটি বিল পাশ করা হবে। অবশ্য এটি ইতিমধ্যে কার্যকর হয়ে গেছে। ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা যথা সময়ে এটি উম্মাহ্'র কাছে উপস্থাপন করবো।

সুতরাং, মুসলিম উম্মাহ্'র যদি একজন খলীফা থাকে এবং কোন কারণে যদি তাকে অপসারণ করা হয় কিংবা তার মৃত্যু হয়, তবে এ সকল ক্ষেত্রে এ বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে। কিন্তু পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, মুসলিম উম্মাহ্'র উপর কোন খলীফা কর্তৃত্বশীল অবস্থায় নেই, তবে সেক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য শারী'আহ্ আইন বাস্তবায়ন করা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেবার জন্য তাদের উপর একজন খলীফা নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক হবে; ১৩৪২ হিজরীর ২৮ রজব তারিখে (১৯২৪ সালে ৩ মার্চ) ইস্তাম্বুলে খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় মুসলিমদের প্রতিটি ভূমিই খলীফা নিয়োগ দেবার জন্য উপযুক্ত, যে খলীফার উপর খিলাফত রাষ্ট্রের গুরুভার অর্পণ করা হবে। সুতরাং, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে কোন একটি দেশের জনগণ যদি কাউকে খলীফা হিসেবে বাই'আত দেয় এবং তার উপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাহলে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর উপর উক্ত খলীফাকে আনুগত্যের বাই'আত দেয়া ফরয হয়ে যাবে, অর্থাৎ তার শাসন-কর্তৃত্বকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে নিতে হবে। তবে, এটি শুধুমাত্র উক্ত খলীফাকে তার নিজ ভূমির জনগণ বাই'আতের মাধ্যমে তার উপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করার পরেই কার্যকরী হবে। যাই হোক, উক্ত রাষ্ট্রকে (যে রাষ্ট্রে খলীফা নিয়োগ করা হবে) নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে:

১. উক্ত রাষ্ট্রের শাসন-কর্তৃত্ব অবশ্যই মুসলিমদের হাতে থাকতে হবে। এ শাসন-কর্তৃত্ব কোন কাফির-মুশরিক রাষ্ট্র কিংবা শক্তির অধীনস্থ হতে পারবে না।

২. উক্ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ইসলামের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নিরাপত্তা অন্য সবকিছু ব্যাতীত শুধুমাত্র ইসলামের নামে হতে হবে এবং তা ইসলামী (মুসলিম) সেনাবাহিনীর হাতে থাকতে হবে।

৩. উক্ত রাষ্ট্রে ইসলামকে তাৎক্ষণিক, পূর্ণাঙ্গ এবং মৌলিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রমের সাথে খলীফাকে যুক্ত থাকতে হবে।

৪. খলীফাকে অবশ্যই নিয়োগের সকল আবশ্যিক শর্ত পূরণ করতে হবে, যদিও পছন্দনীয় শর্তসমূহ (preferred condition) পূরণ না করলেও চলবে।

যদি কোন রাষ্ট্র এ চারটি শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয় তাহলে শুধুমাত্র তাদের বাই'আতের মাধ্যমেই খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাদের মাধ্যমেই খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজটি সম্পন্ন হবে। সেইসাথে, তাদের নির্বাচিত খলীফা হবেন উম্মাহ্'র বৈধ খলীফা এবং এ অবস্থায় তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বাই'আত প্রদান করা শারী'আহ্ সম্মত হবে না।

এরপর যদি অন্য কোন রাষ্ট্র কাউকে খলীফা হিসাবে বাই'আত দেয় তবে তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে। কারণ রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"যদি দুই জন খলীফাকে বাই'আত দেয়া হয় তাহলে পরের জনকে হত্যা কর।" *(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৫৩)*

"প্রথমজনের বাই'আত সম্পূর্ণ কর, তারপরও প্রথমজনের।" *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৩৪৫৫)*

"যে ব্যক্তি কোন ইমামকে বাই'আত প্রদান করল, সে যেন তাকে নিজ হাতের কর্তৃত্ব ও স্বীয় অন্তরের ফল (অর্থাৎ সব কিছু) দিয়ে দিল। এরপর তার উচিত উক্ত ইমামের আনুগত্য করা। যদি অন্য কেউ এসে (প্রথম নিযুক্ত) খলীফার সাথে (ক্ষমতার ব্যাপারে) বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে দ্বিতীয় জনের গর্দান উড়িয়ে দাও।" *(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৪৪)*

বাই'আতের প্রক্রিয়া

পূর্বের আলোচনায় আমরা খলীফা নিয়োগের ক্ষেত্রে বাই'আত-ই যে একমাত্র ইসলাম সম্মত প্রক্রিয়া সে ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছি। বাস্তবে বাই'আত প্রদান প্রক্রিয়াটি হাতে হাত মিলানো কিংবা লেখার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত আছে যে, "যখন জনসাধারণ আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে সম্মত হল তখন আমি ইবনে উমরকে এটি লিখতে দেখেছি যে, 'আমি এই মর্মে লিখছি যে, আল্লাহ্'র কিতাব, রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ্ এবং আমার সাধ্যনুসারে আমি আমীর উল মু'মিনীন আবদুল মালিকের নির্দেশ শুনতে ও মানতে রাজী আছি।" অন্য যে উপায়েও বাই'আত দেয়া যেতে পারে।

তবে, কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্করাই বাই'আত দিতে পারবে। কারণ, অপ্রাপ্তবয়স্কদের বাই'আত গ্রহণযোগ্য নয়। আবু আকীল জাহ্রাহ ইবনে মা'বাদ তাঁর দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যিনি (ইবনে হিশাম) রাসূল (সাঃ) এর সময় জীবিত ছিলেন; তাঁর মা যয়নাব ইবনাতু হামিদ তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, **'হে আল্লাহ্'র রাসূল! তাঁর কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করুন।' তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, 'সে তো ছোট'। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হিশামের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন।** *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭২১০)*

বাই'আতে উচ্চারিত শব্দ সমূহের ব্যাপারে কোন সীমাবদ্ধতা নেই; তবে খলীফা যে আল্লাহ্'র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ্ দ্বারা শাসন করবেন এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি থাকা উচিত এবং যে ব্যক্তি বাই'আত দেবে সে যে সুসময়ে ও দুঃসময়ে এবং ভাল-মন্দ উভয় অবস্থাতেই খলীফার আনুগত্য করবে তাও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। উপরে উল্লেখিত বিষয়বস্তু অনুসারে বাই'আতে উচ্চারিত শব্দসমূহের ব্যাপারে পরবর্তীতে একটি আইন পাশ করা হবে।

কোন ব্যক্তি যখন খলীফাকে বাই'আত দেবে তখন প্রদত্ত বাই'আত উক্ত ব্যক্তির উপর আমানত হয়ে যাবে এবং সে চাইলেই এ বাই'আত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কারণ, খলীফা নিয়োগের ক্ষেত্রে বাই'আত প্রদান পর্যন্ত অন্যসব মুসলিমদের মতোই এটি তার অধিকার। কিন্তু, একবার বাই'আত প্রদান করলে সেখান থেকে হাত উঠিয়ে নেবার কোন অধিকার তার নেই। এমনকি সে চাইলেও তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে আল বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, একজন বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে ইসলামের ব্যাপারে বাই'আত দিল। কিন্তু তারপর সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। এরপর সে রাসূল (সাঃ) এর কাছে গিয়ে বলল,

"আমাকে বাই'আত থেকে মুক্ত করে দিন।' তিনি (সাঃ) তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর ঐ ব্যক্তি আবার আসল এবং একই দাবি করল কিন্তু রাসূল (সাঃ) আবারও তাকে প্রত্যাখান করলেন। তারপর সে ব্যক্তি শহর ছেড়ে চলে গেল। [এ পরিপ্রেক্ষিতে] রাসূল (সাঃ) বললেন, "এই শহর হচ্ছে কামারের জ্বলন্ত চুল্লীর মতো; এটি অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবং সেইসাথে, শ্বাশত সুন্দর ও সত্যকে আলোকদ্যুতির মতো বিচ্ছুরিত করে।" *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭২০৯)*

এছাড়া, আব্দুল্লাহ্ ইবন উমরের বরাত দিয়ে মুসলিম নাফিঈ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবন উমর (রা.)) রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন,

'যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত সরিয়ে নিল, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে আল্লাহ্'র সাথে দেখা করবে যে তার পক্ষে কোন প্রমাণ থাকবে না।' *(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৫১)*

বস্তুতঃ খলীফার বাই'আত থেকে হাত উঠিয়ে নেবার অর্থ হল আল্লাহ্'র আনুগত্য থেকে হাত সরিয়ে নেয়া। তবে, এটি শুধুমাত্র সে অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন খলীফাকে নিযুক্তির বাই'আত দেয়া হবে কিংবা মুসলিম উম্মাহ্ খলীফাকে পূর্ণ আনুগত্যের শপথ প্রদান করবে। তবে, কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে খলীফা হিসাবে মনোনীত করে বাই'আত দেয়, কিন্তু উক্ত মনোনীত ব্যক্তি যদি মুসলিম উম্মাহ্ কর্তৃক নিযুক্তির বাই'আত না পায়, তবে এক্ষেত্রে বাই'আত দানকারী ব্যক্তি তার প্রদত্ত বাই'আত থেকে হাত সরিয়ে নিতে পারবে। কারণ, সে মুসলিম উম্মাহ্ কর্তৃক নিযুক্তির বাই'আত প্রাপ্ত হয়নি। মূলতঃ উপরোক্ত হাদীসটি (চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত) খলীফার আনুগত্য থেকে হাত সরিয়ে নেবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে; এমন ব্যক্তির উপর থেকে নয় যিনি খলীফা হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হননি।

খিলাফতের ঐক্য

হুকুম শারী'আহ্ অনুযায়ী মুসলিমরা একই রাষ্ট্রে বসবাস করতে এবং একজন শাসক দ্বারা শাসিত হতে বাধ্য। কারণ, মুসলিমদের জন্য একের বেশী রাষ্ট্র থাকা এবং একই সময়ে একাধিক খলীফা বর্তমান থাকা অবৈধ। এছাড়া, খিলাফত রাষ্ট্র হল একটি ঐক্যবদ্ধ শাসনব্যবস্থা। পশ্চিমাদের ফেডারেল ব্যবস্থা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়।

এটা এ কারণে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন আমি আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে,

"যে ব্যক্তি কোন ইমামকে বাই'য়াত প্রদান করল, সে যেন তাকে নিজ হাতের কর্তৃত্ব ও স্বীয় অন্তরের ফল (অর্থাৎ সবকিছু) দিয়ে দিল। এর পর তার উচিৎ উক্ত ইমামের আনুগত্য করা। যদি অন্য কেউ এসে (প্রথম নিয়ুক্ত) খলীফার সাথে (ক্ষমতার ব্যাপারে) বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে দ্বিতীয়জনের গর্দান উড়িয়ে দাও।" *(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৪৪)*

মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, আফরাজাহ্ বলেছেন: তিনি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন,

'যখন কারও অধীণে তোমাদের বিষয়সমূহের ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, এমতাবস্থায় যদি কেউ তোমাদের বিভক্ত করতে আসে তবে তাকে হত্যা কর।' *(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৪৪)*

এছাড়া, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"যদি দুইজন জন্য খলীফার জন্য আনুগত্যের বাই'আত নেয়া হয়, তবে পরের জনকে হত্যা কর।" *(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৫৩)*

মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, আবু হাজিম বলেছেন যে, "আমি আবু হুরায়রার সাথে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেছি এবং তাকে বলতে শুনেছি: রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"বনী ইসরাইলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখন এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন তাঁর স্থলে অন্য নবী আসতেন, কিন্তু আমার পর আর কোনও নবী নেই। শীঘ্রই অনেক সংখ্যক খলীফা আসবেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন তখন আপনি আমাদের কি করতে আদেশ করেন? তিনি (সাঃ) বললেন, তোমরা একজনের পর একজনের বাই'আত পূর্ণ করবে, তাদের হক আদায় করবে। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের উপর (শাসকদের উপর) অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন।" *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৩৪৫৫)*

প্রথম হাদীস অনুসারে, যদি ইমামত বা খিলাফত কারও উপর ন্যস্ত করা হয় তবে তার আনুগত্য করতে হবে। এমতাবস্থায় কেউ যদি খলীফার কর্তৃত্বের ব্যাপারে বিবাদ করতে আসে তবে তার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। আর, সে যদি বিরত না হয় তবে তাকে হত্যা করতে হবে।

দ্বিতীয় হাদীস অনুসারে, মুসলিমরা যখন একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় থাকবে, এ অবস্থায় কেউ যদি তাদের ক্ষমতা ও ঐক্যে ফাটল ধরাতে চায় তবে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এ দুটি হাদীস খিলাফত রাষ্ট্রকে খন্ড খন্ড করার ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, রাষ্ট্রকে বিভক্ত করার বিষয়ে কঠোর সর্তকবাণী ঘোষণা করেছে এবং সেইসাথে, অস্ত্র বা শক্তি প্রয়োগ করে হলেও রাষ্ট্রকে খন্ড-বিখন্ড করার সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে।

তৃতীয় হাদীসটি নির্দেশ করছে যে, কোন কারণে যদি খলীফার অনুপস্থিতি থাকে – সেটা খলীফার মৃত্যু কিংবা অপসারণ কিংবা পদত্যাগ যে কারণেই হোক না কেন এবং এ অবস্থায় যদি দুইজন খলীফার জন্য আনুগত্যের বাই'আত নেয়া হয় তবে দ্বিতীয়জনকে হত্যা করতে হব। এর অর্থ হল, প্রথম যাকে বাই'আত দেয়া হবে তিনিই মুসলিমদের খলীফা হিসাবে বিবেচিত হবেন। অর্থাৎ, প্রথম ব্যক্তি ব্যতীত যত জনকেই বাই'আত দেয়া হোক না কেন তাদের প্রত্যেকের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, যদি তারা খলীফার পদ থেকে সরে না দাঁড়ায়। এ হাদীসটি আমাদের পরিস্কারভাবে নির্দেশ দেয় যে, রাষ্ট্রকে খন্ড-বিখন্ড করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং যে কোন মূল্যে খিলাফত রাষ্ট্রের অখন্ডতা বজায় রাখা মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য।

চতুর্থ হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রাসূল (সাঃ) এর পর বহু সংখ্যক খলীফা আসবেন। সাহাবাগণ যখন রাসূল (সাঃ) কে এইসব খলীফাদের ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন রাসূল (সাঃ) বললেন যে, সাহাবাদেরকে একজনের পর একজনের প্রতি আনুগত্যের বাই'আত সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিয়োগকৃত প্রথমজনকে বৈধ খলীফা হিসেবে মেনে নিতে হবে। প্রথমজনের পরে যে বা যারা খলীফা হিসেবে বাই'আত গ্রহণ করবে, সেই বাই'আত বাতিল ও অবৈধ বলে পরিগণিত হবে। কারণ, একজন খলীফা বর্তমান থাকা অবস্থায় অন্য কাউকে বাই'আত প্রদান করা নিষিদ্ধ। এই হাদীস আরও নির্দেশ করে যে, মুসলিমদের জন্য সর্বাবস্থায় একজন মাত্র খলীফার আনুগত্য বাধ্যতামূলক। সুতরাং, মুসলিমদের একের অধিক খলীফা থাকা এবং একাধিক রাষ্ট্র থাকা শারী'আহ্ অনুমোদিত নয়।

খলীফার নির্বাহী ক্ষমতাসমূহ

খলীফা নিম্নলিখিত নির্বাহী ক্ষমতাসমূহ ভোগ করবেন:

১. খলীফা মুসলিম উম্মাহ্'র বিষয়াবলী সম্পাদনের জন্য শারী'আহ্ আইন গ্রহণ (Adopt laws) করবেন – যে আইনগুলো আল্লাহ্'র কিতাব ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্'র ভিত্তিতে নির্ভরযোগ্য ইজ্‌তিহাদের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। আর এভাবেই এই আইনগুলো উম্মাহ্'র জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে এবং এগুলোকে কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

২. তিনি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণীর ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবেন; তিনি সমস্ত প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন এবং যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি চুক্তি সম্পাদন, যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ও অন্যান্য চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

৩. খলীফার বিদেশী দূত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা থাকবে এবং সেইসাথে থাকবে যে কোন রাষ্ট্রে মুসলিম দূত প্রেরণ কিংবা প্রত্যাহারের ক্ষমতা।

৪. খলীফা তার সহকারী ও ওয়ালী নিয়োগ ও অপসারণ করবেন। এরা সকলেই খলীফা ও মজলিসে উম্মাহ্'র কাছে জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৫. তিনিই সর্বোচ্চ বিচারপতি (কাজী-উল-কুয্‌যাত) এবং সেইসাথে, মাহ্‌কামাতুল মাযালিম ব্যতীত, অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ ও অপসারণ করবেন। মাহ্‌কামাতুল মাযালিমকে তিনি নিয়োগ করতে পারবেন, কিন্তু তাকে অপসারণের ক্ষেত্রে খলীফার কিছু সীমাবদ্ধতা থাকবে যা বিচারব্যবস্থা অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এছাড়া, তিনি প্রশাসনিক বিভাগের ব্যবস্থাপকবৃন্দ, সেনাকমান্ডার, চীফ অব স্টাফ, কমান্ডার ইন চীফ ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ করবেন। এরা সকলেই খলীফার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে; কিন্তু, মজলিসে উম্মাহ্'র কাছে তাদের কোনপ্রকার জবাবদিহিতা থাকবে না।

৬. তিনি যে শারী'আহ্ আইন গ্রহণ করবেন সেই আলোকেই রাষ্ট্রের বাজেট প্রণয়ন করা হবে এবং বাজেটের রাজস্ব আয় কিংবা ব্যয়ের খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা এবং প্রত্যেক বিভাগে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করা এ সবকিছুর ব্যাপারে তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন।

উপরোল্লিখিত ক্ষমতাগুলোর মধ্যে প্রথমটির ব্যাপারে সাহাবাগণের সাধারণ ঐক্যমত ছিল। '*কানুন*' একটি আভিধানিক শব্দ, যা বলতে বোঝায় সুলতান বা শাসক যে আদেশসমূহ জারী করেন এবং যা জনগণ মেনে চলতে বাধ্য থাকে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, "*কানুন হল একগুচ্ছ নিয়মনীতি, যা সুলতান (শাসক) জনগণকে মেনে চলতে বাধ্য করে।*" অন্যভাবে বললে বলা যায়, যদি সুলতান কোন বিধিবিধান জারী করেন তবে সেটাই মানুষের জন্য আইন হয়ে যায় এবং তাদেরকে এ নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। আর, বিধানটি যদি সুলতান কর্তৃক জারী না হয়, তবে জনগণের জন্য তা মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। আমরা জানি, মুসলিমরা আল্লাহ্'র আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য, সুলতানের নিজস্ব আদেশ-নিষেধ নয়। কিন্তু সাহাবীরা (রা.) কোন কোন ক্ষেত্রে শারী'আহ্ বিধিবিধানের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতেন। কারণ, কুর'আনের কিছু কিছু আয়াত ও রাসূল (সাঃ) এর হাদীসকে তাঁরা একে অন্যজন থেকে ভিন্নভাবে বুঝতেন ও ব্যাখ্যা করতেন। ফলে, তাঁরা কুর'আনের আয়াত ও রাসূল (সাঃ) এর হাদীসকে যেভাবে বুঝতেন সেটার উপরই আমল করতেন এবং সেটাই তাঁর জন্য শারী'আহ্ আইন বলে বিবেচিত হত। তবে, মুসলিম উম্মাহ্'র বিষয়সমূহ সুষ্ঠু ও সামগ্রিকভাবে পরিচালনা করার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যেকের নিজস্ব ইজ্‌তিহাদের পরিবর্তে একটি মাত্র মতামতকে গ্রহণ করা

অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অতীতে এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। যেমন: আবু বকর (রা.) মনে করতেন সব মুসলিমের জন্য সমানভাবে অর্থ বরাদ্দ করা উচিত, কারণ এ সম্পদে তাদের প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে। কিন্তু, উমর (রা.) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন যে, যারা রাসূল (সাঃ) এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে এবং যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদেরকে সমানভাবে বিবেচনা করা; কিংবা, ধণী ও গরীবের মাঝে সমানভাবে সম্পদ বন্টন করা সঠিক নয়। এজন্য আবু বকর (রা.) যখন খলীফা ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকেই কার্যকরী করেছিলেন এবং বিচারক ও ওয়ালীগণ তাঁর ইজতিহাদকেই বাস্তবায়ন করেছিলেন। এমনকি উমর (রা.) নিজেও তখন আবু বকরের (রা.) সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছিলেন এবং সেটাই বাস্তবায়ন করেছিলেন। পরবর্তীতে, উমর (রা.) যখন খলীফা ছিলেন তখন তিনি তাঁর নিজস্ব ইজ্‌তিহাদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সেটাই বাস্তবায়ন করেছিলেন, যা আবু বকরের গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন ছিল। যেমন: তিনি (রা.) মুসলিমদের মধ্যে সমানভাবে সম্পদ বন্টনের পরিবর্তে, তারা কতদিন যাবৎ মুসলিম হয়েছে কিংবা তাদের কতটুকু প্রয়োজন – এর ভিত্তিতে সম্পদ বন্টন করার নির্দেশ দিলেন। তাঁর শাসনামলে মুসলিমরা এই বিধানকেই মেনে নিয়েছিল এবং কাজী ও ওয়ালীরা তা বাস্তবায়নও করেছিল। সুতরাং, এ বিষয়ে সাহাবীদের (রা.) এই ঐক্যমত বা মৌন সম্মতি এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট শারী'আহ্ বিধান গ্রহণ করা ও সেটাকে বাস্তবায়ন করার অধিকার খলীফার রয়েছে। এছাড়া, এ বিধিবিধান সমূহ মুসলিমদের নিজস্ব ইজতিহাদের সাথে সাংঘর্ষিক হলেও তা মেনে নিতে হবে এবং ঐ বিষয়ে তাদের নিজস্ব ইজতিহাদকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। বস্তুতঃ খলীফার গ্রহণকৃত এই সমস্ত বিধিবিধান আসলে '*কানুন* বা আইন'। এর অর্থ হচ্ছে, যে কোন আইনকে কার্যকর করার ক্ষমতা একমাত্র খলীফার এবং এ ব্যাপারে আর কারও কোন অধিকার নেই।

খলীফার আলোচিত ২নং ক্ষমতার ব্যাপারে দলিল পাওয়া যায় রাসূল (সাঃ) এর কর্মকান্ড থেকে। তিনি (সাঃ) ওয়ালী এবং বিচারকদের নিয়োগ করতেন এবং তাদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করতেন। তিনি (সাঃ) ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং প্রতারণা ও ফটকাবাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেন। রাসূল (সাঃ) জনগণের মধ্যে অর্থ বিতরণ করতেন এবং কর্মহীনদের কাজের ব্যবস্থা করতেন। তিনি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সকল বিষয় দেখাশুনা ও পরিচালনা করতেন।

তিনি (সাঃ) বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্'র কাছে চিঠি পাঠাতেন এবং অন্যান্য রাষ্ট্র প্রেরিত দূতদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন ও তাদের অভ্যর্থনা জানাতেন। তিনিই রাষ্ট্রের সকল বৈদেশিক বিষয় দেখাশুনা করতেন।

অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি (সাঃ) কার্যকরীভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে নির্দেশ দিতেন এবং সেইসাথে যুদ্ধের সময়ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। এছাড়া, তিনি (সাঃ) তাঁর বাহিনীকে ছোট ছোট অভিযানে পাঠাতেন এবং এ অভিযানের নেতৃত্ব নির্ধারণ করে দিতেন। একবার তিনি (সাঃ) আল-শাম অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার সময় ওসামা বিন যায়িদ (রা.) কে এ অভিযানের নেতা নিযুক্ত করেন। কিন্তু, উসামা (রা.) অল্পবয়সী হবার কারণে সাহাবীরা (রা.) তাঁর এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু, রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে উসামার (রা.) নেতৃত্বই মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। এ ঘটনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সত্যিকার অর্থেই তিনি (সাঃ) সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন; কেবলমাত্র নামে মাত্র প্রধান ছিলেন না।

তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি কুরাইশ সম্প্রদায়, বনু কুরাইজা, বনু নাদির, বনু কাইনুকা, খায়বার এবং রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সময়ে যত যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল তিনি (সাঃ) প্রতিটি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, কেবলমাত্র খলীফারই যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার রয়েছে। এছাড়া, আল্লাহ্'র রাসূলই (সাঃ) বনু মাদলিজ এবং তাদের মিত্র বনু ধামরা'র সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তিনি আইলা গোত্রের প্রধান ইউহানা বিন রু'বার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিলেন এবং হুদাইবিয়ার সন্ধিতেও স্বাক্ষর করেছিলেন। যদিও হুদাইবিয়া সন্ধির সময় মুসলিমরা তাঁর (সাঃ) উপর ক্রোধান্বিত হয়েছিল এবং এ চুক্তি বাতিলের দাবি জানিয়েছিল, কিন্তু তিনি (সাঃ) তাঁদের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করেই এ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কেবলমাত্র খলীফারই চুক্তি স্বাক্ষরের নির্বাহী ক্ষমতা রয়েছে – সেটা শান্তি চুক্তি হোক কিংবা অন্য কোন চুক্তি হোক।

খলীফার ৩নং ক্ষমতার প্রমাণ হল, রাসূল (সাঃ) নিজে মুসাইলামার দুইজন দূতকে অভ্যর্থনা জানান এবং কুরাইশদের প্রতিনিধি আবু রাফি'র সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সাঃ) হিরাক্লিয়াস, খসরু, আল মুকাওকিস, আল হারিস আল গাসানী, হিরার রাজা, আল হারিদ আল হিমাইরী, ইয়েমেনের বাদশাহ্ ও আবিসিনিয়ার নাজ্জাশীর কাছে দূত পাঠান এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উসমান বিন আফফানকে কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করেন। এ ঘটনাগুলো প্রমাণ করে খলীফা বিদেশী দূত গ্রহণ ও প্রত্যাখান এবং সেইসাথে, যে কোন রাষ্ট্রে দূত প্রেরণ ও প্রত্যাহারের ক্ষমতা রাখেন।

খলীফার ৪নং ক্ষমতার প্রমাণ হচ্ছে, রাসূল (সাঃ) নিজে ওয়ালীদের নিয়োগ দিতেন; যেমন: তিনি মু'য়ায (রা.)কে ইয়েমেনের ওয়ালী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। এছাড়া, প্রয়োজনে তিনি (সাঃ) ওয়ালীদের পদ থেকে অপসারিতও করতেন, যেমন: সাধারণ জনগণের অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি (সাঃ) আল 'আলা বিন আল হাদরামীকে বাহরাইনের ওয়ালীর পদ থেকে অপসারিত করেন। এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওয়ালী বা গভর্ণরদের উক্ত উলাই'য়াহ্'র (প্রদেশ) জনগণ, খলীফা এবং মজলিস আল-উম্মাহ্'র কাছে জবাবদিহিতা রয়েছে। যেহেতু মজলিস আল-উম্মাহ্'তে সমস্ত উলাই'য়াহ্'র প্রতিনিধি রয়েছে, তাই ওয়ালীদের তাদের কাছেও জবাবদিহিতা রয়েছে। এটা হল ওয়ালী সম্পর্কিত দলিল-প্রমাণ।

আর, খলীফার সহকারীর ক্ষেত্রে বলা যায় যে, রাসূল (সাঃ) এর দুইজন সহকারী ছিলেন - আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.)। তিনি (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় এই দুইজনকে পদচ্যূতও করেননি কিংবা অন্য কাউকে তাঁদের স্থলাভিষিক্তও করেননি। যাই হোক, খলীফার সহকারীবৃন্দ খলীফার কাছ থেকেই কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং তারা তাদের যোগ্যতা অনুসারে তার ডেপুটি হিসাবেই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সুতরাং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, খলীফার তার সহকারীদের অপসারণ বা বরখাস্ত করার অধিকার রয়েছে। এ বিষয়টি অনেকটা প্রতিনিধি বা এজেন্টের সাথে তুলনীয়, যেখানে একজন ব্যক্তি চাইলে কোন কারণে তার প্রতিনিধিকে বরখাস্ত বা অপসারণ করতে পারে।

খলীফার ৫নং ক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, রাসূল (সাঃ) আলী (রা.)কে ইয়েমেনের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

আমর ইবনুল আস থেকে ইমাম আহমেদ বর্ণনা করেছেন যে, "বিবাদে লিপ্ত দুই ব্যক্তি [বিচারের আশায়] রাসূল (সাঃ) এর নিকটে আসলেন। তারপর তিনি (সাঃ) আমাকে [আমরকে] বললেন, 'হে আমর! তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দাও।' আমি বললাম, 'আপনিই এ কাজের ব্যাপারে আমার চাইতে বেশী যোগ্য।' তিনি (সাঃ) বললেন, 'তারপরেও'। অতঃপর আমি বললাম, 'এর বিনিময়ে আমি কি পাব?' তিনি(সাঃ) বললেন, 'তুমি যদি বিচার কর এবং তা যদি সঠিক হয় তাহলে তুমি দশ নেকী পাবে এবং যদি তুমি ভুল কর তাহলে এক নেকী পাবে।" *(এই হাদীসটি 'উকবাহ বিন 'আমির থেকেও বর্ণিত আছে; দেখুন: আল হাইছামী, মাজমা' আল যাওয়াইদ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯৮)*

উমর (রা.)ও বিচারক নিয়োগ ও অপসারণ করতেন। তিনি শুরাই'কে কুফার বিচারক নিয়োগ করেন এবং আবু মুসাকে বসরার বিচারক নিয়োগ করেন। এছাড়া, তিনি সুরাহ্বিল বিন হাসনাকে আল-শামের ওয়ালীর পদ থেকে অপসারিত করে তার স্থলে মুয়া'বিয়া (রা.) কে নিযুক্ত করেন। সুরাহ্বিল উমরকে জিজ্ঞেস করেন, "আমাকে কি অবাধ্যতা কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহীতার কারণে অপসারণ করা হয়েছে?" উমর (রা.) প্রত্যুত্তরে বলেন, "না, কিন্তু আমি আরও শক্তিশালী কাউকে চাচ্ছিলাম।" আলী (রা.) ও একসময় আবু আল আসওয়াদকে নিয়োগ দেন এবং পরবর্তীতে সরিয়ে নেন। আবু আল আসওয়াদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কেন আমাকে অপসারণ করলেন? আমি প্রতারণা করিনি কিংবা কোন অপরাধও করিনি।" আলী (রা.) বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি বিবাদমান লোকদের চাইতেও উচ্চস্বরে কথা বলছো।" উমর (রা.) এবং আলী (রা.) অন্যান্য সাহাবীদের (রা.) সম্মুখেই এ কাজগুলো করেছেন। কিন্তু, তাঁদের মধ্যে কেউ কখনও এ কাজগুলোকে অগ্রহণযোগ্য মনে করেননি বা এর নিন্দা করেননি। এর অর্থ হল, নীতিগতভাবে খলীফা বিচারক নিয়োগের অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং ইচ্ছে করলে যে কাউকে তিনি বিচারক নিয়োগের দায়িত্বও দিতে পারেন। এ বিষয়টি প্রতিনিধিত্বের অনুরূপ, যেখানে তিনি যে কাউকে তার সহকারী নিযুক্ত করতে পারেন এবং তার নির্বাহী ক্ষমতাগুলোর মধ্য থেকে যে কোন বিষয়ে তাকে দায়িত্বশীল করতে পারেন।

আর, মাযালিম আদালতের বিচারককে অপসারণ বা বরখাস্ত করার ব্যাপারে খলীফার যে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেটা শুধু সেই পরিপ্রেক্ষিতে, যখন উক্ত বিচারক খলীফা, তার কোন সহকারী কিংবা প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে উত্থিত যে কোন ধরনের অভিযোগ তদন্তকার্যে জড়িত থাকবেন; অর্থাৎ, তখন তাকে অপসারণ করা যাবে না। এ বিষয়টি শারী'আহ্ মূলনীতি থেকেই প্রণীত। হুকুম শারী'আহ্'র একটি মূলনীতি হল: "যা কিছু হারামের দিকে ধাবিত করে তা নিজেই হারাম।" কারণ, খলীফাকে যদি এ রকম পরিস্থিতিতে মাযালিম আদালতের বিচারককে বরখাস্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়, তবে তা বিচারকের রায়কে প্রভাবিত করবে এবং এর ফলে শারী'আহ্ আইন বাস্তবায়ন বাঁধার সম্মুখীন হবে – যা কিনা হারাম। সুতরাং, এ ধরনের পরিস্থিতিতে খলীফাকে মাযালিম আদালতের বিচারককে বরখাস্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হারাম কাজ সম্পাদনের একটি উপকরণ। এ অবস্থায় মাযালিম আদালতের বিচারককে বরখাস্ত করার ক্ষমতা রয়েছে শুধু মাহ্কামাতুল

মাযালিমের। আর, এ পরিস্থিতি ব্যতীত আর সবসময়ে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, খলীফা মাযালিম আদালতের বিচারককে নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন।

এছাড়া, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকের ক্ষেত্রে, রাসূল (সাঃ) নিজেই বিভিন্ন বিভাগের সচিবদের নিয়োগ দিতেন। তাদেরকে বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তিনি (সাঃ) হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা.) কে হিজাজ অঞ্চলের ফসল পরিমাপের দায়িত্ব দেন, আল মুয়াইক্বীব বিন আবি ফাতিমা আদ দুসিকে তার রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহৃত সীলমোহর ও গণীমতের মালামালের দায়িত্ব দেন এবং জুবায়ের বিন আল আওয়ামকে দানের (সাদাকা) অর্থ হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব দেন। এছাড়া, তিনি (সাঃ) আল মুগীরা বিন শু'বাকে ঋণ এবং বিভিন্ন ধরনের লেনদেন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দেন।

এছাড়া, সৈন্যদলের কমান্ডার এবং চীফ কমান্ডার নিয়োগের ক্ষেত্রে, রাসূল (সাঃ) হামজা বিন আবদুল মুত্তালিবকে সমুদ্রতীরে কুরাইশদের মুকাবিলা করার লক্ষ্যে ত্রিশজন অশ্বারোহী দলের কমান্ডার নিযুক্ত করেন এবং মুহাম্মদ বিন 'উবাইদা বিন হারিছকে ষাটজন যোদ্ধার কমান্ডার নিযুক্ত করে তাঁকে রাবিগের ওয়াদি নামক স্থানে কুরাইশদের মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন। এছাড়া, তিনি (সাঃ) সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে বিশজন অশ্বারোহী দলের কমান্ডার নিযুক্ত করে তাঁকে মক্কার দিকে প্রেরণ করেন।

এ ঘটনাগুলো থেকে স্পষ্ট যে, রাসূল (সাঃ) নিজেই সেনাকমান্ডারদের নিযুক্ত করতেন; অর্থাৎ এটা প্রমাণিত যে, খলীফাই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি সেনাকমান্ডার ও সেনাবাহিনী প্রধানকে নিযুক্ত করার ক্ষমতা রাখেন।

উল্লেখিত পদসমূহে নিযুক্ত ব্যক্তিরা শুধুমাত্র রাসূল (সাঃ) এর কাছেই জবাবদিহী করতেন, আর কারো কাছে নয়। এটা প্রমাণ করে যে, বিচারকবৃন্দ, প্রশাসনিক বিভাগের ব্যবস্থাপকবৃন্দ, সেনাকমান্ডার, চীফ অব স্টাফ এবং বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ শুধুমাত্র খলীফার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। মজলিস আল-উম্মাহ্'র কাছে তাদের কোনরকম জবাবদিহিতা নেই। কেবলমাত্র খলীফার প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী, ওয়ালী ও আমীলগণ মজলিস আল-উম্মাহ্'র কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। কারণ, তারা হচ্ছেন শাসক। তারা ছাড়া আর কেউই মজলিস আল-উম্মাহ্'র কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়; বরঞ্চ বাকি সবাই একমাত্র খলীফার কাছে তাদের কাজের প্রতিবেদন পেশ করতে বাধ্য থাকবেন।

খলীফার ৬নং ক্ষমতার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয় বাজেটের রাজস্ব আয় এবং ব্যয় পুরোপরি শারী'আহ্ আইন-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শারী'আহ্ অনুমোদন ছাড়া কারও উপর এক টাকা করও ধার্য করা যাবে না কিংবা কোন ক্ষেত্রে এক টাকাও ব্যয় করা যাবে না। তবে, এই ব্যয়ের খুঁটিনাটি অর্থাৎ যা মূলতঃ বাজেট হিসাবে পরিচিত – তা খলীফার নিজস্ব ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দেয়া হবে [অর্থাৎ, খলীফা তার নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন]। রাজস্ব আয়ের ব্যাপারেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে; অর্থাৎ, এর খুঁটিনাটি খলীফার ইজতিহাদের উপরই ছেড়ে দেয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, খলীফাই খারাজ (ফসলী জমির উপর শারী'আহ্ প্রদত্ত কর), জিযিয়া (অমুসলিমদের উপর আরোপিত কর) এবং অন্যান্য কর ও রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ধার্য করবেন। রাস্তাঘাট নির্মাণ বা সংস্কার, হাসপাতাল তৈরী এবং অন্যান্য সকল ব্যয়ের পরিমাণ খলীফাই নির্ধারণ করবেন। বস্তুতঃ এ সমস্ত বিষয়ই খলীফার উপর ছেড়ে দেয়া হবে এবং তিনি তার নিজস্ব ইজতিহাদ ও মতামত অনুযায়ী এ সকল ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) আমীলদের কাছ থেকে রাজস্ব গ্রহণ করতেন এবং তা ব্যয় করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি (সাঃ) ওয়ালীদের অর্থ গ্রহণ ও তা ব্যয় করবার অনুমতি দিতেন; মুয়াজ (রা.) কে যখন তিনি (সাঃ) ইয়েমেনে ওয়ালী হিসাবে পাঠিয়েছিলেন তখন এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনরাও এ ধারা অব্যাহত রাখেন। খলীফা হিসাবে তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ মতামত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন এবং তা ব্যয় করতেন। কোন সাহাবী (রা.) এ ব্যাপারে কখনও দ্বিমত প্রকাশ করেননি কিংবা খলীফার অনুমতি ব্যতীত তাঁরা একটি পয়সাও ব্যয় করেননি। যখন উমর (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) কে ওয়ালী হিসেবে একটি উলাই'য়াহ্'র (প্রদেশ) দায়িত্ব দেন, তখন তিনি তাঁকে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়ের সাধারণ অধিকার প্রদান করেন। এ সবকিছুই প্রমাণ করে যে, বাজেটের বিভিন্ন বিষয় খলীফা কিংবা তার পক্ষ হতে কোন প্রতিনিধির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই প্রণীত হয়।

মূলতঃ এগুলোই হল খলীফার নির্বাহী ক্ষমতার বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ এবং এ সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হওয়া যায় ইমাম আহমাদ এবং ইমাম বুখারী বর্ণিত একটি হাদীস থেকে। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন:

'ইমাম (খলীফা) হল অভিভাবক এবং সে তার নাগরিকদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।' *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৮৯৩)*

এর অর্থ হল, নাগরিকদের সকল বিষয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব খলীফার এবং তিনি ইচ্ছে করলে যে কাউকে যে কোন দায়িত্বে নিযুক্ত করতে পারেন। তার এ ক্ষমতার ব্যাপারে প্রতিনিধিত্বের (Agency) হুকুম প্রযোজ্য হবে।

খলীফা শারী'আহ্ বিধান দিয়ে আইন গ্রহণে বাধ্য

খলীফা তার আইন গ্রহণের ক্ষমতার (Power of adopting laws) ক্ষেত্রে শারী'আহ্ বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য। তার এমন কোন আইন গ্রহণ করার অধিকার নেই যার কোন শারী'আহ্ দলিল নেই। এছাড়া, তিনি যে সব শারী'আহ্ বিধিবিধান অনুসরণ করবেন এবং (নিজস্ব কিংবা অন্য কারও) ইজতিহাদের যে পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তা দিয়েও আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সুতরাং, এমন কোন আইন গ্রহণ করা তার জন্য নিষিদ্ধ, যা তার অনুসৃত ইজতিহাদের পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক। একইসাথে, এমন কোন আইনকানুন জারি করাও তার জন্য নিষিদ্ধ, যা তার অনুসৃত আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং, আইন গ্রহণের ক্ষমতার ক্ষেত্রে খলীফার সীমাবদ্ধতা দু'টি।

খলীফার প্রথম সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ, আইন গ্রহণের ক্ষেত্রে খলীফা যে শারী'আহ্ বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য – এ ব্যাপারে শারী'আহ্ দলিল নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খলীফা সহ প্রতিটি মুসলিমকে তাদের সকল কাজের ক্ষেত্রে ঐশী বিধান (শারী'আহ্) মেনে চলা বাধ্যতামূলক করেছেন। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

'কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের বিষয় সমূহে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়।' **[সূরা নিসা : ৬৫]**

আইনপ্রণেতার (আল্লাহ্'র) বাণী বোঝার ক্ষেত্রে যদি কোনপ্রকার মতভেদের সৃষ্টি হয় (অর্থাৎ, কোন আয়াতের যদি একাধিক ব্যাখ্যা থাকে) তবে সেক্ষেত্রে, মুসলিমরা একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যার ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট শারী'আহ্ আইন অনুসরণ করতে বাধ্য। সুতরাং, (একই বিষয়ের জন্য অনুমোদিত) বিভিন্ন শারী'আহ্ আইন থেকে একটি নির্দিষ্ট আইনকে নিজের জন্য গ্রহণ করতে মুসলিমরা বাধ্য, যখন তারা উক্ত কাজটি সম্পাদন করতে চায় বা বিধানটি প্রয়োগ করতে চায়। এ নিয়মটি একইভাবে খলীফার কার্যসম্পাদনের জন্যও প্রযোজ্য; অর্থাৎ, যখন তিনি শাসনকার্য সম্পাদন করতে চান তখন এ বিধানটি সমভাবে তার উপরও প্রযোজ্য হবে। (অর্থাৎ, তাকেও এক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট শারী'আহ্ আইন অনুসরণ করতে হবে।)

২. বাই'আতের শপথে উচ্চারিত শব্দসমূহও খলীফাকে শারী'আহ্ আইন-কানুন দ্বারা শাসন করতে বাধ্য করে, কেননা খলীফা আল্লাহ্'র কিতাব ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্'র ভিত্তিতেই বাই'আত প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। সুতরাং, এ শপথ ভঙ্গ করা তার জন্য আইনত নিষিদ্ধ এবং যদি তিনি সজ্ঞানে ও দৃঢ়তার সাথে তা করে থাকেন তবে তা কুফরী হিসাবে বিবেচিত হবে। কিন্তু, তিনি যদি দৃঢ়তার সাথে তা না করে থাকেন, তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি অবাধ্য, পথভ্রষ্ট এবং বিদ্রোহী বলে বিবেচিত হবেন।

৩. বস্তুতঃ খলীফাকে শাসক হিসাবে নিয়োগ দেয়াই হয় হুকুম-শারী'আহ্ বাস্তবায়ন করার জন্য, সেকারণে মুসলিমদের শাসনের ক্ষেত্রে শারী'আহ্ আইন-কানুন ছাড়া অন্য কোনকিছু বিবেচনায় আনা তার জন্য নিষিদ্ধ। কারণ, হুকুম-শারী'আহ্ নিজেই একে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। যে ব্যক্তি হুকুম শারী'আহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে শাসন করবে, প্রকৃতঅর্থে সে তার ঈমানকেই ক্ষতিগ্রস্থ করবে। আর, এটা হচ্ছে এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে অকাট্য শারী'আহ্ দলীল রয়েছে। সুতরাং, খলীফা কেবলমাত্র হুকুম শারী'আহ্'র ভিত্তিতেই আইন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবেন এবং এ ব্যাপারে তিনি দায়বদ্ধ। এছাড়া, তিনি যদি দৃঢ়তার সাথে জেনেশুনে শারী'আহ্ ছাড়া অন্য কোনকিছুর ভিত্তিতে আইন গ্রহণ করেন তাহলে

তা প্রকাশ্য কুফরী হিসাবে বিবেচিত হবে। আর, তিনি যদি শারী'আহ্ বহির্ভূত ভিত্তিতে বিশ্বাস না করে তা বাস্তবায়ন করেন, তাহলে তিনি অবাধ্য, পথভ্রষ্ট এবং বিদ্রোহী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

আর, খলীফার দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে বলা যায় যে, খলীফা যে সমস্ত শারী'আহ্ বিধি-বিধান অনুসরণ করবেন এবং ইজতিহাদের যে পদ্ধতি অনুসরণ করবেন, তা দিয়েই তার কার্যাবলী সীমাবদ্ধ থাকবে। এ ব্যাপারে শারী'আহ্ দলিল হল, তিনি যে শারী'আহ্ আইন বাস্তবায়ন করবেন, ঐ আইনের ব্যাপারে তারই দ্বায়বদ্ধতা থাকবে, অন্য কারো নয়। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, খলীফা তার কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য ঐ নির্দিষ্ট শারী'আহ্ আইনটিই গ্রহণ করেছেন, যে কোন আইন গ্রহণ করেননি; তাই এ আইনের ব্যাপারে তার নিজস্ব দ্বায়বদ্ধতা রয়েছে। অর্থাৎ, খলীফা যদি কোন বিষয়ে নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন আইন গ্রহণ করেন কিংবা কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদ অনুসরণ করেন, তবে উক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট বিধানটি তার জন্য আল্লাহ্'র বিধান হিসাবে বিবেচিত হবে। তাই, মুসলিমদের জন্যও তাকে ঐ আইন গ্রহণ করতে হবে। অন্য কোন আইন গ্রহণ করা তার জন্য নিষিদ্ধ হবে কারণ, অন্য কোন আইনের ব্যাপারে তার কোন শারী'আহ্ দ্বায়বদ্ধতা নেই অর্থাৎ, এটি তার জন্য আল্লাহ্'র বিধান হিসাবে বিবেচিত নয় তাই, একইভাবে এটি মুসলিমদের জন্যও শারী'আহ্ বিধান বলে বিবেচিত হবে না। সুতরাং, জনগণকে শাসন করার ক্ষেত্রে তার গ্রহণকৃত শারী'আহ্ আইন সমূহের মাধ্যমেই তাকে বিধিবিধান জারি করতে হবে। তিনি এমন কোন আইন বা বিধি-বিধান জারি করতে পারবেন না যা তার অনুসৃত শারী'আহ্ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। কারণ, যদি তিনি তা করেন অর্থাৎ, তার গ্রহণকৃত শারী'আহ্ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোন (শারী'আহ্) আইনের মাধ্যমে তিনি যদি কোন বিধান জারি করেন, তবে এক্ষেত্রে তা হুকুম-শারী'আহ্'র সাথে সাংঘর্ষিক বলেই বিবেচিত হবে।

ইসতিনবাত বা ইজতিহাদের পদ্ধতির ভিন্নতার কারণেও শারী'আহ্'র হুকুম বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, খলীফা যদি আইনপ্রণেতার বাণী থেকে উৎসারিত ইল্লাহ্‌কে'ই (কোন হুকুম প্রণয়নের কারণ, effective legal cause of a rule) শারী'আহ্ সঙ্গত ইল্লাহ্ বলে মনে করেন এবং সেইসাথে, তিনি লাভ-ক্ষতিকে (মাসলাহা) শারী'আহ্ সঙ্গত ইল্লাহ্ কিংবা মাসালিহ্ মুরসালাকে (অসংজ্ঞায়িত পার্থিব লাভ-ক্ষতি) শারী'আহ্ সঙ্গত দলিল-প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা না করেন, তাহলে এটাই তার জন্য ইসতিনবাতের পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ, এ পদ্ধতিই তিনি নিজের জন্য গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে, তার গৃহীত বিধি-বিধান এই নীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং তিনি এমন কোন আইন গ্রহণ করতে পারবেন না যার দলিল-প্রমাণ মাসালিহ্ মুরসালাহ্'র উপর প্রতিষ্ঠিত; কিংবা, এমন কোন ক্বিয়াস গ্রহণ করতে পারবেন না যার ইল্লাহ্ আল্লাহ্'র বাণী থেকে উৎসারিত হয়নি। এই ধরনের শারী'আহ্ আইন তার জন্য আল্লাহ্'র বিধান হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং এ আইনকানুনের ব্যাপারে তার কোনপ্রকার দ্বায়বদ্ধতাও থাকবে না; কেননা তিনি এ সমস্ত বিধিবিধানের উৎসকে শারী'আহ্ সঙ্গত উৎস বলে বিবেচনা করেননি। সুতরাং, তার দৃষ্টিকোন থেকে এগুলো শারী'আহ্ আইন হিসাবে বিবেচিত হবে না। আর, যেহেতু এটি খলীফার জন্য শারী'আহ্ আইন হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না, সুতরাং একইভাবে এটি মুসলিমদের জন্যও শারী'আহ্ আইন হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি যদি (তার গৃহীত ভিত্তি ছাড়া) অন্য কোন ভিত্তির উপর আইনকানুন গ্রহণ করেন, তাহলে বিষয়টি এমন হবে যেন তিনি শারী'আহ্ ব্যতীত অন্যকিছুকে ভিত্তি করে আইন গ্রহণ করলেন, যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

আর, খলীফা যদি *মুকাল্লীদ* (অনুকারক) হন অথবা *মুজতাহিদ ফি মাসা'লা* হন অর্থাৎ একটি মাত্র বিষয়ের উপর তিনি ইজতিহাদ করে থাকেন; কিংবা তার যদি নিজস্ব কোন ইসতিনবাতের পদ্ধতি না থাকে, এ সমস্ত ক্ষেত্রে যে কোন শারী'আহ্ আইন গ্রহণ করার অধিকার তার রয়েছে, তার দলিল যাই হোক না কেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তার গ্রহণকৃত আইনকানুনের শারী'আহ্ সঙ্গত দলিল-প্রমাণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যে কোন বিধিবিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার কোনপ্রকার সীমাবদ্ধতা থাকবে না। শুধুমাত্র কোন বিষয়ে নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রেই তার সীমাবদ্ধতা থাকবে; কারণ তাকে তার গৃহীত বিধিবিধানের ভিত্তিতেই নির্দেশ প্রদান করতে হবে, অন্যকোন বিধানের উপর ভিত্তি করে নয়।

খিলাফত কোন যাজকতান্ত্রিক বা মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাই হচ্ছে খিলাফত রাষ্ট্র। সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের জন্য এটি হচ্ছে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। সুতরাং, যদি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে একজন খলীফাকে বৈধভাবে বাই'আত দেয়া হয় এবং পৃথিবীর কোন স্থানে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন বিশ্বের সকল মুসলিমদের জন্য আরেকটি খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

“যদি দুইজন খলীফার জন্য বাই’আত নেয়া হয়, তবে দ্বিতীয় জনকে হত্যা কর।” *(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৫৩)*

বস্তুতঃ ইসলামী ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে শারী’আহ্ আইনকানুন ও বিধিবিধান সমূহ বাস্তবায়ন করা এবং সেইসাথে, ইসলামের আহবানকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত করার লক্ষ্যেই খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলামী ধ্যান-ধারণার সাথে মানুষকে পরিচিত করিয়ে, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দিকে আহ্বান করে এবং সেইসাথে, আল্লাহ্’র রাস্তায় জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামের সুমহান বাণীকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে। খিলাফতকে আবার ইমামাহ্ বা ইমারাতুল মু’মিনীনও (বিশ্বাসীদের নেতৃত্ব) বলা হয়। এটি ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ার অস্থায়ী একটি পদ, পরকালের সাথে এ পদ সম্পর্কিত নয়। মানুষের মাঝে ইসলামকে বাস্তবায়ন করা এবং ইসলামের দাওয়াতকে বিস্তৃত করার জন্যই খিলাফত রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তাই, এটি অবশ্যই নব্যুয়তের চেয়ে আলাদা।

নব্যুয়ত হল একটি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক পদ। এটি আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। অপরদিকে খিলাফত হল একটি মানবীয় পদ; যেখানে মুসলিমরা যাকে ইচ্ছা তাকে বাই’আত দিতে পারে এবং মুসলিমদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তাকে নির্বাচিত করে খলীফা হিসাবে নিযুক্ত করতে পারে। আমাদের নবী মুহম্মদ (সাঃ) একজন শাসক ছিলেন যিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত শারী’আহ্’কে বাস্তবায়ন করেছিলেন।

সুতরাং, একদিকে তিনি যেমন নবী ও আল্লাহ্’র রাসূল ছিলেন, সেইসাথে তিনি (সাঃ) আল্লাহ্’র বিধানকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তাঁকে রিসালতের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি শাসনকার্য পরিচালনা করারও দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা’আলা) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ

‘এবং তাদের মধ্যে ফায়সালা করুন যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন তা দিয়ে।’ **[সূরা মায়িদাহ্ : ৪৯]**

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা’আলা) আরও বলেনঃ

‘আমরা এই কিতাব পূর্ণ সত্যতা সহকারে তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ্ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন, সে অনুসারে মানুষের মাঝে তুমি বিচার-ফায়সালা করতে পার।’ **[সূরা নিসা : ১০৫]**

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা’আলা) আরও বলেন,

‘হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের নিকট পৌছিয়ে দাও।’ **[সূরা মায়িদাহ্ : ৬৭]**

‘আর এ কুর’আন আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে; যেন আমি তোমাদের ও যাদের নিকট এটা পৌঁছাবে তাদের সকলকে সতর্ক ও সাবধান করে দেই।’ **[সূরা আনআম : ১৯]**

‘হে কম্বল আবৃতকারী! উঠো এবং সতর্ক কর।’ **[সূরা মুদ্দাসির : ১-২]**

সুতরাং, উপরোক্ত দলিল-প্রমাণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূল (সাঃ) দুটি পদের অধিকারী ছিলেন। একটি হল নবুয়্যত ও রিসালাতের পদ এবং অপরটি হল, মুসলিমদের নেতা হিসাবে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্’র নাযিলকৃত শারী’আহ্ বিধানসমূহ বাস্তবায়নের পদ।

তবে রাসূল (সাঃ) এর পর যারা খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন তারা শুধুমাত্র মানুষ ছিলেন; অর্থাৎ, এদের কেউই রাসূল ছিলেন না। সুতরাং, এটা সম্ভব যে, এই সমস্ত খলীফারা অন্য মানুষদের মতোই ভুলভ্রান্তি করতে পারেন কিংবা, অন্যমনস্ক, অমনোযোগী বা গুণাহ্’র কাজে লিপ্ত হতে পারেন ইত্যাদি। কারণ, তারা ছিলেন মানুষ। তাই, মানুষ হিসাবে তারা কেউই ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে ছিলেন না। রাসূল (সাঃ) আমাদের বলে গেছেন যে, ইমামগণ ভুল করতে পারেন কিংবা এমন কোন কাজও করতে পারেন যার জন্য জনগণ তাদের ঘৃণা করতে পারে বা অভিশাপ দিতে পারে, যেমনঃ তিনি অত্যাচারী হতে পারেন, (আল্লাহ্’র প্রতি) অবাধ্যতা প্রদর্শন করতে পারেন ইত্যাদি। তিনি আরও বলেছেন যে, ইমামগণ

প্রকাশ্যে কুফরীতেও লিপ্ত হতে পারেন। আবু হুরাইরা (রা.) রেওয়াতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

‘অবশ্যই ইমামগণ ঢালস্বরূপ যার পেছনে থেকে লোকেরা যুদ্ধ করে ও নিজেদের রক্ষা করে। সুতরাং তিনি যদি তাকওয়া অবলম্বন করবার আদেশ দেন এবং ন্যায়বিচারক হন তাহলে তিনি এ সমস্ত কাজের সমপরিমাণ পুরস্কার পাবেন। আর, যদি তিনি তার এর বিরুদ্ধে কিছু করেন তবে তিনি সমপরিমাণ শাস্তি পাবেন।’ *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-২৯৫৭)*

এর অর্থ হল, ইমামগণ আল্লাহ্’কে ভয় না করে অন্য কোন হুকুম দিতে পারেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

‘আমার পরে স্বার্থপরতা এবং এমন ঘটনা ঘটতে পারে যা তোমরা ঘৃণা করবে। সাহাবীগণ তখন বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের মধ্য হতে যারা ঐ ঘটনাগুলোর সাক্ষী হবে, তাদের আপনি কি করার আদেশ দেবেন?’ তিনি (সাঃ) তখন বললেন, ‘তোমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত তোমাদের অধিকার চাইবে।’ *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭০৫২)*

জুনাদা বিন আবু উমাইয়া হতে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, ‘আমরা উবাদা বিন আস সামিতকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে গেলাম এবং তাকে বললাম আল্লাহ্ তোমাকে পথ প্রদর্শন করুন! রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে শোনা একটি হাদীস আমাদের শোনাও যার মাধ্যমে তুমি উপকৃত হবে। তিনি বললেন :

‘রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের ডাকলেন এবং আমরা তাঁকে বাই’আত দিলাম। তিনি আমাদের কাছে যে ব্যাপারে বাই’আত গ্রহণ করেছেন সে ব্যাপারে বললেন যে, আমরা তাঁকে সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি কিংবা সুসময় ও দুঃসময় উভয় অবস্থায় তাঁর আদেশ শ্রবণ ও তাঁর আনুগত্যের শপথ নিয়েছি। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উপর যারা কর্তৃত্বশীল তাদের সাথে কোন বিবাদ করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের প্রকাশ্যে কুফরে লিপ্ত হতে দেখি, যে ব্যাপারে আমাদের কাছে আল্লাহ্ পক্ষ হতে শক্তিশালী দলিল রয়েছে।’ *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭০৫৫)*

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

‘যতটা সম্ভব মুসলিমদের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেবে। সুতরাং, যদি সম্ভব হয় তাহলে আসামীকে মুক্ত করে দাও; কেননা ইমামদের শাস্তির দেবার ক্ষেত্রে ভুল করার চেয়ে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে ভুল করা অধিকতর ভাল।’ *(সূনানে তিরমিযী, হাদীস নং-১৪২৪)*

সুতরাং, এইসব হাদীস এটাই প্রমাণ করে যে, ইমামদের পক্ষে ভুল করা, অমনোযোগী বা গুণাহের কাজে লিপ্ত হওয়া সম্ভব। এ সবকিছুর পরও রাসূল (সাঃ) তাকে মান্য করার নির্দেশ দিয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ইসলাম দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন এবং প্রকাশ্যে কুফরী থেকে বিরত থাকছেন ও গুণাহ্’র কাজে লিপ্ত হবার নির্দেশ না দিচ্ছেন। সুতরাং, রাসূল (সাঃ) এর পর যে সব খলীফা এসেছেন তারা সঠিক ও ভুল দুটোই করেছেন এবং তারা কেউই ভুলের উর্ধ্বে ছিলেন না। কারণ, তারা শুধু মানুষ ছিলেন, নবী ছিলেন না। সুতরাং, এটা বলা ভুল হবে যে খিলাফত একটি আধ্যাত্মিক রাষ্ট্র। বরং, এটা একটি মানবীয় রাষ্ট্র, যেখানে মুসলিমরা খলীফাকে ইসলামী শারী’আহ্’র বিধিবিধান সমূহ বাস্তবায়নের জন্য বাই’আত দিয়ে থাকে।

খলীফার মেয়াদকাল

খলীফার মেয়াদকাল সুনির্দিষ্ট নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি শারী’আহ্ মেনে চলবেন এবং এর বিধিবিধান সমূহকে কার্যকর করবেন এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি খলীফা পদে বহাল থাকবেন। এর কারণ হচ্ছে বাই’আত সংক্রান্ত দলিল-প্রমাণগুলো এসেছে অনির্দিষ্ট (মুতলাক) অর্থে, যেখানে কোন নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

‘যদি একজন আবিসিয়ান দাসও তোমাদের উপর কর্তৃত্বশীল হয়, যার চুল কিসমিসের মতো কালো, তবুও তোমরা তার কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে।’ *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭১৪২)*

অপর একটি বর্ণনা অনুসারে তিনি (সাঃ) বলেছেন যে,

'...যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তোমাদের আল্লাহ্'র কিতাব দ্বারা পরিচালিত করবেন।'

এছাড়া, হাদীসগুলোতে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে খোলাফায়ে রাশেদীনরা (রা.) এভাবে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাই'আত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা কেউই নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য খলীফা পদে নিযুক্ত ছিলেন না। বরং, প্রত্যেকেই তাঁদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, সাহাবীরা (রা.) এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে খিলাফতের দায়িত্ব কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়; বরং তা অনির্দিষ্টকালের জন্য। সুতরাং, যদি কোন খলীফাকে বাই'আত দেয়া হয়, তবে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে পদে বহাল থাকতে পারেন।

কিন্তু, খলীফার মধ্যে যদি এমন কোন পরিবর্তন সাধিত হয়, যা তাকে উক্ত পদের জন্য অযোগ্য হিসাবে প্রমাণ করে এবং তাকে অপসারণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সেক্ষেত্রে তার সময়কাল শেষ হয়ে যাবে এবং তাকে অপসারণও করা যাবে। তবে, এ বিষয়টিকে খলীফার পদে বহাল থাকার সময়কালের সীমাবদ্ধতা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। বরঞ্চ, খিলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবার ক্ষেত্রে কোন প্রকার শর্ত ভঙ্গ হলেই কেবল এ বিধানটি প্রযোজ্য হবে। বস্তুতঃ বাই'আত প্রদানের শব্দাবলী এবং সাহাবীদের ঐক্যমত অনুসারে খিলাফতের দায়িত্ব অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যই নির্ধারিত। প্রকৃতপক্ষে, খলীফার পদে বহাল থাকার সীমাবদ্ধতা সে কাজ দ্বারা নির্ধারিত, যে কাজের জন্য তিনি বাই'আত প্রাপ্ত হয়ে থাকেন; অর্থাৎ, আল্লাহ্'র কিতাব ও সুন্নাহ্'র ভিত্তিতে শাসন করা এবং শারী'আহ্ বিধিবিধান সমূহকে বাস্তবায়ন করতে খলীফা দ্বায়বদ্ধ। সুতরাং, তিনি যদি শারী'আহ্'কে সুউচ্চ না করেন কিংবা এর বাস্তবায়ন না করেন, তবে তাকে অবশ্যই অপসারণ করতে হবে।

খলীফার অপসারণ

খলীফা যদি এ পদে নিযুক্ত হবার সাতটি আবশ্যিক গুণাবলীর মধ্যে কোন একটি হারিয়ে ফেলেন তাহলে আইনগতভাবে তাকে অবশ্যই পদচ্যুত করতে হবে।

এ সিদ্ধান্তের একচ্ছত্র মালিক '*মাহ্কামাতুল মাযালিম*' – যিনি সিদ্ধান্ত নেবেন খলীফা আবশ্যিক গুণাবলীর কোনটি হারিয়ে ফেলেছেন কিনা। কারণ, কোন বিষয় যার জন্য খলীফাকে অপসারণ করা যায় অথবা তাকে পদচ্যুত করা জরুরী হয়ে পড়ে, তাকে বলা হয় '*মাযলিমা*' (অন্যায় কাজ)। এ বিষয়গুলোর সমাধান করা প্রয়োজন। তাই, খলীফার বিরুদ্ধে এ ধরনের কোন অভিযোগ থাকলে সেগুলো অবশ্যই তদন্ত করতে হবে এবং একজন বিচারকের সম্মুখে তার অপরাধ প্রমাণ করতে হবে। *মাহ্কামাতুল মাযালিম*-ই (অন্যায় কাজ তদন্তের জন্য নির্ধারিত আদালত) হচ্ছে একমাত্র দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান যা খলীফার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল অভিযোগ গ্রহণ করবে এবং এ আদালতের বিচারক এ ব্যাপারটি প্রমাণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ, *মাহ্কামাতুল মাযালিম* সিদ্ধান্ত নেবে খলীফা কোন আবশ্যকীয় শর্তাবলী ভঙ্গ করেছেন কিনা এবং তাকে অপসারণ করা প্রয়োজন কিনা। যদি এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং খলীফা পদত্যাগ করেন, তাহলে বিষয়টি এখানেই নিস্পত্তি হয়ে যাবে। আর, যদি মুসলিমরা মনে করে যে খলীফাকে পদচ্যুত করা উচিত; কিন্তু, খলীফা এ ব্যাপারে তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে এ বিষয়টি বিচারব্যবস্থার উপর ন্যস্ত করা হবে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"...অতঃপর কোন ব্যাপারে তোমরা যদি এক অপরের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত হও, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্য) আল্লাহ্ ও তার রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।" **[সূরা নিসা : ৫৯]**

অন্যভাবে বললে বলা যায়, উম্মাহ্'র যদি কর্তৃত্বশীল কারও সাথে বিরোধপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার অর্থ হচ্ছে এ বিরোধ হচ্ছে শাসক এবং উম্মাহ্'র মধ্যে। আর, এ বিরোধকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে উপস্থাপন করার অর্থ হল ইসলামী বিচারব্যবস্থা অর্থাৎ *মাহ্কামাতুল মাযালিমের* কাছে তা উপস্থাপন করা।

খলীফা নির্বাচনে মুসলিমদের জন্য বরাদ্দকৃত সময়কাল

খলীফা নির্বাচনে মুসলিমদের জন্য অনুমোদিত সর্বোচ্চ সময়কাল হল তিনদিন এবং তাদের মধ্যবর্তী রাতসমূহ। কাঁধে বাই'আত নেই এ অবস্থায় তিনরাতের বেশী থাকা যে কোন মুসলিমের জন্য হারাম। তিনরাতের সর্বোচ্চ সময়টুকু ব্যবহার

করা অনুমদিত এ কারণে যে, পূর্ববর্তী খলীফার মৃত্যু বা অপসারণ হওয়া মাত্রই পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করা মুসলিমদের জন্য ফরয বা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। তাই, মুসলিমরা যদি তিনদিন এবং এর মধ্যবর্তী রাতসমূহ খলীফা নির্বাচন কাজেই ব্যস্ত থাকে, তবে এক্ষেত্রে খলীফা নির্বাচনে এই বিলম্ব অনুমোদন যোগ্য হবে। যদি নির্ধারিত তিনরাত অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং তারপরেও এ সময়ের মধ্যে খলীফা নির্বাচিত না হয়, তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে। মুসলিমরা যদি খলীফা নির্বাচনে ব্যস্ত থাকে এবং এমন কোন কারণে খলীফা নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়, যা তাদের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার বাইরে, তবে এর জন্য তারা গুনাহ্গার হবে না। এর কারণ, এক্ষেত্রে তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আপ্রাণ চেষ্টায় রত ছিল এবং তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ ইবনে হাব্বান এবং ইবনে মাজাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

'আল্লাহ্ আমার উম্মাহ্'কে তাদের ভুল-ভ্রান্তি, ভুলে যাওয়া এবং তাদেরকে যে সব বিষয়ের জন্য বাধ্য করা হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা করে দিয়েছেন।' *(আল-নাওয়ায়ী, আল-মাজমু' শারহ্ আল-মুহাদ্দাব, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৫০)*

কিন্তু, তারা যদি সে চেষ্টায় রত না থাকে তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা গুনাহ্'র মধ্যে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন খলীফা নির্বাচিত হয় এবং একমাত্র তখনই তাদের কাঁধ থেকে গুনাহ্'র বোঝা অপসারিত হবে। তবে, খলীফা নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অবহেলা করার কারণে তারা যে গুনাহ্গার হয়েছিল, তা থেকে তারা মুক্ত হবে না। বরং, এটা তাদের কাঁধেই থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যে কোন মুসলিমকে গুণাহ্ করলে বা কোন ফরয দায়িত্ব পালন না করলে যেমন শাস্তি দেবেন এ জন্যও তাদের তেমন শাস্তি প্রদান করবেন।

খলীফার পদটি শূন্য হওয়া মাত্রই যে খলীফা নির্বাচন করার কাজে সম্পৃক্ত হতে হবে, এ বিষয়ে দলীল হল সাহাবীগণ (রা.) রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পরপরই একই দিনে, তাঁর (সাঃ) দাফনের পূর্বেই এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য বানু সাই'দা'র প্রাঙ্গনে মিলিত হয়েছিলেন। আবু বকরকে (রা.) খলীফা নিযুক্তির বাই'আত সেদিনই সম্পন্ন হয়েছিল। পরেরদিন মদীনার জনগণ আনুগত্যের বাই'আত প্রদানের জন্য মসজিদে সমবেত হয়েছিল।

আর, খলীফা নির্বাচনে সর্বোচ্চ সময়সীমা যে তিনদিন এবং তাদের মধ্যবর্তী রাতসমূহ, এ ব্যাপারে দলিল হল, যখন উমর (রা.) অনুভব করলেন যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন তখন তিনি একজন খলীফা নির্বাচনের জন্য (মাজলিসে) শুরার লোকদের দায়িত্ব দিয়ে তাদের তিনদিনের একটি সময়সীমা বেঁধে দিলেন এবং তিনদিন পার হয়ে যাবার পর যে কারও মতানৈক্যের জন্য যদি খলীফা নির্বাচন করা সম্ভব না হয় তাহলে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। হত্যা করার এ নির্দেশ মুসলিমদের মধ্য হতে পঞ্চাশ জন ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছিল, যদিও যে দলের মধ্য হতে কোন একজনকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই শুরা সদস্য ও উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী (রা.) ছিলেন। সাহাবীদের (রা.) উপস্থিতিতেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁদের কেউ এ নির্দেশের প্রতিবাদ কিংবা এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। তাই, এটা বলা যায় যে, মুসলিমদের তিনদিন এবং তাদের মধ্যবর্তী রাতসমূহের অধিক সময় খলীফাবিহীন অবস্থায় থাকা নিষিদ্ধ এটা সাহাবীদের (রা.) একটি সাধারণ ঐক্যমত। আর, কোন বিষয়ে সাহাবীদের (রা.) ঐক্যমত কুর'আন ও সুন্নাহ্'র মতোই শারী'আহ্ দলিল।

আল-মিশওয়ার ইবন মাকরামাহ্ থেকে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবন মাকরামাহ্) বলেছেন যে,

"রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর আব্দুর রহমান আমার দরজায় কড়া নাড়তে থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি জেগে উঠলাম। তিনি বললেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি ঘুমাচ্ছো। আল্লাহ্'র কসম! গত তিনরাত যাবত আমি ঘুমের আনন্দ উপভোগ করতে পারিনি...।" *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭২০৭)*

মদীনার লোকেরা ফজর নামাজের পর উসমান (রা.) কে বাই'আত প্রদান সম্পন্ন করলো।

সুতরাং, এটা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক যে, যখনই খলীফার পদ শূন্য হয়ে যায় তখনই পরবর্তী খলীফাকে বাই'আত প্রদানের কাজে সম্পৃক্ত হওয়া এবং তিনদিনের মধ্যে তা সম্পন্ন করা। আর, যদি মুসলিমরা নিজেদেরকে এ কাজে নিয়োজিত না করে, তাহলে এ ব্যাপারে নীরবতার জন্য পূর্ববর্তী খলীফার মৃত্যুর পর থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা গুনাহ্গার হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নীরব থাকবে। এ অবস্থা এখন বিরাজ করছে; যেখানে মুসলিমরা এখন গুনাহ্গার, কারণ তারা ১৩৪২ হিজরীর ২৮ রজব তারিখে খিলাফত বিলুপ্ত হবার পর এখন পর্যন্ত খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। কেবলমাত্র তারাই এ গুনাহ্'র হাত থেকে রক্ষা পাবে যারা এটা প্রতিষ্ঠিত করবার মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে আন্তরিকতার

সাথে একটি সত্যপন্থী ও সত্যনিষ্ঠ দলের সাথে গভীর প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। একমাত্র এক্ষেত্রেই কোন মুসলিম এ গুনাহ্’র হাত থেকে রক্ষা পাবে। মনে রাখতে হবে যে, এ পাপ ততখানি ভয়াবহ যতোটা রাসূল (সাঃ) হাদীসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন:

“যে ব্যক্তি কাঁধে বাই’আতের শপথ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলো সে যেন জাহেলিয়াতের (ইসলামবিহীন অবস্থায় মৃত্যু) মৃত্যুবরণ করল।” *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭০৫৪; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-৪৭৬৭)*

এই হাদীস এ অপরাধের ব্যাপকতাকে তুলে ধরে।

খলীফার প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী বা ডেপুটি

(*মু'ওয়ায়ীন আত তাফউয়ীদ*)

সহকারীরা হলেন *ওয়াযির* (মন্ত্রী) যাদেরকে খলীফা খিলাফতের দায়িত্ব পালনে তাকে সহযোগিতা করার জন্য নিযুক্ত করে থাকেন। খিলাফত রাষ্ট্রের অসংখ্য কাজ রয়েছে; বিশেষ করে তখন যখন রাষ্ট্রের সীমানা ক্রমান্বয়ে বড় হচ্ছে এবং তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় খলীফার একার পক্ষে খিলাফতের গুরুদায়িত্ব পালন করা খুবই কষ্টসাধ্য। এ কারণেই তার ভার বহন করা এবং তার দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করার জন্য সহকারীর প্রয়োজন।

তবে, কোন সীমাবদ্ধতা ছাড়া তাদের *ওয়াযির* (মন্ত্রী) বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। অন্যথায় ইসলামে *ওয়াযির* এর ধারণার সাথে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ, পুঁজিবাদী, গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মানবরচিত ব্যবস্থা অথবা, অন্য যে সকল ব্যবস্থা আমরা দেখে থাকি, তাদের ধারণার দ্বন্দ বা বিভ্রান্তি তৈরি হবে।

প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী বা *মু'ওয়ায়ীন আত তাফউয়ীদ* হলেন খলীফার শাসন ও কর্তৃত্বের দায়িত্বে সহায়তা করার জন্য খলীফা কর্তৃক নিয়োজিত *ওয়াযির* বা ডেপুটি। খলীফা বিভিন্ন বিষয়সমূহে শারী'আহ্ হুকুমের আওতায় সহকারীকে তার নিজস্ব মতামত এবং ইজতিহাদের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালনে তাকে তার (খলীফার) প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন। অর্থাৎ, খলীফা তার সহকারীকে সাধারণভাবে বিভিন্ন বিষয় নিরীক্ষণ ও তদারকি করার দায়িত্ব দেন এবং সাধারণভাবে তাদের প্রতিনিধিত্ব দিয়ে থাকেন।

আল হাকীম এবং আত তিরমিযী আবু সাইদ আল খুদরীর (রা.) রেওয়াতে বর্ণনা করেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে,

"আকাশে আমার দুই ওয়াযির জিবরাইল এবং মিকাইল এবং পৃথিবীতে আমার দুই ওয়াযির আবু বকর ও উমর।" *(আল-হাকিম, আল মুসতাদরাক, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০, হাদীস নং-৩০৪৬ এবং সূনানে তিরমিযী, হাদীস নং-৩৬৮০)*

উপরোক্ত হাদীসে *ওয়াযির* বলতে সাহায্যকারী এবং সহযোগী বলা হয়েছে – যেটা ভাষাগত অর্থ। একই ধরনের অর্থ পবিত্র কুর'আনেও পাওয়া যায়:

"আমার পরিবারের মধ্য থেকে একজন সাহায্যকারী (মন্ত্রী) পাঠান।" **[সূরা তোয়াহা : ২৯]**

এখানেও সাহায্যকারী এবং সহযোগী বোঝানো হয়েছে। হাদীসে *ওয়াযির* শব্দটি সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ হিসাবে আসেনি, যার মধ্যে যে কোন সাহায্য ও সহযোগিতা অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং, বলা যায় যে, খিলাফতের গুরুদায়িত্ব পালনে *ওয়াযির*গণ খলীফাকে সহায়তা করতে পারেন। আবু সাইদ খুদরির বর্ণিত হাদীসে যে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে তা শাসনকার্যে সহযোগিতার অর্থে সীমাবদ্ধ নয়, কেননা জিবরাইল এবং মিকাইলকে আকাশে রাসূল (সাঃ) এর সহযোগী বলা হয়েছে যার সাথে তাঁকে শাসনকার্যে সহযোগিতা করার কোন সম্পর্ক নেই। সে কারণে এখানে '*ওয়াযিরাই*' (আমার দুই *ওয়াযির*) ভাষাগত ছাড়া অন্যকোন অর্থ বহন করে না, যার অর্থ হচ্ছে আমার দুই সহকারী। এ হাদীস থেকে আরও বোঝা যায় যে, একের অধিক সহযোগী থাকাও অনুমোদন যোগ্য।

যদিও আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) সরাসরি রাসূল (সাঃ) এর সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন না, তবে কোন ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করা ছাড়াই তিনি (সাঃ) তাঁদেরকে শাসনকার্যসহ সব ব্যাপারে সহযোগিতা করার আবশ্যিক ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। আবু বকর (রা.) খলীফা হবার পর উমর (রা.) কে তাঁর সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং এ ব্যাপারে উমর (রা.) এর সহযোগিতা ছিল খুব প্রত্যক্ষ। যখন উমর (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন উসমান (রা.) এবং আলী (রা.) ছিলেন তাঁর সহকারীবৃন্দ। কিন্তু, শাসনের ব্যাপারে উমর (রা.) কে সহযোগিতা করতে তাঁদের দেখা যায়নি। তাঁদের অবস্থা ছিল রাসূলের (সাঃ) এর পাশে থাকা আবু বকর (রা.) ও উমরের (রা.) মতো। উসমান (রা.) এর সময় আলী (রা.) এবং মারওয়ান বিন আল হাকাম (রা.) ছিলেন তাঁর দুই সহকারী। যেহেতু আলী (রা.) কিছু ব্যাপারে উসমানের (রা.) উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন সেহেতু তিনি দূরে ছিলেন। কিন্তু, মারওয়ান বিন আল হাকাম বেশ প্রত্যক্ষভাবেই শাসনকার্যে উসমান (রা.) কে সহযোগিতা করেন।

যদি প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী সৎ হন তাহলে তিনি খলীফার জন্য বড় নেয়ামত হবেন। তিনি তাকে সব ভাল কাজের ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং তা সম্পাদনে তাকে সহায়তা করবেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

'যদি আল্লাহ্ আমিরের জন্য ভাল কিছু চান তবে তাকে একজন ভাল ওয়াযির দান করেন। আমির যখন কিছু ভুলে যান তখন সে তাকে তা স্বরণ করিয়ে দেন এবং আর স্বরণ থাকলে সে ব্যাপারে ওয়াযির তাকে সাহায্য করেন। যদি আল্লাহ্'র অন্য কোন ইচ্ছা থাকে তাহলে তাকে একজন মন্দ ওয়াযির দান করেন। তখন আমির যদি কিছু ভুলে যান ওয়াযির কিছু স্বরণ করিয়ে দেন না এবং যে কাজ স্বরণ আছে তা সম্পাদনে অসহযোগিতা করেন।' *(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-২৯৩২)*

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। আন নাববী এর সনদকে উত্তম বলেছেন এবং আল বাজ্জার তার নিজস্ব *ইসনাদ* সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যে ব্যাপারে আল হায়ছামি বলেছেন 'এর সকল বর্ণনাকারীরা সহীহ্'।

রাসূল (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনদের (রা.) সময়কার সহকারীদের কাজ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এইসব সহকারীদের কিছু বিশেষ কাজের জন্যও নিযুক্ত করা যায়, যেখানে তিনি সাধারণভাবে এই সমস্ত কাজের তদারকি করে থাকেন। আবার, তাকে সব বিষয় পর্যবেক্ষণ করবার জন্যও সাধারণভাবেও নিযুক্ত করা যায়। তাকে কোন একটি বিশেষ এলাকায় সাধারণ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া যায় কিংবা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ পর্যবেক্ষণের দায়িত্বও দেয়া যায়। আল বুখারী ও মুসলিম আবু হুরাইরা (রা.) এর রেওয়াতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাদাকার দায়িত্ব দিয়ে উমরকে প্রেরণ করলেন।' *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-১৪৬৮, সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-২২৭৪)*

ইবনে খুজায়মা এবং ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন যে,

'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন যি'রানার উমরা থেকে ফিরে আসলেন তখন তিনি আবু বকরকে হজ্জের ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন।' *(আল নাসাঈ, সুনান, হাদীস নং-২৯৯৩)*

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) রাসূল (সাঃ) এর সহকারী ছিলেন, যাদের সাধারণভাবে নির্দিষ্ট বিশেষ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, যদিও তাঁরা দু'জন *ওয়াযির* ও প্রতিনিধি হিসাবে সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন, যা কিনা প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রয়োজনীয়। উমর (রা.) এর শাসনামলে আলী (রা.) এবং উসমান (রা.) এরও একই অবস্থা ছিল। এমনকি আবু বকর (রা.) এর খিলাফতের সময়েও সব ব্যাপার সাধারণভাবে তদারকির জন্য উমরকে এমনভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল যে, কিছু সাহাবী (রা.) আবু বকরকে (রা.) বলেই বসলেন, **"আমরা বুঝতে পারি না খলীফা কে? উমর না তুমি?"** যদিও আবু বকর (রা.) উমরকে (রা.) কিছু সময়ের জন্য বিচারক পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন – যে ব্যাপারে আল হাফিযের সমর্থনে আল বায়হাকীর বর্ণনা পাওয়া যায়।

সুতরাং, রাসূল (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনদের (রা.) জীবনী থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সহকারীগণ কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও খলীফার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তবে, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা নির্দিষ্ট দায়িত্বে তাদের নিযুক্ত করার ব্যাপারটিও অনুমোদিত, কেননা রাসূল (সাঃ) আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) কে এবং আবু বকর (রা.) উমর (রা.) কে এভাবে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এটা এমন হতে পারে যে, একজনকে খিলাফত রাষ্ট্রের উত্তরপ্রান্ত এবং অন্যজনকে রাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রান্তের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। এছাড়া, খলীফার প্রথম সহকারীকে দ্বিতীয়জনের স্থানে এবং দ্বিতীয়জনকে প্রথমজনের স্থানে স্থানান্তরিত করারও অধিকার রয়েছে। তিনি একজনকে একটি বিশেষ এলাকায় দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতে পারেন এবং অন্যজনকে অন্য দায়িত্ব দিতে পারেন; তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালনে যে ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন সেভাবেই তার সহকারীদের দায়িত্ব দিতে পারেন। এজন্য তাদের নতুন কোন পদবীর প্রয়োজন নেই; শুধুমাত্র যা প্রয়োজন তা হল তাদের এক দায়িত্ব থেকে অন্য দায়িত্বে স্থানান্তরিত করা। কারণ, তাদের মূলতঃ সাধারণভাবে খলীফার যে কোন কাজে সহযোগিতা করার জন্যই নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এই সমস্ত কাজগুলো সহকারী হিসাবে তার দায়িত্বের মধ্যেই পরে। এক্ষেত্রে, *ওয়ালী*'র (গভর্ণর) কাজের সাথে সহকারীর কাজের পার্থক্য রয়েছে। কারণ, *ওয়ালী*'কে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সাধারণ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করা হয়, যেক্ষেত্রে তাদেরকে স্থানান্তরিত করা হয় না। যদি কোন কারণে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়, তবে তাকে প্রদত্ত নতুন দায়িত্বের জন্য পুণরায় নিযুক্ত করতে হয়; কারণ, তার

প্রথম নিযুক্তিকরণের মধ্যে পরের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত ছিল না। কিন্তু, সহকারীদের যেহেতু সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও প্রতিনিধিত্বের জন্য নিযুক্ত করা হয়, তাই তাকে স্থানান্তরিত করলে তার নতুন কোন পদবী বা নিযুক্তিকরণের প্রয়োজন হয় না। কারণ, মূলতঃ সহকারীদেরকে খলীফার সকল কাজের সাধারণ পর্যবেক্ষণ এবং তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই নিযুক্ত করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, খলীফা তার সহকারীদেরকে রাষ্ট্রের সমস্ত অঞ্চলে তার সমস্ত কাজ সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা দিয়ে নিযুক্ত করতে পারেন। আবার, তিনি তাদেরকে একটি বিশেষ দায়িত্বও দিতে পারেন, যেমনঃ একজনকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের (উলাই'য়াহ্) দায়িত্ব, আবার অন্যজনকে পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের দায়িত্ব ইত্যাদি। খলীফার একাধিক সহকারী থাকলে এক এক জনকে একেক দায়িত্বে নিযুক্ত করার এই ব্যবস্থা আবশ্যকীয়, যাতে করে তাদের কর্তব্য পালনে কোন প্রকার সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি না হয়।

সুতরাং, উপরোক্ত এই বিষয়গুলোর ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেঃ

- সহকারী নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীকে রাষ্ট্রের সর্বত্র সমস্ত কাজ সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে নিযুক্ত করা হবে।
- সহকারীর কাজের ক্ষেত্রেঃ তাদের রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হবে। অর্থাৎ, খিলাফত রাষ্ট্রকে বিভিন্ন উলাই'য়াহ্'তে বিভক্ত করে একেক জনকে একেক অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হবে। একজন সহকারী পূর্বাঞ্চলীয় উলাই'য়াহ্গুলো পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন, একইভাবে অন্যজন পশ্চিম দিক, আবার আরেকজন উত্তরাঞ্চল পরিচালনার ব্যাপারে খলীফাকে সাহায্য করবেন ইত্যাদি।
- সহকারীকে স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রেঃ নতুন নিয়োগ ব্যতিরেকেই সহকারীদের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চল কিংবা এক কাজ থেকে অন্য কাজের দায়িত্ব দিয়েই স্থানান্তরিত করা হবে। এক্ষেত্রে, তাকে নতুনভাবে নতুন কাজের জন্য নিযুক্ত করা হবে না। বরং, প্রথম নিয়োগের ভিত্তিতেই তাকে স্থানান্তরিত করা হবে, কারণ, মূলতঃ তাকে সাধারণভাবে সমস্ত কাজ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েই খলীফার প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী হবার শর্ত

খলীফা পদে নিযুক্ত হবার জন্য যে সব শর্ত প্রয়োজন, প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী হবার জন্যও একই শর্তাবলী পূরণ করতে হবে, যেমনঃ তাকে পুরুষ, মুক্ত, মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী এবং ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। এছাড়াও তাকে অবশ্যই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য হতে নির্বাচিত করতে হবে।

খলীফার প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীকে যে খলীফা হবার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে এক্ষেত্রে দলিল হল, যেহেতু প্রতিনিধির দায়িত্ব শাসনকার্য পরিচালনার অংশ সেহেতু তাকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। কারণ, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

'যারা নারীদেরকে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করে তারা কখনওই সফল হবে না।' *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং- ৪৪২৫)*

তাকে অবশ্যই আযাদ বা মুক্ত হতে হবে। কারণ, একজন দাসের তার নিজের কর্মকান্ড পরিচালনার ব্যাপারেই কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকে না, সুতরাং, জনগণের বিষয়াবলী দেখাশোনা করা ও তাদের শাসন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সেইসাথে, তাকে অবশ্যই পরিণত (*বালেগ*) হতে হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ

"তিন প্রকার ব্যক্তিকে জবাবদিহিতা থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছেঃ ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জেগে উঠে, নাবালক যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পরিণত হয় এবং উন্মাদ ব্যক্তি যতক্ষণ না সে মানসিকভাবে সুস্থ হয়।" *(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪৩৫৮)*

একই হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী তাকে অবশ্যই মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

'উন্মাদ ব্যক্তি যতক্ষণ না সে মানসিকভাবে সুস্থ হয়।'

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

"সে ব্যক্তি যে তার মস্তিষ্কের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিয়ন্ত্রণ ফিরে না পায়।"

এছাড়া, *মু'ওয়ায়ীন'*কে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। কারণ, ন্যায়পরায়নতাকে আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্যদানকারীদের শর্ত হিসাবে আরোপ করেছেন। তিনি বলেন:

'আর এমন দু'জন লোককে তোমরা সাক্ষী বানাবে যারা তোমাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ হবে।' **[সূরা আত-তালাক : ২]**

বৃহত্তর যুক্তিতে খলীফার সহযোগীর ন্যায়পরায়ণতার গুণাবলী থাকা আবশ্যকীয় বলে ধরা হয়েছে। এছাড়া, *মু'ওয়ায়ীন'*কে অবশ্যই শাসনকার্যে নিযুক্ত যোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতেই নিয়োগ করতে হবে, যেন সে খিলাফত পরিচালনা এবং শাসন-কর্তৃত্বের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে খলীফার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাকে সহায়তা করতে পারে।

প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর দায়িত্ব

প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর দায়িত্ব হলো তিনি যে সমস্ত কাজ সম্পাদন করতে চান তার ব্যাপারে খলীফাকে পুরোপুরি অবহিত করা। পরবর্তীতে, তিনি যে সব সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন এবং ব্যবস্থাপনা ও নিয়োগের ব্যাপারে যে সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছেন সে সম্পর্কে খলীফাকে অবহিত করবেন, যাতে করে তার ক্ষমতা খলীফার সমপর্যায়ভুক্ত না হয়। সুতরাং, তার দায়িত্ব হল কাজের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি খলীফাকে অবহিত করা এবং তারপর তা বাস্তবায়ন করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না খলীফা তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন।

মু'ওয়ায়ীন এর দায়িত্বের যে এ ধরনের প্রকৃতি হবে সে ব্যাপারে দলিল হল, একজন ডেপুটি নিযুক্ত প্রতিনিধি হিসাবে তার পক্ষ হয়েই কাজ করেন যিনি তাকে নিয়োগ করে থাকেন। সুতরাং, দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তিনি খলীফার জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত বা স্বাধীন হতে পারেন না। বরং, তিনি সবসময়ই খলীফাকে তার কাজের ব্যাপারে অবহিত করবেন, যেভাবে উমর (রা.) আবু বকরকে অবহিত করতেন যখন তিনি আবু বকর (রা.) এর *ওয়াযির* (সহকারী) ছিলেন। তিনি যে সব কাজ সম্পাদন করতে চাইতেন তা আগে থেকেই আবু বকর (রা.) কে অবহিত করতেন এবং তারপর তা বাস্তবায়ন করতেন। খলীফার সাথে আলোচনা বা তাকে অবহিত করার অর্থ এই নয় যে, সহকারীকে সবসময় প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে খলীফার অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে, কারণ তাহলে তা প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক হবে। খলীফার সাথে আলোচনা করার অর্থ হল বিষয়টির ব্যাপারে খলীফাকে অবহিত করা এবং তার সাথে পরামর্শ করা। এটা হতে পারে কোন এক প্রদেশে (*উলাই'য়াহ্*) একজন যোগ্য গভর্ণর বা *ওয়ালী* নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে, বাজারে খাদ্য ঘাটতির ব্যাপারে জনগণের অভিযোগের ব্যাপারে কিংবা রাষ্ট্রের যে কোন বিষয় সম্পর্কে। এটা এ রকমও হতে পারে যে, তিনি খলীফার নিকট কোন একটি বিষয় উপস্থাপন করতে পারেন, যাতে করে ভবিষ্যতে খলীফার অনুমতি ছাড়াই খুঁটিনাটি বিষয়সহ এ কাজটি সম্পাদন করা *মু'ওয়ায়ীন* এর জন্য বৈধ বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে, খলীফা যদি কোন কার্য সম্পাদন না করার জন্য কোন নির্দেশ জারি করেন, তবে তা বাস্তবায়ন করা যাবে না। তবে, খলীফার সামনে কোন বিষয় উপস্থাপনের অর্থ হল একটি প্রস্তাবকে সামনে নিয়ে যাওয়া ও তার সাথে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা; তার অনুমতি প্রার্থনা করা নয়। *মু'ওয়ায়ীন* ততক্ষণ পর্যন্ত যে কোন কাজ সম্পাদন করতে পারবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না খলীফা তাকে সেটি করতে বারণ করছেন।

সঠিক সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করা এবং ভুল সিদ্ধান্তকে সংশোধন করার জন্য খলীফাকে অবশ্যই *মু'ওয়ায়ীন* এর কাজ এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করতে হবে। কারণ, উম্মাহ্'র বিষয়সমূহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মূলতঃ খলীফার এবং তার ইজতিহাদের ভিত্তিতেই সমস্ত কার্যাবলী সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ বিষয়ে দলিল হল জনগণের দায়িত্বের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর হাদীস যেখানে তিনি (সাঃ) বলেছেন,

"ইমাম হলেন অভিভাবক এবং তিনি তার নাগরিকদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।" *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৮৯৩)*

সুতরাং, খলীফাকেই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং তিনিই তার নাগরিকদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। কিন্তু, *মু'ওয়ায়ীন* জনগণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল নন; বরং তিনি শুধুমাত্র তার কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, জনগণের দায়িত্বের বিষয়টি একমাত্র খলীফার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ কারণে, জনগণের প্রতি তার নিজ দায়িত্ব পালনের

স্বার্থেই খলীফাকে অবশ্যই *মু'ওয়ায়ীন* এর কাজ এবং কর্মদক্ষতার পর্যালোচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীরা কখনও ভুল-ভ্রান্তি করতে পারেন এবং খলীফাকে এ ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ ধরিয়ে দিতে হবে। এভাবে তাকে তার প্রতিটি সহকারীর কাজসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে। সুতরাং, বলা যায় যে, দু'টি কারণে খলীফা *মু'ওয়ায়ীন* এর কাজ পর্যালোচনা করতে বাধ্য – জনগণের প্রতি তার যে দায়িত্ব তা পরিপূর্ণভাবে পালনের জন্য এবং তার সহকারীদের সম্ভাব্য ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য। কাজেই, এ দু'টো কারণেই খলীফা তার সহকারীদের কাজসমূহ পর্যালোচনা করতে বাধ্য।

যদি প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং খলীফা সেটি অনুমোদন করেন, তখন কোন ধরনের সংশোধন বা পরিবর্তন ছাড়াই *মু'ওয়ায়ীন* এ কাজটি সম্পাদন করতে পারেন। আর, যদি *মু'ওয়ায়ীন* এর সম্পাদিত এ কাজের ব্যাপারে খলীফা কোন ধরনের আপত্তি জানান তাহলে এক্ষেত্রে বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে। যদি *মু'ওয়ায়ীন* সঠিকভাবে কোন একটি রায়কে বাস্তবায়ন করেন কিংবা, সঠিক খাতে বা প্রকল্পে কিছু অর্থ ব্যয় করে থাকেন, তবে এক্ষেত্রে *মু'ওয়ায়ীন* এর মতামতই প্রাধান্য পাবে। কেননা, নীতিগতভাবে এটা আসলে খলীফারই মতামত এবং আইনপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে *মু'ওয়ায়ীন* যা সম্পাদন করেছে তা সংশোধন বা বাতিল করার কোন অধিকার খলীফার থাকবে না। কিন্তু, *মু'ওয়ায়ীন* যদি অন্য কোন ধরনের কাজ করে থাকেন, যেমন তিনি যদি কোন *ওয়ালী* নিযুক্ত করে থাকেন কিংবা, (যুদ্ধের জন্য) কোন সেনাদল প্রেরণের প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন, তবে এ সকল ক্ষেত্রে *মু'ওয়ায়ীন* এর সিদ্ধান্তকে সংশোধন বা বাতিল করে খলীফা তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। কারণ, খলীফার তার নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার অধিকার রয়েছে, সুতরাং তার প্রতিনিধির সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের অধিকারও তার আছে।

এটা হল *মু'ওয়ায়ীন* কোন পদ্ধতিতে কাজ করবেন এবং খলীফা কিভাবে তার কর্মকান্ড পর্যালোচনা করবেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা। মূলতঃ এ বিষয়টি খলীফার যে কাজসমূহকে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় এবং যে কাজসমূহকে কোন প্রকার সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায় না তার উপর ভিত্তি করেই নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ, *মু'ওয়ায়ীন* এর কাজকে মূলতঃ খলীফার কাজ হিসাবেই ধরা হয়ে থাকে। এর ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায় যে, *মু'ওয়ায়ীন* এর জন্য নিজে শাসন করা কিংবা তার স্থলে অন্য কাউকে শাসক হিসাবে নিযুক্ত করা অনুমোদিত, যেভাবে বিষয়টি খলীফার জন্যও অনুমোদিত। কারণ, শাসনকার্য পরিচালনার সব শর্তই তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তিনি নিজে কোন অভিযোগের তদন্ত করতে পারেন বা কাউকে এ ব্যাপারে নিযুক্ত করতে পারেন। কারণ, অভিযোগের সকল শর্তও তার উপর প্রযোজ্য হবে।

এছাড়া, তিনি স্বয়ং জিহাদের দায়িত্ব নিতে পারেন বা কাউকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করতে পারেন; কারণ, যুদ্ধের সকল শর্তই তার জন্য প্রযোজ্য হবে। তিনি তার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন কার্য সম্পাদন করতে পারেন কিংবা এ কাজ সম্পাদনের জন্য তার পক্ষ হতে তিনি কাউকে নিযুক্ত করতে পারেন; কারণ, জোরালোভাবে কোন মতামতকে উপস্থাপন করা কিংবা ব্যবস্থাপনার সকল শর্তই তার জন্য প্রযোজ্য হবে। তবে, এর অর্থ এই নয় যে, খলীফাকে পূর্ব থেকে অবহিত করলে *মু'ওয়ায়ীন* যাই করুক না কেন খলীফা তা সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারবেন না। বরং, এর অর্থ হল তিনি খলীফার মতোই ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন; তবে, তিনি খলীফার পক্ষ হয়ে কাজ করেন এবং তার কাজের ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি স্বাধীন নন। সুতরাং, খলীফা *মু'ওয়ায়ীন* এর সাথে দ্বিমত করতে পারেন কিংবা, তার সম্পাদিত যে কোন কাজ পুনঃমূল্যায়ন, বাতিল বা সংশোধন করতে পারেন; তবে, এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, এটি প্রযোজ্য হবে শুধুমাত্র সেই সব বিষয়ের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে খলীফা তার নিজের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কাজ পুনঃমূল্যায়ন বা পরিবর্তন করতে পারেন।

আর, যদি *মু'ওয়ায়ীন* কোন একটি আইনকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করেন এবং সঠিক ক্ষেত্রে কোন অর্থ ব্যয় করেন তখন এক্ষেত্রে খলীফা'র কোন আপত্তি অবৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং *মু'ওয়ায়ীন* এর গৃহীত সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হবে। কারণ, নীতিগতভাবে এটি খলীফা'র নিজস্ব মতামত হিসেবে গণ্য হবে এবং এ সকল ক্ষেত্রে তার নিজের সম্পাদিত বা বাস্তবায়িত কর্মকান্ডকেও তিনি পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারবেন না। সুতরাং, তিনি তার সহকারীর কাজকেও বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবেন না। অন্যদিকে, *মু'ওয়ায়ীন* যদি একজন *ওয়ালী*, প্রশাসক, আর্মি কমান্ডার বা অন্য কাউকে নিয়োগ দেন অথবা তিনি যদি কোন অর্থনৈতিক কৌশল, সামরিক পরিকল্পনা কিংবা শিল্পায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তখন খলীফা এগুলোকে বাতিল করে দিতে পারেন। কারণ, যদিও এগুলোকে খলীফার সিদ্ধান্ত হিসাবেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে, কিন্তু, এ সিদ্ধান্তগুলো এমন শ্রেণীতে পড়ে যেগুলো খলীফা নিজে গ্রহণ করলেও তা পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার তিনি রাখেন। সুতরাং, এ কারণে তিনি তার সহকারীর সিদ্ধান্তকেও বাতিল করতে পারেন। পরিশেষে বলা যায় যে, *মু'ওয়ায়ীন* এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা খলীফার জন্য অনুমোদিত। তবে এক্ষেত্রে মূলনীতি হল: খলীফা *মু'ওয়ায়ীন* এর সে সমস্ত কাজই পুনঃমূল্যায়ন বা পরিবর্তন করতে পারবেন যে সমস্ত কাজ তিনি নিজের ক্ষেত্রে পুনঃমূল্যায়ন বা পরিবর্তন করতে পারেন।

আর, তার নিজের যে সকল কাজ তিনি পুনঃমূল্যায়ন বা পরিবর্তন করতে পারেন না, তার *মু'ওয়ায়ীন* সে সকল কাজ সম্পাদন করবার পর তিনিও তা পুনঃমূল্যায়ন বা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কোন নির্দিষ্ট বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত করা যাবে না, যেমন: শিক্ষা বিভাগ। কারণ, প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় আমলা বা সচিবদের, যারা কিনা সরকারী কর্মচারী, শাসক নয়। কিন্তু, প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর পদ হল শাসকের পদ, কর্মচারীর পদ নয়। তার কাজ হল জনগণের বিষয়াদি দেখাশোনা করা, সরকারী কর্মচারী হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত করা নয়।

মূলতঃ এ কারণেই তিনি প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারবেন না। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, তিনি প্রশাসনিক বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, প্রশাসনিক বিষয়ে তার কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ নয়, বরং শাসক হিসাবে তার দায়িত্ব সাধারণ ও বিস্তৃত।

প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর নিয়োগ ও অপসারণ

খলীফার নির্দেশ অনুসারেই প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীকে নিযুক্ত ও অপসারণ করা হবে। খলীফার মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের ক্ষমতার মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে এবং শুধুমাত্র অন্তর্বর্তীকালীন আমীরের মেয়াদকাল ব্যতীত তারা আর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। অন্তর্বর্তীকালীন আমীরের মেয়াদ অতিক্রান্ত হবার পর যদি তারা দায়িত্ব পালন করতে চান তবে নতুন খলীফা কর্তৃক তাদের নিযুক্তিকরণকে নবায়ন করতে হবে। এছাড়া, তাদের বরখাস্তের ক্ষেত্রে কারও কোন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে না; কারণ পূর্বের খলীফা, যিনি তাদেরকে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, তার মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের ক্ষমতা রহিত হয়ে যাবে।

নির্বাহী সহকারীগণ

(*মু'ওয়ায়ীন আত তানফীদ*)

মু'ওয়ায়ীন আত তানফীদ এমন একজন সহকারী (*ওয়াযির*) যাকে খলীফা তার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কার্যকর, তদারকি এবং নির্দেশ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তার সহযোগী হিসাবে নিযুক্ত করে থাকেন। তিনি খলীফা এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ, জনগণ ও পররাষ্ট্র বিষয় সংক্রান্ত কার্যালয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী ব্যক্তি। তিনি খলীফার নিকটে এবং খলীফার নিকট থেকে বার্তা বহনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি খলীফার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার সহকারী, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন প্রকার ক্ষমতা তার নেই। অর্থাৎ, তার ভূমিকা বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা, কিন্তু শাসন করা নয়। তার কার্যালয় হচ্ছে এমন এক হাতিয়ার যার মাধ্যমে খলীফা আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কার্যালয়সমূহে তার জারিকৃত নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকেন। এবং এ সমস্ত কার্যালয়ের মাধ্যমে *মু'ওয়ায়ীন আত তানফিদ* এর কাছে যে সমস্ত বিষয় বা বার্তা আসবে এগুলোর প্রতিটির ব্যাপারেই তাকে খলীফার অধীনস্থ থাকতে হবে। সুতরাং, তার বিভাগ বা কার্যালয় খলীফা এবং অন্যান্যদের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী; যেখানে এ বিভাগ খলীফার পক্ষ থেকে তার বার্তা অন্যান্যদের কাছে পৌঁছে দেয় এবং সেইসাথে, অন্যান্যদের বার্তাও খলীফার কাছে বহন করে নিয়ে যায়।

নির্বাহী সহকারীকে রাসূল (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনদের সময়ে সচিব (*আল কাতিব*) বলা হত। এরপর, তিনি ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় চিঠিপত্র সংরক্ষণকারী দিওয়ান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তীতে, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, তাকে সমন্বয়কারী সচিব বা সমন্বয় বিভাগের সংরক্ষক বলা হবে। পরিশেষে, আইন বিশারদগণ তাকে নির্বাহী সহকারী (*মু'ওয়ায়ীন আত তানফীদ*) হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

খলীফা হলেন একজন শাসক যার কাজের মধ্যে শাসন, আইন বাস্তবায়ন এবং জনগণের বিষয়সমূহ দেখাশোনা করা অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু, শাসনকার্য পরিচালনা, আইন বাস্তবায়ন এবং জনগণের অভিভাবকত্বের সাথে প্রশাসনিক কর্মকান্ডও জড়িত। এজন্যই এমন একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপন করা প্রয়োজন যা কিনা খলীফার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে এবং খিলাফতের গুরুদায়িত্ব পালনে তাকে সহায়তা করবে। এ কারণে খলীফার একজন নির্বাহী সহকারী নিযুক্ত করা প্রয়োজন যিনি প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার ব্যাপারে খলীফাকে সহায়তা করবেন; কিন্তু, শাসনকার্যে নয়। তবে, এ সহকারী প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর মতো কোন দায়িত্ব পালন করবেন না। এটা তার জন্য অনুমোদিতও হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তিনি *ওয়ালী* বা *আমীল* নিয়োগ করতে পারবেন না কিংবা জনগণের বিষয়সমূহ পরিচালনা করতে পারবেন না। তার কর্মকান্ড নিতান্তই প্রশাসনিক। যেমন: খলীফা বা প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর শাসনকার্য সংক্রান্ত কোন নির্দেশ কিংবা প্রশাসনিক বিষয়ে তাদের কোন সিদ্ধান্তকে তিনি বাস্তবায়ন করবেন। মূলতঃ এ কারণেই তাকে নির্বাহী সহকারী বলা হয়। আইনবিশারদগণ তাকে '*ওয়াযির তানফিদ*' বলতেন যার অর্থ আসলে *মু'ওয়ায়ীন আত তানফিদ*। কারণ, *ওয়াযির* শব্দটির ভাষাগত অর্থ হল সহকারী। তারা বলেন, এ *ওয়াযির* বা সহকারী খলীফার সাথে জনগণ ও ওয়ালীদের সংযোগ স্থাপনের একটি মাধ্যম, যিনি খলীফার জারিকৃত আদেশসমূহ তাদের কাছে বহন করেন, তার আদেশ বাস্তবায়ন করেন, খলীফাকে ওয়ালীদের নিযুক্তির ব্যাপারে অবহিত করেন এবং সেইসাথে, টাস্কফোর্স গঠন ও রণাঙ্গনে সেনাদের অবস্থান সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। এছাড়া, এ সমস্ত কার্যালয় থেকে যে সমস্ত বার্তা তার কাছে আসে সেগুলোও তিনি খলীফার কাছে পৌঁছে দেন এবং নতুন কোন সমস্যা বা পরিস্থিতি উদ্ভুত হবার সম্ভাবনা থাকলে তিনি পূর্ব হতেই তা খলীফাকে অবহিত করেন, যেন এ ব্যাপারে তিনি খলীফার নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পারেন। এ সমস্ত কিছু তাকে আদেশ পালনে খলীফার সহকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু, কোন বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন ক্ষমতা দেয় না। তিনি বর্তমান কালের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের প্রধান সচিবের সমতুল্য।

যেহেতু নির্বাহী সহকারী প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর মতোই খলীফার সাথে সরাসরি যুক্ত সেহেতু তিনিও খলীফার অধীনস্থ সাহায্যকারীদের একজন। তার দায়িত্ব এমন যে, তাকে খলীফার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে, খলীফাকে সরাসরি তার কাজের তদারকি করতে হবে এবং প্রয়োজনে তাকে খলীফার সাথে একাকী, দিনে অথবা রাতে সাক্ষাৎ করতে হবে, যা কিনা ইসলামী শারী'আহ্ অনুসারে একজন নারীর বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। সে কারণে নির্বাহী সহকারীকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। এছাড়া, তিনি অমুসলিমও হতে পারবেন না, তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে; কেননা তিনি খলীফাকে সাহায্যকারী দলের অংশ। কারণ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে [ইহুদী, নাসারা কিংবা মুশরিকদের] অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের ক্ষতি করতে এতোটুকু কুণ্ঠিত হয় না। তারা তো শুধু তোমাদের ধ্বংস কামনা করে। বিদ্বেষ তাদের মুখ হতে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, আর তাদের অন্তর যা লুকিয়ে রেখেছে তা আরও ভয়াবহ।" **[সূরা আলি ইমরান : ১১৮]**

খলীফার অন্তরঙ্গ পরিমন্ডলে একজন অমুসলিমকে অন্তর্ভূক্ত করা যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ তা এ আয়াতে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং, প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর মত প্রত্যক্ষভাবে খলীফার সাথে যুক্ত থাকার কারণে নির্বাহী সহকারী কাফির হতে পারবেন না এবং তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। এছাড়া, খলীফা ও অন্যান্যদের মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রয়োজনে নির্বাহী সহকারীদের সংখ্যাও একাধিক হতে পারে।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে *মু'ওয়ায়ীন তানফীদ* খলীফা এবং অন্যদের মাঝে যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সেগুলো ৪ প্রকারেরঃ

১. আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ, খলীফা এ ব্যাপারে সরাসরি নির্দেশ দিতে পারেন কিংবা এর জন্য আলাদা একটি পররাষ্ট্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

২. সেনাবাহিনী।

৩. সেনাবাহিনী ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান।

৪. নাগরিকদের সাথে সম্পর্ক।

মূলতঃ নির্বাহী সহকারী এ সমস্ত বিষয়েই দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করবেন। যেহেতু তিনি খলীফা এবং অন্যান্যদের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী ব্যক্তি সেহেতু তাকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং তিনি খলীফার নিকট হতে ও খলীফার নিকটে তথ্য আদান-প্রদান করবেন। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় বিভাগ সমূহের কি কি কর্তব্য পালন করা উচিত তারও তদারকি করবেন।

খলীফা হলেন প্রকৃত শাসক। তিনিই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি শাসনকার্য পরিচালনা, আইন বাস্তবায়ন এবং জনগণের বিষয়সমূহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন। সে কারণে তাকে অব্যাহতভাবে শাসনযন্ত্র, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী এবং উম্মাহ্'র সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। তিনি আইন জারি করেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, জনসেবার দায়িত্ব নেন, শাসনযন্ত্র সমূহের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করেন এবং এদের কার্য সম্পাদনে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে ও যা কিছু প্রয়োজন হয় সে ব্যাপারে খোঁজখবর রাখেন। তার কাছেই উম্মাহ্'র সকল দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ এবং বিভিন্ন বিষয়ে উম্মাহ্'র প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করা হয় এবং সেইসাথে, তিনি আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীও পর্যবেক্ষণ করেন। সুতরাং, তার এ সকল কাজের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে *মু'ওয়ায়ীন আত তানফীদ* এদের মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি হিসেবে কাজ করেন অর্থাৎ উম্মাহ্'র বার্তা খলীফাকে পৌঁছে দেন এবং উম্মাহ্'কে খলীফার নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করেন।

বস্তুতঃ খলীফা বিভিন্ন বিভাগের ব্যাপারে যে সমস্ত নির্দেশ জারি করেন এবং তাদের নিকট থেকে খলীফার কাছে যে সমস্ত বার্তা আসে এগুলোর বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। মূলতঃ নির্বাহী সহকারী এ দায়িত্বটিই পালন করেন এবং তিনি এ সকল কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নকে নিশ্চিত করেন। তিনি খলীফার নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিভাগের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সভাপতিত্ব করবেন এবং খলীফা বিশেষভাবে কোন ক্ষেত্রে তাকে নিষেধ না করলে তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন। খলীফা কোন বিষয়ে দ্বিমত করলে সেক্ষেত্রে তার নির্দেশ পালনে নির্বাহী সহকারী বাধ্য; কেননা খলীফা হচ্ছেন শাসক এবং তার আদেশই বাস্তবায়ন করতে হবে।

সেনাবাহিনী ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত ব্যাপারগুলো সাধারণত গোপন ও শুধুমাত্র খলীফার এখতিয়ারভূক্ত। এ কারণে নির্বাহী সহকারী এ বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবেন না কিংবা এ সকল বিষয়ে কোনপ্রকার তদারকিও করবেন না, যদি না খলীফা তাকে বিশেষভাবে এ ব্যাপারে অনুরোধ করেন। যদি এ ধরনের পরিস্থিতি হয়, তবে এক্ষেত্রে তিনি শুধু সে সমস্ত বিষয়ই তদারকি করবেন যে বিষয়ে তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর অন্য কোন বিষয়ে নয়।

আর উম্মাহ্'র ব্যাপারে বলা যায় যে, জনগণের বিষয়সমূহ দেখাশোনা করা, তাদের দাবি-দাওয়া পূরণ করা এবং তাদের ভেতর হতে অন্যায় কার্যকলাপকে দূরীভূত করা – এ সবই খলীফা এবং তার নিযুক্ত প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর দায়িত্ব।

এগুলো নির্বাহী সহকারীর দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়। সুতরাং, তিনি এ সমস্ত বিষয়ে কোন প্রকার তদারকিও করবেন না, যদি না খলীফা এ ব্যাপারে কোন অনুরোধ জানান। এক্ষেত্রে, তার দায়িত্ব হবে শুধুমাত্র বাস্তবায়নের, তদারকির নয়। বস্তুতঃ এ সমস্ত কিছুই নিরূপিত হবে খলীফার কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এবং সেই অনুসারেই *মু'ওয়ায়ীন আত তানফীদ*-এর কাজের প্রকৃতি নিরূপিত হবে।

রাসূল (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনদের (রা.) সময়ে নির্বাহী সহকারীর (যাকে তখন সচিব বলা হত) কাজের উদাহরণ নিম্নরূপঃ

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদাহরণঃ

- আল মুসওয়ার ও মারওয়ানের সূত্রে আল বুখারী হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে,

'সুতরাং, নবীজি সচিবকে ডেকে পাঠালেন...'

কিতাব উল খারাজ বইয়ে আবু ইউসুফ বলেছেন,

"মুহম্মদ ইবনে ইসহাক এবং আল কালবী আমাকে অবগত করলেন, অন্যান্যরাও এ হাদীসে যোগ করেন এই বলেঃ তিনি (সাঃ) বললেন, '**লেখ (বহুবচন)**..." লেখকের নাম উল্লেখ না করে।

ইবনে কাসীর বর্ণনা করেছেন, "ইবনে ইসহাক বলেছেন, আল জুহারী বলেছেন...অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আলী ইবনে আবি তালিবকে ডাকলেন এবং বললেন, '**লেখ (একবচন)**..."

ইবনে আব্বাস হতে আবু উবায়েদ *আল আমওয়াল* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন,

"...এবং তিনি আলীকে বললেন, '**হে আলী, লেখ**...'"

আল হাকীম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, যা আয যাহাবী সত্যায়িত করেছেন এবং গ্রহণ করেছেনঃ

'...ও আলী, লিখ....'

হুদাইবিয়ার চুক্তিটি খুবই প্রসিদ্ধ এবং এ কারণে চুক্তিটির ধারাগুলো বর্ণনার এখানে প্রয়োজন নেই।

- রাসূল (সাঃ) হিরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি লিখেন, যে সম্পর্কে ইবনে মাজাহ্ ব্যতীত অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। আল বুখারী হাদীসটির বর্ণনা করেন ইবনে আব্বাস থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন আবু সুফিয়ান থেকে,

"বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম। আল্লাহ্'র বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে, রোমানদের নেতা হিরাক্লিয়াসের প্রতি – শান্তি বর্ষিত হোক তাদের উপর যারা হিদায়াতকে অনুসরণ করে। অতঃপর আমি তোমাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আল্লাহ্ তোমাকে দ্বিগুণ পুরষ্কার দেবেন। যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে রোমানদের পাপের জন্য তুমিই দায়ী থাকবে। হে আহলে কিতাবীগণ, তোমরা এগিয়ে এসো আমাদের এবং তোমাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গত, বাণীর দিকে, যে আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও উপাসনা না করি, আমরা তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করি এবং আল্লাহ্'র পাশাপাশি আর কাউকে প্রভূ হিসেবে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়... তবে বল আমরা মুসলিম।" *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭)*

- এ চিঠির প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে লিখা হিরাক্লিয়াসের চিঠি আবু উবায়েদ তার *আল-আমওয়াল* বইতে বকর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আল মুজনী থেকে বর্ণনা করেছেন, '...এবং **সে** রাসূল (সাঃ) কে লিখল যে, **সে** মুসলিম এবং তাঁকে (সাঃ) কিছু দিনার পাঠাল। **রাসূলুল্লাহ্** (সাঃ) চিঠিটি পড়ে বললেন, **'সে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্'র শত্রু, সে মুসলিম নয় বরং সে খ্রীস্টধর্মের উপরে আছে।'**

আল হাফীজ *আল-ফাতহ্*'তে উল্লেখ করেন যে, হাদীসটি সহীহ্ কিন্তু বর্ণনার দিক থেকে বকর থেকে বিচ্ছিন্ন (*মুরসাল*)।

- উমর (রা.)কে লিখা মিনবাজ-এর জনগণের চিঠি এবং উমর (রা.) এর প্রত্যুত্তর, যা কিনা আবু ইউসুফ তাঁর *আল-খারাজ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "আমর বিন শুয়া'ইব হতে আব্দুল মালিক ইবন জুরাইজ বর্ণনা করেছেন যে – সমুদ্রের অপরপ্রান্ত হতে আমাদের সাথে যুদ্ধরত কিছু জাতি উমর ইবন আল-খাত্তাবকে এই বলে পত্র পাঠালেন যে: "আমাদেরকে আপনার রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দিন এবং বিনিময়ে আমাদের উপর দশভাগের একভাগ কর আরোপ করুন।" তিনি বলেন, 'উমর এ ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে আলোচনা করলেন এবং তারা তাকে এ বিষয়ে রাজী হবার উপদেশ দিলেন। এভাবেই, প্রথমবারের মতো যুদ্ধরত জাতির লোকেরা একদশমাংশ কর আদায় করলো।"

২. সেনাবাহিনী এবং এ সম্পর্কিত কিছু ঘটনা:

- খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) কে লিখা আবু বকরের (রা.) চিঠি, যেখানে তিনি খালিদ (রা.)কে আল শামের দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। *কিতাব উল খারাজ* গ্রন্থে আবু ইউসুফ বলেছেন, **"খালিদ আল হীরাকে তাঁর কেন্দ্র হিসেবে নিতে চেয়েছিল। তবে আবু বকরের চিঠি তাঁকে আবু উবায়দা এবং মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য আল শামের দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ প্রদান করে..."**

- আল-শাম এর সৈন্যগণ উমরের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান এবং তিনি তাদের লিখেন। ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন যা সহীহ্ বর্ণনা হিসেবে পরিগণিত যে, আবু হাতিম ইবনে হাব্বান সম্মাক'কে বলতে শুনেছেন, 'আমি শুনেছি ইয়াদ আল আশারী বলেছেন, "আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি যেখানে আমাদের পাঁচজন আমীর ছিল: আবু উবাইদা ইবনে আল জারাহ্, ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান, ইবনে হাসানাগ, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং ইয়াদ (ইনি বর্ণনাকারী ইয়াদ আল আশারী থেকে ভিন্ন ব্যক্তি)। তিনি বর্ণনা করেন যে, উমর বলেন, "যদি সাংঘর্ষিক কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে আবু উবাইদার সাহায্য কামনা করবে।" অতঃপর আমরা তাকে জানালাম যে, "মৃত্যু আমাদেও পেছনে ধাওয়া করছে এবং আমরা তার সাহায্য কামনা করছি। প্রত্যুত্তরে তিনি আমাদের জানালেন, "আমি তোমাদের পত্র পেয়েছি যেখানে তোমরা আমার সাহায্য কামনা করেছো। আমি তোমাদের এমন একজনের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যার সাহায্য বহুগুন বেশী শক্তিশালী এবং যার সৈন্যদল সবসময় তৈরী। তিনি হলেন আল্লাহ্ (*'আজ্জা ওয়া জ্জাল*); সুতরাং, তোমরা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা কর। কারণ, মুহাম্মদ (সাঃ) কে বদরের প্রান্তে তোমাদের চাইতে কম সংখ্যক সৈন্য থাকার পরও বিজয় দান করা হয়েছে। যখনি আমার পত্র তোমাদের কাছে পৌঁছাবে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে এবং আমার সাথে আলোচনার অপেক্ষা করবে না। তারপর, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করলাম এবং তাদেরকে পরাজিত করলাম। আমরা তাদের চার ফারসাখ পরিমাণ হত্যা করলাম।"

- আল-শাম এর সেনাবাহিনী উমর ইবন আল-খাত্তাবকে লিখে পাঠান যে, "যখন আমরা শত্রুপক্ষের মুকাবিলা করলাম, তাদের অস্ত্রসমূহ রেশমী কাপড়ে আবৃত অবস্থায় দেখে আমাদের হৃদয়ে ভয় সঞ্চারিত হল।" উমর প্রত্যুত্তরে তাদের জানালেন, "তবে তোমরা একই কাজ কর, অর্থাৎ অস্ত্রসমূহ রেশমী কাপড় দ্বারা আবৃত কর।" এটি ইবনে তাইমিয়া তাঁর *আল-ফতওয়া* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৩. সেনাবাহিনী ছাড়া রাষ্ট্রের অন্য কিছু প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কিছু উদাহরণ:

- এক দশমাংশের ব্যাপারে মু'য়াজকে লিখা রাসূল (সাঃ) এর চিঠি: ইয়াহিয়া ইবনে আদম শাসনকার্য বিষয়ে লেখা তার *আল-খারাজ* বইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইয়েমেনে নিযুক্ত মু'য়াজকে লিখেছিলেন:

  "বৃষ্টির পানি বা এ ধরনের পানির আধার দ্বারা চাষকৃত জমির উপর (উৎপন্ন ফসলের) খাজনা এক দশমাংশ ধার্য করা হল; আর, বালতি দিয়ে সেচকার্য চালানো হলে খাজনা হবে এক দশমাংশের অর্ধেক।" আশ-শী' ও একই ধরনের বর্ণনা করেছেন।

- আল মুনদির ইবনে সাওয়াকে জিজিয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রেরিত চিঠি। আবু ইউসুফ তার *আল-খারাজ* গ্রন্থে আবু উবাইদা থেকে বর্ণনা করেন যে,

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল মুনজীর ইবনে সাওয়াকে লিখেন যে, **"যে আমাদের মতো নামাজ আদায় করবে, কিবলা'র দিকে মুখ ফিরাবে, জবাইকৃত মাংস খাবে, সে মুসলিম বলে গণ্য হবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা লাভ করবে। মাগুসদের মধ্যে যারাই ইসলাম গ্রহণ করবে তারাই নিরাপত্তা লাভ করবে। আর, যারা তা প্রত্যাখান করবে তাদের জিযিয়া কর পরিশোধ করতে হবে।"**

- বাহরাইনে পাঠানোর সময় সাদাকার দায়িত্ব সম্পর্কে আনাসকে লিখা আবু বকরের চিঠি। আনাসের সূত্রে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, "আবু বকর (রা.) সাদাকার দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল যা বলেছেন সে সম্পর্কে চিঠি লিখেছিলেন..."

- দূর্ভিক্ষের বছরে আমরকে লিখা উমরের পত্র এবং আমরের জবাব। ইবনে খুজাইমাহ্ তার *সহীহ* গ্রন্থে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং আল হাকীম এটাকে ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ বলেছেন। বায়হাকী তার *সুনান* গ্রন্থে, ইবনে সা'দ তার *তাবাকাত* গ্রন্থে জায়েদ ইবনে আসলাম হতে এবং ইবনে আসলাম তার পিতা হতে বলেছেন, "দূর্ভিক্ষের বছরে আরবের ভূমিগুলো খরায় আক্রান্ত হয়েছিল। এ সময় উমর ইবন আল-খাত্তাব আমর ইবনুল 'আসকে লিখলেন, 'আমিরুল মু'মিনীন, আব্দুল্লাহ্'র পক্ষ থেকে, আমর ইবনুল 'আস এর প্রতি। আল্লাহ্'র কসম! তুমি এবং তোমার অঞ্চলের জনগণ যখন স্বাস্থ্যবান হচ্ছো তখন আমি এবং আমার অঞ্চলের জনগণ শুকিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সাহায্য কর!' প্রত্যুত্তরে 'আমর জানালেন, 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক! আমি সর্বদাই আপনার সেবায় নিয়োজিত; আমি আপনারই সেবায় নিয়োজিত। আপনার দিকে উটের বহর প্রেরণ করছি, যার প্রথমটি যখন থাকবে আপনার দরজায় এবং শেষেরটি থাকবে আমার দরজায়। যদিও আমি সমুদ্রপথে দ্রুত সাহায্য পাঠানোর উপায় খুঁজে বের করবো বলে আশা করছি।"

- আলীর (রা.) প্রতি মুরতাদদের সম্পর্কে মুহম্মদ ইবনে আবু বকরের চিঠি এবং তাঁর উত্তর। কাবুস ইবনে আল মুখারিক থেকে ইবন শিবা বর্ণনা করেছেন, যিনি (কাবুস) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, "মুহম্মদ ইবনে আবু বকরকে 'আলী মিশরের আমীর হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তিনি (মুহম্মদ ইবনে আবু বকর) আলীকে কিছু ধর্মত্যাগী বা মুরতাদ সম্পর্কে লিখেন। তাদের মধ্যে কিছু লোক সূর্য ও চন্দ্রকে উপাসনা করত এবং কিছু লোক অন্যকিছুকে উপাসনা করতো যদিও তারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করত। এ ঘটনা জানতে পেরে 'আলী যারা অন্য কিছুর উপাসনা করা সত্ত্বেও নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করে তাদের হত্যার নির্দেশ দেন এবং অন্যদের তাদের ইচ্ছেমত উপাসনার মনযোগ দিতে বলেন।"

৪. জনগণকে সরাসরি উদ্দেশ্য করে কিছু চিঠি, যাদের কিছু নীচে উল্লেখ করা হল:

- নাজরানের জনগণের প্রতি রাসূলুল্লাহ্'র পত্র। ইবন 'আব্বাস হতে আল-সুদ্দী এবং তার থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেন, যে ব্যাপারে আল-মুনজিরী মন্তব্য করেছেন যে, আল-সুদ্দী সরাসরি এ ব্যাপারে ইবন 'আব্বাসের কিছু আলোচনা শুনেছেন – যে আবু উবাইদা তার *আল-আমওয়াল* গ্রন্থে আবু আল-মালিহ্ আল-হাদহালি থেকে বর্ণনা করেছেন, যার শেষে বলা হয়েছে: "উসমান ইবন আফফান এবং মু'ওয়াক্বীব এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং লিখেছেন।" আবু ইউসুফ তার *আল-খারাজ* গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এর লেখক ছিলেন আল-মুগীরাহ্ ইবন আবি শুবাহ্। তারপর, আবু ইউসুফ আবু বকরের উক্ত চিঠিটি উল্লেখ করেছেন যার লেখক ছিলেন আল-মুগীরাহ্, উমরের চিঠি যার লেখক ছিলেন মুয়াক্বীব, তাদের প্রতি উসমানের চিঠি যার লেখক ছিলেন তাঁর সাহায্যকারী হামরান, আলীর চিঠি যার লেখক ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইবন রাফি'।

- তামীম আল দারীর প্রতি রাসূল (সাঃ) এর লেখা পত্র। *কিতাব উল খারাজে* আবু ইউসুফ বর্ণনা করেছেন যে,

  "লাখামের এক ব্যাক্তি তামিম আল দারী যিনি তামীম ইবনে আউস নামে পরিচিত ছিলেন বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), ফিলিস্তিনে রোমানদের মধ্য হতে আমার কিছু প্রতিবেশী আছে। তাদের একটি গ্রামের নাম হাবরা এবং অপরটির নাম আইনুন। যদি আল্লাহ্ আল শামস অঞ্চলে আপনাকে বিজয় দান করেন তাহলে দয়া করে ঐ দু'টি গ্রাম আমাকে দান করবেন। তিনি (সাঃ) বললেন, **"এ দুটি তোমাকে দেয়া হল।"** তামিম বললেন, "তাহলে এটা আমাকে কাগজে-কলমে নির্দিষ্ট করে দিন।"

তিনি (সাঃ) তার উদ্দেশ্যে লিখলেন, **"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম। আল্লাহ্‌'র রাসূল মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে তামিম ইবনে আল আউস আল দারীর প্রতি, তামীমকে হাবরা এবং বাইত আইনুন গ্রাম দুটির সব সমতল ভূমি, পাহাড়, জলধার, কৃষিযোগ্য জমি, নাবাতিন এবং গরু সবকিছু প্রদান করা হল এবং তার পরে তার সন্তানগণ এসবের মালিক হবে। কেউ এসবের মালিকানার ব্যাপারে তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না এবং কেউ অন্যায়ভাবে তার প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। কেউ যদি এর ব্যাত্যয় ঘটায়, তাহলে সে আল্লাহ্‌, ফেরেশতা এবং সমগ্র মানবকূলের অভিশাপ কুড়াবে।"** এ দলিলটি আলী (রা.) লিখেছিলেন।

যখন আবু বকর খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন তখন তিনি এ ব্যাপারে চিঠি লিখলেন যে, "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম। এটা আবু বকরের পক্ষ থেকে, যিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর প্রতিনিধি, যাকে এ জমিনে কর্তৃত্ব দান করা হয়েছে। তিনি দারী বংশের প্রতি এটা লিখছেন যে, হাবরা এবং আইনুন গ্রামের উপর তাদের যে অধিকার রয়েছে সেটাকে কেউ অবজ্ঞা করতে পারবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌'কে মানে এবং তাঁর আনুগত্য করে সে কোনভাবেই তাদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আমার কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান ব্যক্তি সেখানে অবশ্যই দু'টি দরজা স্থাপন করবে এবং দূর্বৃত্তদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবে।"

খলীফার কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি যতজন সম্ভব সচিব নিয়োগ করতে পারেন। বস্তুতঃ যদি তাদের সাহায্য ছাড়া কাজ করা খলীফার পক্ষে সম্ভবপর না হয় তাহলে এদের নিয়োগ দেয়া বাধ্যতামূলক। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর জীবনীর রচয়িতারা জানিয়েছেন যে, তাঁর প্রায় বিশজনের মত পত্র লেখক ছিল।

সহীহ্‌ আল বুখারীতে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যায়িদ বিন ছাবিত (রা.) কে ইহুদীদের ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে করে তিনি (যায়িদ) তাদের লেখা পত্র রাসূলুল্লাহ্‌'কে পাঠ করে শোনাতে পারেন। সে কারণে যায়িদ ইবনে ছাবিত মাত্র পনের দিনের মধ্যে হিব্রু ভাষা শিখে নিয়েছিলেন।

আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে জুবায়ের থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আল আকরাম ইবনে আবদ ইয়াগুছকে নির্দেশনা দিতেন এবং সে অনুযায়ী তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন শাসকদের পত্রের জবাব দিতেন...।"

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে আল বায়হাকী বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর কাছে একদা এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে চিঠি আসল, তখন তিনি (সাঃ) আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আল আকরামকে বললেন, 'আমার পক্ষ থেকে উত্তর দাও।' তিনি তাঁর পক্ষ হতে লিখলেন ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কে তা পড়ে শোনালেন। তিনি (সাঃ) বললেন, **'তুমি লিখেছো সঠিকভাবে ও দক্ষতার সাথে।"** (আল্লাহ্‌ তাঁকে সফলতা দান করুন)

আলী ইবনে মুহম্মদ আল মাদাইনী থেকে মুহম্মদ ইবনে সাদ তার নিজস্ব ইসনাদসহ বর্ণনা করেছেন যে, মুহম্মদ ইবনে মাসলামাহ্‌ হচ্ছে একজন, যিনি একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর নির্দেশক্রমে প্রতিনিধিদের প্রতি পত্র লিখছিলেন এবং রাসূল (সাঃ) যখন কোন চুক্তি সম্পাদন করতেন তখন সাধারণত আলী ইবনে আবি তালিব চুক্তিনামা লিখতেন এবং যখন তিনি (সাঃ) চুক্তি করতেন তিনি শান্তিচুক্তির শর্তসমূহ লিখতেন। মুয়াক্বীব ইবনে আবি ফাতিমা রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর সীলমোহরের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। মুহম্মদ ইবনে বাশার তার দাদা মুয়াক্বীব থেকে এবং আল বুখারী ইবনে বাশার থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

"রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর সীল মোহরের আংটিটি ছিল রঙিন লোহার তৈরী যার উপরে রূপার আবরণ দেয়া ছিল। আর, এটা আমার কাছে সংরক্ষিত ছিল; মুয়াক্বীব রাসূল (সাঃ) এর সীলমোহরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ছিল।"

গভর্ণরবৃন্দ (উলা'হ্)

ওয়ালী (গভর্ণর) হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যাকে খলীফা খিলাফত রাষ্ট্রের ভেতর কোন একটি *উলাই'য়াহ্* বা প্রদেশে শাসক এবং আমীর হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত ভূমিসমূহকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হবে এবং প্রতিটি প্রদেশ একটি *উলাই'য়াহ্* হিসেবে পরিগণিত হবে। প্রতিটি উলাই'য়াহ্কে আবার কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করা হবে এবং প্রতিটি জেলাকে *ইমালাহ্* বলা হবে। উলাই'য়াহ্র দায়িত্বে যাকে নিযুক্ত করা হবে তাকে *ওয়ালী* বা *আমীর* বলা হবে এবং ইমালাহ্'র দায়িত্বে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে *আমীল* বা *হাকীম* বলা হবে।

প্রতিটি *ইমালাহ্* আবার কয়েকটি প্রশাসনিক এককে বিভক্ত, যাদের প্রত্যেককে *কাসাবাহ্* (মেট্রোপলিস) বলা হয়। *কাসাবাহ* সমূহ আরও ছোট প্রশাসনিক এককে বিভক্ত যাদের প্রত্যেকটিকে *হাই'ই* (Hayy) বা কোয়ার্টার বলা হয়। *কাসাবাহ্* এবং হাই'ইর প্রধানদের ব্যবস্থাপক (manager) বলা হয় এবং তাদের কাজ প্রশাসনিক।

ওয়ালী হলেন একজন শাসক, কারণ, উলাই'য়াহ্'র অর্থই হচ্ছে শাসন করা। *আল মুহিত* অভিধানে, এটাকে নেতৃত্ব (ইমারাহ) ও কর্তৃত্ব অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যেহেতু তারা শাসক সেহেতু তাদের শাসক হবার সকল শর্ত পূরণ করতে হবে। সে কারণে ওয়ালীকে অবশ্যই পুরুষ, মুক্ত, মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, ন্যায়পরায়ন এবং তার কর্তব্য সম্পাদনে যোগ্য হতে হবে। তাকে খলীফা অথবা খলীফার পক্ষ থেকে কারও মাধ্যমে নিযুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ, ওয়ালীগণ কেবলমাত্র খলীফার মাধ্যমে নিযুক্ত হতে পারেন। উলাই'য়াহ্ অথবা ইমারাহ অর্থাৎ ওয়ালী বা আমীর নিয়োগের বিষয়ে দলিল পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর শাসনামল থেকে। বিভিন্ন বর্ণনানুসারে এটা নিশ্চিত যে, তিনি (সাঃ) বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়ালীদের নিয়োগ দিতেন এবং তাদের প্রদেশসমূহে শাসন করবার ক্ষমতা প্রদান করতেন। তিনি (সাঃ) মুয়াজ ইবন জাবালকে আল-জানাদে, যিয়াদ ইবনে লাবিদকে হাজরামাউতে এবং আবু মুসা আল আশয়ারীকে জাবিদ এবং এডেনে (ওয়ালী হিসাবে) নিযুক্ত করেছিলেন।

যারা শাসনকার্যে যোগ্য, জ্ঞানী ও পরহেজগার (আল্লাহ্ভীরু) বলে পরিচিত ছিলেন তাদেরই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওয়ালী হিসেবে মনোনীত করতেন। তিনি (সাঃ) তাদের মধ্য হতে ওয়ালী বাছাই করতেন যারা এই কাজে পারদর্শী ছিল এবং যারা মানুষের হৃদয়ে ঈমানের আলো ও রাষ্ট্রের প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করতে সক্ষম ছিল। সুলাইমান ইবনে বারুদা তার বাবার বরাত দিয়ে বলেন,

"যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন অভিযান কিংবা সেনাবাহিনীতে একজন আমীর নিয়োগ করতেন, তখন তিনি (সাঃ) তাকে আল্লাহ্'কে ভয় করতে এবং তার সহযোগী মুসলিমদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন।" মুসলিমের বর্ণনা অনুসারে; *(আল-বায়হাকী, সুনান আল কুবরা, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪১)*।

যেহেতু ওয়ালী একটি উলাই'য়াহ্র *আমীর*, সেহেতু তার ক্ষেত্রেও এ হাদীস প্রযোজ্য।

ওয়ালীকে বরখাস্ত বা অপসারণ করার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এর ভার খলীফার উপরই ন্যস্ত থাকবে কিংবা যদি উলাই'য়াহ্র অধিকাংশ জনগণ অথবা তাদের প্রতিনিধি ওয়ালীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন তখন ওয়ালীকে পদচ্যুত করা যাবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে দুটি কারণে উলাই'য়াহ্'র জনগণের পক্ষ থেকে একটি উলাই'য়াহ্ প্রতিনিধি পরিষদ গঠন করা হবে। প্রথমতঃ তারা প্রদেশের বাস্তবতার ব্যাপারে ওয়ালীকে অবহিত করবেন; কারণ, তারা ঐ প্রদেশ বা অঞ্চলে বসবাস করেন এবং সে প্রদেশের বাস্তবতা সম্পর্কে তারা ওয়ালীর চেয়ে ভাল ধারণা রাখেন। তখন ওয়ালী সে তথ্যসমূহ ব্যবহার করে আরও ভালভাবে তার কার্য সম্পাদন করতে পারবেন। আর, দ্বিতীয়তঃ ওয়ালীর কাজের ব্যাপারে কাউন্সিলের মতামত গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে। যদি অধিকাংশ কাউন্সিল সদস্য ওয়ালীর কাজের ব্যাপারে অভিযোগ করেন তাহলে খলীফা তাকে অপসারণ করবেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদ কায়েসের প্রতিনিধিদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাইরাইনের আমীর আল 'আলা ইবনে আল হাদরামীকে অপসারণ করেছিলেন। এছাড়া, কোন কারণ বা অভিযোগ ছাড়াও খলীফা ওয়ালীকে পদচ্যুত করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইয়েমেনের আমীর মুয়াজ বিন জাবালকে কোন কারণ ছাড়াই অপসারণ করেন।

উমর বিন আল-খাত্তাবও (রা.) ওয়ালীদের কারণে বা বিনা কারণে বরখাস্ত করতেন। তিনি যিয়াদ ইবনু আবু সুফিয়ানকে কোন কারণ ছাড়াই অপসারণ করেন এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে জনগণের অভিযোগের ভিত্তিতে বরখাস্ত করেন এবং বলেন, "আমি তাকে অদক্ষতা বা বিদ্রোহের কারণে অপসারণ করিনি।" এ ঘটনাগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, খলীফা কোন ওয়ালীকে তার উলাই'য়াহ্‌র জনগণের পক্ষ থেকে অভিযোগ আসুক বা না আসুক সর্বাবস্থায় অপসারণ করার ক্ষমতা রাখেন।

অতীতে দুই ধরনের উলাই'য়াহ্ ছিল: *উলাই'য়াহ্‌তুল সালাহ* এবং *উলাই'য়াহ্‌তুল খারাজ*। এ কারণে ইতিহাসের বইসমূহে উলাই'য়াহ্‌র আমীর সম্বন্ধে আমরা দু'ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে দেখি: প্রথমটি হল সালাহ্ কিংবা খারাজ এর উপর কর্তৃত্ব (ইমারাহ) এবং অন্যটি হল সালাহ্ এবং খারাজ উভয়ের উপর কর্তৃত্ব। অন্যভাবে বললে বলা যায়, শুধুমাত্র সালাহ্ কিংবা খারাজ এর উপর ওয়ালী নিযুক্ত করা যায়। আবার, সালাহ্ এবং খারাজ উভয়ের উপর আমীর নিযুক্ত করা যায়। উলাই'য়াহ্ অথাবা ইমারার ক্ষেত্রে সালাহ্ শব্দটির অর্থ শুধু নামাজের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়া নয়, বরং এর অর্থ হল তহবিল বাদে সমস্ত বিষয় পরিচালনা করা। কারণ, সালাহ্ শব্দটির অর্থ হল কর ধার্য করার এখতিয়ার ব্যাতিরেকে সব বিষয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা। সুতরাং, যদি একজন ওয়ালীকে সালাহ্ এবং খারাজ উভয়ের আমীর নিযুক্ত করা হয়, তাহলে সেটি **সাধারণ উলাই'য়াহ্** (*উলাই'য়াহ্ 'আম্মা*) হিসেবে বিবেচিত হবে। আর, যদি তাকে শুধুমাত্র সালাহ্ বা খারাজ এর আমীর নিযুক্ত করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে উলাই'য়াহ্‌টি **বিশেষ উলাই'য়াহ্** (*উলাই'য়াহ্ খাস্‌সা*) হিসেবে বিবেচিত হবে।

তবে, যেভাবেই হোক না কেন প্রকৃতঅর্থে এটা খলীফার সিদ্ধান্তের উপরই ছেড়ে দেয়া হবে। কারণ, তিনি ইচ্ছে করলে কোন উলাই'য়াহ্‌কে শুধুমাত্র খারাজ অথবা বিচারব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন, কিংবা খারাজ, বিচারব্যবস্থা ও সেনাবাহিনী ছাড়া অন্য কোনকিছুর মধ্যেও সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন। রাষ্ট্র বা উলাই'য়াহ্‌কে পরিচালনার জন্য তিনি যে সিদ্ধান্তকে উপযোগী মনে করবেন সেটাই করতে পারেন। কারণ, হুকুম শারী'আহ্ ওয়ালীর জন্য কোন দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়নি এবং শাসনকার্যের সকল দায়িত্ব তার উপর বাধ্যতামূলক করা হয়নি। শুধুমাত্র এটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, ওয়ালী অথবা আমীরের দায়িত্ব শাসন ও কর্তৃত্বের সাথে সর্ম্পকিত হবে এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের আমীর নিযুক্ত করতে হবে।

এ সমস্ত কিছুই আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ)এর জীবনী থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

বস্তুতঃ হুকুম শারী'আহ্ খলীফার জন্য ওয়ালী নিযুক্ত করা বাধ্যতামূলক করেছে; তার বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে এই ওয়ালী *উলাই'য়াহ্ আম্মা* অথবা *উলাই'য়াহ্ খাস্‌সা'* যে কোন উলাই'য়াহ্‌র জন্য নিযুক্ত হতে পারে। রাসূল (সাঃ) এর কর্মকান্ড থেকে এটাই প্রতিফলিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাধারণ ভাবে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে ওয়ালী নিয়োগ করেছেন, যেমন আমরু বিন হাজেমকে তিনি এভাবে ইয়েমেনে নিযুক্ত করেছিলেন। আবার, তিনি বিশেষ দায়িত্ব দিয়েও ওয়ালী নিয়োগ করেছেন, যেমন আলী বিন আবি তালিব (রা.) কে ইয়েমেনে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সীরাত ইবনে হিশামে উল্লেখিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফারওয়া বিন মুসায়িককে মুরাদ, জুবায়ের ও মিদহাজ গোত্রের ওয়ালী নিয়োগ করেছিলেন এবং তার সাথে তিনি খালিদ বিন সায়ীদ বিন আল 'আসকে সাদাকা সম্পর্কিত বিষয়াবলী পরিচালনার ওয়ালী পদে নিয়োগ করেছিলেন। এটাও উল্লেখিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) যিয়াদ বিন লাবিদ আল আনসারীকে হাজরামাউতে ওয়ালী হিসাবে ও সাদাকার দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। এছাড়া, তিনি আলী বিন আবি তালিব (রা) কে নাজরানে সাদাকা ও জিযিয়ার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। হাকীমের বর্ণনা অনুসারে, তিনি (সাঃ) আলী বিন আবি তালিব (রা.) কে ইয়েমেনে বিচারকের দায়িত্ব দিয়েও প্রেরণ করেছিলেন। আল-ইসতিয়া'ব গ্রন্থে উল্লেখিত আছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুয়াজ বিন জাবালকে আল জানাদের লোকদের কুর'আন, ইসলামী আইন শিক্ষা দেয়া ও বিচার ফায়সালার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি (সাঃ) তাঁকে ইয়েমেনের আমীলদের কাছ থেকে সাদাকা সংগ্রহের ক্ষমতাও দিয়েছিলেন।

যদিও খলীফার সাধারণ ও বিশেষ দু'ভাবেই ওয়ালী নিয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে, তবে এটা প্রমাণিত সত্য যে, আব্বাসীয় খিলাফতের দূর্বলতার সময় সাধারণ উলাই'য়াহ্ ওয়ালীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শাসন করার সুযোগ তৈরী করে দিয়েছিল। যে সময়ে খলীফা নিতান্তই একটি নামসর্বস্ব পদবীতে পরিণত হয়েছিল, যাকে কেবলমাত্র জনসভায় দোয়ার সময় স্মরণ করা হত এবং মুদ্রায় তার নাম প্রতীক হিসাবে খোদাই করা থাকত। এভাবেই, সাধারণ উলাই'য়াহ্ ব্যবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিল।

যেহেতু খলীফার সাধারণ ও বিশেষ কর্তৃত্ব দিয়ে ওয়ালী নিযুক্ত করবার ক্ষমতা রয়েছে এবং যেহেতু সাধারণ উলাই'য়াহ্ ব্যবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রকে ক্ষতির দিকে ধাবিত করতে পারে এবং রাষ্ট্রের জন্য বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে, তাই আমরা বিশেষ উলাই'য়াহ্ ব্যবস্থা বা *উলাই'য়াহ্ খাস্‌সা* গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেন ওয়ালীর তাকওয়া যদি কখনও নিম্নগামীও হয় তাহলেও যেন তিনি রাষ্ট্রকে বিভক্ত করতে না পারেন। গবেষণা থেকে আমরা দেখেছি, যে সকল ক্ষেত্র ওয়ালীকে শক্তিশালী করে সেগুলো হল সেনাবাহিনী, বিচারব্যবস্থা ও অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ। সেজন্য, এ ক্ষেত্রগুলোকে অবশ্যই ওয়ালীর কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত খলীফার অধীনে রাখতে হবে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রগুলো অবশ্যই খলীফার প্রত্যক্ষ নজরদারিতে রাখতে হবে।

ওয়ালীকে এক উলাই'য়াহ্ থেকে অন্য উলাই'য়াহ্তে স্থানান্তারিত করা যাবে না, বরং তাকে এক উলাই'য়াহ্'র দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে, তারপর অন্য উলাই'য়াহ্তে পুনঃনিয়োগ দিতে হবে। কারণ, এটা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কর্মকান্ড থেকে পরিষ্কার যে, তিনি (সাঃ) ওয়ালীদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতেন। এরকম কোন বর্ণনা নেই যে, যেখানে দেখা যায় তিনি (সাঃ) ওয়ালীদের এক উলাই'য়াহ্ থেকে অন্য উলাই'য়াহ্তে স্থানান্তর করেছিলেন। এছাড়া, উলাই'য়াহ্ হল এমন এক ধরনের চুক্তি যার ধারাসমূহ সুস্পষ্ট। সে কারণে একটি অঞ্চল বা প্রদেশে উলাই'য়াহ্ নিয়োগের চুক্তিতে যে সীমানা পর্যন্ত ওয়ালীর শাসন বিরাজমান থাকবে তা পরিস্কারভাবে উল্লেখ থাকতে হবে এবং খলীফা তাকে অপসারণ করবার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত অঞ্চলে তার শাসনক্ষমতা বলবৎ থাকবে। কোন একটি অঞ্চল থেকে তাকে অপসারণ করবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সে অঞ্চলের ওয়ালী বলেই গণ্য হবেন। তাকে যদি অন্য কোন জায়গায় স্থানান্তর করা হয় তার মাধ্যমে তিনি পূর্বের পদ থেকে অপসারিত হবেন না কিংবা নতুন জায়গার ওয়ালীও হবেন না। কারণ, প্রথম পদ থেকে তাকে অপসারণ করতে হলে সুস্পষ্টভাবে সেই উলাই'য়াহ্র দায়িত্বভার থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে এবং একইভাবে নতুন উলাই'য়াহ্তে তার নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে নিয়োগের চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে সেই বিশেষ অঞ্চল সম্পর্কে উল্লেখ থাকতে হবে। সে কারণে একজন ওয়ালীকে স্থানান্তর করা যায় না, বরং প্রথমে নিযুক্ত পদ থেকে নিষ্কৃতি দেবার পরই নতুন স্থানে তাকে পুনঃনিয়োগ দেয়া যায়।

খলীফাকে ওয়ালীদের কাজের নিয়মিত তদন্ত করতে হবে:

খলীফাকে ওয়ালীদের কাজ তদন্ত করতে হবে এবং তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। এ কাজটি খলীফা প্রত্যক্ষভাবে করতে পারেন অথবা তিনি তার পক্ষ থেকে কাউকে এ পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োগ করতে পারেন। *মু'ওয়ায়ীন*ও (প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী) খলীফাকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশের ওয়ালীদের কাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। তবে, এ ব্যাপারে তার অনুসন্ধান লব্ধ তথ্য ও গৃহীত সিদ্ধান্ত অবশ্যই খলীফাকে অবহিত করতে হবে – যা প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর দায়িত্বের অধ্যায়ে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এভাবে খলীফাকে বিভিন্ন প্রদেশ সমূহের পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে এবং নিয়মিতভাবে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এছাড়া, তাকে বিভিন্ন সময়ে ওয়ালীদের সবার সাথে অথবা কিছু সংখ্যকের সাথে বসে তাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগও শুনতে হবে।

এটা নিশ্চিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওয়ালীদের নিয়োগের সময় তাদের যাচাই করে নিতেন, যেমনটি তিনি করেছিলেন মুয়াজ ও আবু মুসার ক্ষেত্রে। তিনি (সাঃ) সাধারণত কিভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে সে ব্যাপারে তাদের নির্দেশনা প্রদান করতেন, যেমনটি তিনি করেছিলেন আমর বিন হাজম এর ক্ষেত্রে। এছাড়া, তিনি (সাঃ) কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন যেমনটি তিনি করেছিলেন আবান বিন সা'ঈদ এর ক্ষেত্রে। তাকে বাহরাইনে ওয়ালী হিসেবে নিয়োগ দেয়ার সময় তিনি (সাঃ) বলেছিলেন,

"আবদ কায়েসের দেখাশোনা করো এবং এর প্রধানদের সম্মান করো।"

এছাড়াও তিনি (সাঃ) ওয়ালীদের জবাবদিহি করতেন, তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও তাদের বিষয়ে তদন্ত করতেন এবং তাদের সর্ম্পকিত সকল সংবাদ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। আয়-ব্যয়ের বিষয়ে তিনি (সাঃ) তাদের জবাবদিহি করতেন। আবু হুমায়িদ আল সা'ঈদী থেকে আল বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে,

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইবন-উল-উতবিয়াকে বানু সালিম গোত্রে সাদাকা আদায়ের জন্য আমীল নিযুক্ত করেন। যখন তিনি নবী (সাঃ) এর কাছে ফেরত এলেন, তিনি বললেন, "এটি আপনার জন্য এবং এই (উপহার) আমার জন্য।" তখন রাসূলুল্লাহ্

(সাঃ) বলেন, "তুমি কেন তোমার পিতামাতার গৃহেই থেকে গেলে না যাতে সেখানেই তোমার কাছে উপহার আসে যদি তুমি সত্য বলে থাক।" *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৬৯৭৯)*

উমরও (রা.) খুব নিবিড়ভাবে ওয়ালীদের পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি মুহম্মদ ইবনে মাসলামাকে ওয়ালীদের বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন। হজ্জের সময় তিনি সব ওয়ালীদের কাজের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য তাদের একত্র করতেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ শ্রবণ করতেন। এছাড়া, তিনি উলাই'য়াহ্‌র বিভিন্ন বিষয় ও তাদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কেও খোঁজখবর নিতেন। এটা বর্ণিত আছে যে, একবার উমর (রা.) তার আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা কি মনে কর, তোমাদের মধ্য হতে সর্বোত্তম লোকটিকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করলে এবং তাকে ন্যায়পরায়ন হতে বললেই আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে হবে?' লোকেরা বলল, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি বললেন, 'না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাজের মূল্যায়ন করব এবং নিশ্চিত হব যে, আমার আদেশ সঠিকভাবে পালিত হয়েছে।' ওয়ালী এবং আমীলদের কঠোর ভাবে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করার জন্য উমর (রা.) প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অকাট্য দলিল-প্রমাণ ছাড়াই তাদের মধ্যে অনেককে অপসারণ করেছেন এবং কিছু ওয়ালীকে সামান্যতম সংশয়ের কারণে অপসারণ করেছেন, যা কিনা সন্দেহের পর্যায়েও পরে না। তাঁকে এ সম্পর্কে একদা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'জনগণের বিষয়াবলী দেখাশোনার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য একজন আমীরের পরিবর্তে আরেকজনকে স্থলাভিষিক্ত করা সহজ।'

তবে, কঠোরতা সত্ত্বেও তিনি তাদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন ও শাসক হিসেবে সুনাম অর্জনের জন্যও মনযোগ দিতেন। তিনি তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাদের যুক্তিসমূহ বিবেচনায় নিতেন। যদি কোন যুক্তি তার পছন্দ হতো তাহলে তার স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে এবং আমীলদের প্রশংসার জোয়ারে ভাসাতে তিনি অকুন্ঠ ছিলেন। একদা হোমসের আমী'ল উমায়ের ইবনু সা'দ সম্পর্কে উমরের কাছে খবর আসল যে, মিম্বারে দন্ডায়মান থাকা অবস্থায় তিনি বলেছেন, **'ইসলাম ততদিন অক্ষয় থাকবে যতদিন এর শাসন কর্তৃত্ব শক্তিশালী থাকবে। তবে, কর্তৃত্বের শক্তি তলোয়ারের আঘাতে হত্যা কিংবা চাবুকের ঘা দিয়ে আসে না, বরং তা সত্য দিয়ে শাসন ও ন্যায়পরায়ণতাকে সুউচ্চে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে আসে।'** এ কথা শোনার পর উমর (রা.) বললেন, 'মুসলিমদের দেখভাল করার জন্য উমায়ের ইবনে সা'দ এর মত আরও মানুষ যদি আমার থাকতো।'

জিহাদ

জিহাদ হল ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া এবং বিশ্বের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেবার জন্য ইসলাম নির্ধারিত মৌলিক পদ্ধতি। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়নের পর ইসলামের দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান কাজ।

আল্লাহ্'র বাণীকে সুউচ্চে তুলে ধরার জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তাকেই জিহাদ বলে। জিহাদ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সেনাবাহিনী এবং সেইসাথে প্রস্তুত করা প্রয়োজন এই বাহিনীর নেতৃত্ব, চীফ অফ স্টাফ, কর্মকর্তা ও সৈনিকদল। এছাড়া, এই সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও বিস্ফোরক সরবরাহ এবং যুদ্ধ সরঞ্জামও প্রয়োজন, যার জন্য দরকার শিল্প কারখানা। সুতরাং, শিল্পকারখানা হচ্ছে সেনাবাহিনী ও জিহাদের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। এই বাস্তবতার কারণে রাষ্ট্রের সব শিল্পকারখানা অবশ্যই যুদ্ধ শিল্পের (war industry) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

এছাড়াও আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা যোদ্ধাদের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে কাজ করে। কারণ, যদি আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিরাপদ ও স্থিতিশীল না হয়, তবে তা জিহাদে গমনকারী সৈন্যদের মন ও মগজ বিক্ষিপ্ত করতে পারে। বস্তুতঃ সেনাবাহিনী জিহাদে লিপ্ত থাকার সময় আভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা তাদের কর্মদক্ষতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যার পরিণতিতে সেনাবাহিনী ক্রমশঃ দূর্বল হয়ে যায় এবং এ পরিস্থিতি যুদ্ধ অব্যাহত রাখা দুঃসাধ্য করে তোলে।

বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্কও ইসলামী দাওয়াতী কার্য পরিচালনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এ কারণে এই চারটি বিভাগ যথা: সেনাবাহিনী, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, শিল্প এবং বৈদেশিক সম্পর্ক – খলীফা নিযুক্ত একজন আমীরের নেতৃত্বে একটি মাত্র বিভাগের আওতায় নিয়ে আসা যায়। কারণ, এ চারটি বিষয়ই জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত।

তবে, এ চারটি বিভাগকে পরস্পর পরস্পর থেকে আলাদা রাখাও অনুমোদিত। সেক্ষেত্রে, প্রত্যেক বিভাগের জন্য খলীফা একজন ব্যবস্থাপক এবং সেনাবাহিনীর একজন আমীর নিযুক্ত করবেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাধারণত বিভিন্ন অভিযানে প্রেরণের সময় নিজেই সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করতেন – যার সাথে শিল্পের কোন সম্পর্ক ছিল না অর্থাৎ শিল্প বিভাগের জন্য তিনি (সাঃ) অন্য কাউকে নিযুক্ত করতেন। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যেমন: পুলিশ, টহল পুলিশ, হাইওয়ে ডাকাতি বা সাধারণ চৌর্যবৃত্তি প্রতিরোধ করা ইত্যাদি। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সময়ে বৈদেশিক সম্পর্ক যে আলাদা একটি বিভাগের অধীণে ছিল তা বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের কাছে তাঁর প্রেরিত চিঠি থেকেই বোঝা যায়।

একজন ব্যবস্থাপক নিয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগকে পরস্পর পরস্পর থেকে পৃথক করার বিষয়টি নিম্নোক্ত দলিলগুলো দ্বারা প্রমাণিত:

প্রথমত: সেনাবাহিনী

- রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুতার যুদ্ধে যায়েদ বিন হারিস (রা.) কে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি শহীদ হয়ে গেলে পর্যায়ক্রমে যারা নেতৃত্বে থাকবে তাদের নামও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন,

'যায়েদ বিন হারিস সৈন্যদের আমীর; যদি তিনি শহীদ হয়ে যান তাহলে জাফর বিন আবি তালিব; এবং তিনি যদি শহীদ হন তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রুয়াহাহ্ এবং তিনিও যদি শহীদ হন তাহলে মুসলিমগই তাদের মধ্য হতে একজনকে আমীর নির্বাচিত করে নেবে।'

আবুদল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে আল বুখারী বর্ণনা করেছেন যে,

'মু'তার অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যায়েদ বিন হারিসকে আমীর নিযুক্ত করলেন...'

সালামাহ্ ইবনে আল আকওয়া থেকে আল বুখারী আরও বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি যায়েদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম এবং তাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল।'

আবুদল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে,

'নবী (সাঃ) একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাতে ওসামা বিন যায়েদকে আমীর মনোনীত করেন। কেউ কেউ তার নেতৃত্বের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, 'তোমরা যদি তার নেতৃত্বে সন্দেহ প্রকাশ কর তাহলে তার পিতার নেতৃত্বেও সন্দেহ প্রকাশ করলে। আল্লাহ্'র কসম! সে অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্য...।' *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৪২৫০; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-২৪৩৬)*

সাহাবীগণ (রা.) সাধারণত মু'তার সেনাবাহিনীকে 'আমীরদের সেনাবাহিনী' নামে অভিহিত করতেন। ইবনে বুরাইদা হতে মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, ইবন বুরাইদা বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কাউকে কোন বাহিনীর অথবা অভিযানের আমীর নিযুক্ত করতেন তখন উপদেশ দিতেন...।"

- আবু বকর (রা.) খালিদ (রা.) কে মুরতাদদের বিরুদ্ধে ও ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমীর নিযুক্ত করেন। খলীফা বর্ণনা করেছেন যে, 'তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে লোকদের উপর নেতৃত্ব দিলেন এবং ছাবিত ইবনে কায়েস ইবনে সাম্মাসকে নিযুক্ত করলেন বিশেষ করে আনসারদের উপর। যদিও খালিদ তাদের সবাইকেই নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।" ইয়ারমুকের যুদ্ধে খালিদের নেতৃত্বের অধীণে আবু বকর আল শামের সেনাবাহিনীকে একত্রিত করেছিলেন। ইবনে জারীর বলেছেন, 'তিনি ইরাকে অবস্থানরত খালিদকে আল শামের সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করার জন্য ডেকে পাঠান।' এছাড়া, উমর (রা.) আল-শামের সেনাবাহিনীকে আবু উবাইদা'র নেতৃত্বাধীনে একত্রিত করেছিলেন। ইবনে আসকীর বলেছেন, 'এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আশ-শামে আমীরদের আমীর নিযুক্ত করেন।'

দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

আল বুখারী আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে,

'আমীরদের সাথে কথা বলার সময় কায়েস ইবনে সা'দ পুলিশের মত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সামনে থাকত।' *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭১৫৫)* এখানে কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ্ আল আনসারী আল খারাজীকে বুঝানো হয়েছে।

আল তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে,

'আমীরদের সাথে কথা বলার সময় কায়েস ইবনে সা'দ পুলিশের মত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সামনে থাকত। আল আনসারী বলেন, এর অর্থ হল তাকে এ ব্যাপারে দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল।' ইবনে হাব্বান এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'মুশরিকদের সাথে বৈঠকের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিরাপত্তার ভার কায়েস ইবনে সা'দ এর উপর ন্যস্ত থাকত।'

আল বুখারী থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী (সাঃ) আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) কে একস্থানে প্রেরণ করেন, যে সম্পর্কে তিনি (আলী) বলেছেন, **"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে, আল জুবায়ের এবং আল মারছাদকে প্রেরণ করলেন – আমরা প্রত্যেককেই অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলাম। তিনি (সাঃ) বললেন, "রাওদাত হাজ্ব এ না পৌঁছানো পর্যন্ত তোমরা যাত্রা অব্যাহত রাখবে"। আবু আওয়ানা বলেন জায়গাটির নাম ছিল রাওদাত হাজ্ব। আরেকটি বর্ণনায় জায়গাটির নাম বলা হয় খাক্ব। 'সেখানে একজন মহিলা আছে যার কাছে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে লেখা হাতিব ইবনে আবি বালতাহ-এর একটি চিঠি রয়েছে। এটা আমার কাছে নিয়ে আসবে।' সুতরাং আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঘোড়া ছুটালাম যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নির্দেশিত স্থানে পৌঁছালাম। মহিলাটি উটের পিঠে চড়ে যাত্রা করছিল। হাতিব মক্কাবাসীকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অভিযান সম্পর্কে অবহিত করে পত্র লিখেছিল। আমরা বললাম, 'তোমার নিকট রক্ষিত চিঠিটা কোথায়?' প্রত্যুত্তরে সে বলল, 'আমার কাছে কোন চিঠি নেই।' আমরা তার ঘোড়াকে বসিয়ে জিনের ভেতর খুঁজলাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না। আমি বললাম, 'বন্ধুগণ, আমি তো তার কাছে কোন চিঠি পেলাম না। কিন্তু, আমরা জানি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মিথ্যে বলতে পারেন না।' অতঃপর আলী (রা.) প্রতিজ্ঞা করলেন এই বলে যে, 'যার নামে শপথ নেয়া হয় তার নামে বলছি! তোমাকে অবশ্যই চিঠিটা বের করে দিতে হবে। অন্যথায় আমি তোমার কাপড় খুলে ফেলব।' তারপর উক্ত মহিলা তার কোমড় বন্ধনীর নীচ**

থেকে চিঠিটি বের করে আনলো যা দিয়ে সে তার কাপড় বেঁধে রেখেছিল। অতঃপর তারা চিঠিটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে নিয়ে গেলেন... ।"

তৃতীয়ত: শিল্প

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র (catapult) ও অস্ত্র সজ্জিত বাহন (armored car) তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল বায়হাকী তার সুনান গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, আবু উবাইদা (রা.) বলেছেন, 'তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তায়েফের চারদিকে অবরোধ আরোপ করলেন এবং পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র তৈরী করে সতের দিন যাবত তা তাক করে রাখলেন।' আবু দাউদ *আল-মারাসিল* গ্রন্থে মাখুল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তায়েফের লোকদের বিরুদ্ধে পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র তৈরী করেন।' আল সানানী *সুবুল আল-সালাম* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, এই হাদীসের বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। এছাড়া, *সীরাত হালাবিয়্যা* গ্রন্থের লেখক বলেছেন, 'সালমান ফারসী (রা.) তাঁকে (সাঃ) এ ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি (রা.) বলেন, 'পারস্যে আমরা দূর্গের উপরে পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র মোতায়েন করি এবং তা দিয়ে শত্রুদের আঘাত করি।' সালমান (রা.) নিজের হাতে এ যন্ত্র তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়।' সাদ ইবনে আল মু'য়াজ থেকে আল কাইম এবং ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে,

"তায়েফের দূর্গের কাছাকাছি অবরোধ আরোপের দিন থেকে, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীদের মধ্য হতে কিছু ব্যক্তি ট্যাঙ্কের মতো এক বাহনে চড়ে দূর্গের দেয়ালের কাছাকাছি আক্রমণ করার চেষ্টা করছিল যেন খুব সহজেই দূর্গের প্রতিরক্ষা দেয়াল ধ্বসিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু, অগ্রসর হওয়া মাত্রই ছাকিফ গোত্রের লোকেরা তাঁদের দিকে জ্বলন্ত ধাতুর টুকরা ছুঁড়ে মারতে থাকে যাতে ট্যাঙ্কগুলো থেকে তারা মুক্তি পায়। এরপর মুসলিমরা আত্মরক্ষার্থে পালাতে থাকে এবং এ সুযোগে তারা মুসলিমদের দিকে বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করে বেশকিছু মুসলিম যোদ্ধাকে হত্যা করে ফেলে।"

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সালমান (রা.) পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র তৈরির পরামর্শ দেন এবং তিনি নিজ হাতে এটি প্রস্তুত করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে, এ সমস্ত ঘটনা অবশ্যই রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ অনুযায়ীই ঘটেছিল। সীরাত গ্রন্থে আল-হালাবিয়্যার বক্তব্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, 'তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছিলেন।' অর্থাৎ, রাসূল (সাঃ) কে এ ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল।

এসব বর্ণনা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হল, সমরশিল্প গড়ে তোলার দায়িত্ব হল খলীফার এবং এ কাজ পরিচালনার জন্য তিনি যাকে উপযুক্ত মনে করেন তার কাছ থেকে এ বিষয়ে সহায়তা নিতে পারেন। এজন্য শিল্পকারখানার একজন আমীরের চাইতে বরং ব্যবস্থাপকের দরকার। সালমান (রা.) সমরশিল্পের আমীর ছিলেন না বরং পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র তৈরীর ব্যবস্থাপক ছিলেন; এবং এক্ষেত্রে, তাঁকে হয়ত নিজের হাতে কাজ করতে হয়েছিল।

এছাড়া, সমরশিল্প প্রতিষ্ঠা করা বাধ্যতামূলক, কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

'আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন ভীতির সঞ্চার হয় আল্লাহ্'র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; [কিন্তু] আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন।' **[সূরা আনফাল : ৬০]**

বস্তুতঃ প্রস্তুতি ছাড়া এই ভয় সৃষ্টি করা সম্ভব নয় এবং প্রস্তুতির জন্য দরকার কলকারখানা। আসলে, উপরোক্ত আয়াতে পরোক্ষভাবে সমরশিল্পের প্রয়োজনের অপরিহার্যতাকেই নির্দেশ করা হয়েছে (*দালালাত আল-ইলতিযাম*)। আর, পরোক্ষ এ নির্দেশের মাধ্যমে মূলতঃ সমরশিল্প প্রতিষ্ঠা করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কারণ, শারী'আহ্ মূলনীতি অনুযায়ী 'ফরয সম্পাদনের জন্য যা প্রয়োজন সেটিও ফরয'। জিহাদকে যে সব দলিলের মাধ্যমে ফরয করা হয়েছে, তার পাশাপাশি এই *দালালাত আল-ইলতিযাম* (প্রয়োজনের অপরিহার্যতা) হল সমরশিল্প বা কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করার বাধ্যবাধকতার আরও একটি দলিল।

তবে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত কলকারখানাগুলো শুধুমাত্র সমরশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কলকারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। রাষ্ট্রকে অন্যান্য শিল্পকারখানাও প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা আমাদের প্রণীত "খিলাফত রাষ্ট্রের কোষাগার সমূহ" (The Funds of Khilafah State) গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে :

শিল্প কারখানাসূহঃ জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ দেখাশোনা করার যে বাধ্যবাধকতা রাষ্ট্রের রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রকে অবশ্যই দু'ধরনের কলকারখানা স্থাপন করতে হবে:

প্রথম ধরন: যে সব কারখানা গণমালিকানাধীন সম্পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমন: খনিজ সম্পদ আহরণ, বিশোধন, বিগলন এবং তেল সম্পদ উত্তোলন ও পরিশোধন ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত শিল্পকারখানা। এসব কারখানা যেসব দ্রব্যাদি উৎপাদন করে সেগুলো গণমালিকানাধীন, তাই এ কারখানাগুলোও হবে গণমালিকানাধীন। ইসলামে যেহেতু গণমালিকানাধীন সম্পত্তি সকল মুসলিমের সম্পদ, সেহেতু এ সমস্ত কারখানার মালিকও সকল মুসলিম এবং রাষ্ট্র মুসলিমদের পক্ষ হতে এগুলো প্রতিষ্ঠা করবে।

দ্বিতীয় ধরন: শিল্পকারখানা, যেগুলো ভারী শিল্প ও সমরাস্ত্র শিল্পের সাথে জড়িত। এ ধরনের কারখানা ব্যক্তিখাতেও থাকতে পারে যেহেতু এগুলো ব্যক্তিগত সম্পদের অন্তর্গত। তবে এ ধরনের কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর বিনিয়োগের দরকার যা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে অসম্ভব। এছাড়া, আজকের দিনে অস্ত্র উৎপাদনকারী ভারী শিল্পকারখানাগুলো এখন আর ব্যক্তিমালিকানার অধীন নয়, যেমনটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনদের সময়। বরং, এগুলোর মালিক এখন হল রাষ্ট্র; মূলতঃ দায়িত্ব পালনের দায়বদ্ধতা থেকেই রাষ্ট্র এক্ষেত্রে অর্থায়ন করে থাকে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যখন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরঞ্জামসমূহ অনেক ব্যয়বহুলও হয়ে গেছে... সুতরাং অস্ত্র উৎপাদনের জন্য ও ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক। তবে, এর অর্থ এই নয় যে, এর মাধ্যমে এক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, এইসব শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের অর্থাৎ খলীফার। খলীফা এ সকল কাজ সম্পাদনের জন্য একজন মহাব্যবস্থাপক নিয়োগ করবেন, যিনি খলীফা, তার ডেপুটি কিংবা খলীফা যাকে পছন্দ করেন তার সাথে সরাসরি যুক্ত থাকবেন।

চতুর্থত: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

এটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খলীফার নির্বাহী সহকারী খিলাফত রাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনগণ (রা.) তাদের সচিবদের (নির্বাহী সহকারী) মাধ্যমে সরাসরি এসব সম্পর্ক রক্ষা করতেন। এছাড়া, হুদাইবিয়া সন্ধির সময় রাসূল (সাঃ) নিজেই মুশরিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন এবং শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছেন। তাছাড়া উমর (রা.) থেকে জানা যায় কিসরা থেকে যখন একটি প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে এসেছিল, সে সময় তারা তাঁকে মদীনাতুল মনোয়ারার একটি ফটকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছিল।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, খলীফা তার নির্বাহী সহকারীর মাধ্যমে সরাসরি বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়গুলো দেখতে পারেন অথবা একজন ব্যবস্থাপক নিয়োগ করে তা পরিচালিত করতে পারেন।

সুতরাং, এ চারটি বিভাগকে একটি বিভাগের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করে আমীরুল জিহাদের বিভাগ নামে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ করা যেতে পারে, কারণ এরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ।

আবার, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মত এগুলোকে স্বতন্ত্রও রাখা যেতে পারে।

এ চারটি বিভাগের কাজের পরিধি ব্যাপক। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ বিভাগগুলোর মধ্যে অনেক বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ, আভ্যন্তরীণ সমস্যা, বিভিন্ন রাষ্ট্র, তাদের এজেন্ট ও স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ কর্তৃক গৃহীত গোপন পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রের জাল উন্মোচন এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের জটিলতার নিরসন ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে শিল্পকারখানার বিভিন্ন বিভাগ ও উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদি। তবে, আমীরুল জিহাদের আবশ্যিক ক্ষমতা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, যেখানে তিনি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে যান। কারণ, এক্ষেত্রে যদি তার তাকওয়ার অবনতি ঘটে তবে তা রাষ্ট্রের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এজন্য এ চারটি বিভাগকে আমরা একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেগুলো কিনা রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র অবস্থায় সরাসরি খলীফার সাথে যুক্ত থাকবে। এ বিভাগগুলো হল:

১. আমীরুল জিহাদ (যুদ্ধবিভাগ)

২. আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ

৩. শিল্প বিভাগ

৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

আমীরুল জিহাদ-যুদ্ধ বিভাগ (সেনাবাহিনী)

যুদ্ধ বিভাগ হল রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর প্রধানকে জিহাদের ব্যবস্থাপক না বলে আমীরুল জিহাদ বলা হয়। এর কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেনাবাহিনীর প্রধানদের আমীর নাম দিয়েছেন। ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

'যায়েদ বিন হারিছাহ হল মুসলিমদের আমীর; যদি তিনি শহীদ হয়ে যান তাহলে আমীর জাফর বিন আবি তালিব; এবং তিনি যদি শহীদ হন তাহলে আমীর আবদুল্লাহ ইবনে রুয়াহাহ্ এবং তিনিও যদি শহীদ হন তাহলে মুসলিমরা তাদের মধ্য হতে একজনকে আমীর নির্বাচিত করে নেবে।'

ইমাম বুখারী আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) মুতার যুদ্ধে যায়িদ ইবন হারিছাহ্'কে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন..." আল বুখারী সালামাহ্ ইবন আল-আকওয়া বর্ণিত একটি হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন যে,"আমি যায়িদের সাথে একটি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম এবং তাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল।"

আবুদল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে: 'নবী (সাঃ) (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাতে উসামা বিন যয়িদকে আমীর মনোনীত করেন। কেউ কেউ তার নেতৃত্বের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

'তোমরা যদি তার নেতৃত্বে সন্দেহ প্রকাশ কর তাহলে তার পিতার নেতৃত্বেও সন্দেহ প্রকাশ করলে। আল্লাহ্'র কসম! সে অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্য...।' *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৪২৫০; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-২৪৩৬)*

সাহাবীগণ (রা.) সাধারণত মু'তার সেনাবাহিনীকে 'আমীরদের সেনাবাহিনী' বলে অভিহিত করতেন। ইবনে বুরাইদা হতে মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কাউকে কোন বাহিনী অথবা অভিযানের আমীর নিযুক্ত করতেন তখন তাকে উপদেশ দিতেন...।'

যুদ্ধবিভাগ সশস্ত্রবাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত সব বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবে: যেমন, সেনাবাহিনী, সরঞ্জাম, অস্ত্র, বিস্ফোরক এবং এ জাতীয় জিনিসপত্র। এছাড়াও মিলিটারী একাডেমী, সেনা মিশন, সেনাসদস্যদের ইসলামী এবং সাধারণ জ্ঞানার্জনের জন্য যা যা প্রয়োজন এবং যুদ্ধ ও এর পরিকল্পনা সম্পর্কিত সকল বিষয়ের দায়িত্বও যুদ্ধবিভাগের উপর থাকবে। এছাড়া, মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত শত্রু রাষ্ট্রগুলোতে গোয়েন্দা প্রেরণ করাও যুদ্ধবিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং এজন্য একটি বিশেষ বিভাগ থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সীরাত থেকে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

এসব কিছুই যুদ্ধবিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকবে ও পরিচালিত হবে। কারণ, এ বিভাগের নামই নির্দেশ করে যে যুদ্ধ বিগ্রহের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত কিছু এ বিভাগের অধীনে থাকবে। যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী প্রয়োজন। আর, সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব, চীফ অব স্টাফ, কর্মকর্তা ও সৈন্যের মাধ্যমে সংগঠিত ও প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

এছাড়া, সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত করার জন্য শারীরিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীগুলোর মধ্যে যুদ্ধের কলাকৌশল, বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা, উন্নত ও আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং, প্রযুক্তিগত ও সামরিক শিক্ষা, যুদ্ধকৌশল আয়ত্বের জন্য প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা ইত্যাদি সেনাবাহিনীর জন্য অপরিহার্য।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিম উম্মাহ্'কে সমগ্র বিশ্বের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে দেবার দায়িত্ব প্রদান করে সম্মানিত করেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি দাওয়াত ও জিহাদকে ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং

তিনি মুসলিমদের উপর জিহাদকে ফরয করেছেন। তাই, জিহাদের প্রস্তুতি হিসাবে প্রতিটি মুসলিম পুরুষ, যারা পনের বছর বয়সে উপনীত হয়েছে তাদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। আর, স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদানের ব্যাপারটি হল মুসলিমদের একটি সম্মিলিত দায়িত্ব *(ফরযে কিফায়া)*।

সামরিক বাহিনীতে যোগদানের ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনের সুস্পষ্ট দলিল আছে:

'আর তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিতনা নিশ্চিহ্ন হয়; এবং দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহ্'র জন্যই নির্দিষ্ট হয়।' **[সূরা আনফাল : ৩৯]**

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর হাদীসও আছে,

'মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের সম্পদ, হাত ও জিহ্বা দ্বারা জিহাদ কর।' আনাস (রা.) হতে আবু দাউদ এ হাদীস বর্ণনা করেন। *(সূনানে দাউদ, হাদীস নং-২৫০৪)*

শত্রুকে পরাজিত করা এবং নতুন নতুন ভূখন্ড জয় করার লক্ষ্যে শারী'আহ্ নির্ধারিত পথে জিহাদ পরিচালনার জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ অপরিহার্য; এবং এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদের মতোই ফরয। কেননা শারী'আহ্ মূলনীতি হল, 'ফরয সম্পাদনের জন্য যা করা প্রয়োজন সেটাও ফরয'। বস্তুতঃ জিহাদে যোগদানের জন্য চেষ্টা করা জিহাদের আদেশের অর্ন্তভুক্ত। কারণ, যখন আল্লাহ্ বলেন, *'আর তাদের সাথে যুদ্ধ কর'*- এটা একই সাথে যুদ্ধ করা এবং যে সমস্ত বিষয় যুদ্ধ করাকে সম্ভব করে তোলে তা করার নির্দেশ। এছাড়াও আল্লাহ্ বলেন,

'আর প্রস্তূত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে' **[সূরা আনফাল : ৬০]**

প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও উচ্চমান সম্পন্ন সামরিক দক্ষতা অর্জন যুদ্ধ প্রস্তুতির অন্তর্ভূক্ত; কেননা যুদ্ধ করাকে সম্ভব করে তোলার জন্য এ বিষয়গুলোর উপস্থিতি আবশ্যকীয়। সুতরাং, সামরিক প্রশিক্ষণ সামরিক শক্তিরই অংশ যা অবশ্যই অর্জন করতে হবে, যেমন: সামরিক যন্ত্রপাতি এবং সামরিক মিশন ইত্যাদির বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ইত্যাদি।

আর, স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ কিংবা সেনাবাহিনী গঠনার্থে জনবল নিয়োগ করার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, সঠিক ও কার্যকরভাবে জিহাদ সম্পাদন এবং জিহাদের সাথে সম্পর্কিত সকল দায়িত্ব পালনের জন্য *মুজাহিদিন*-এর উপস্থিতি অপরিহার্য এবং এটা আমাদের জন্য ফরয। কারণ, শত্রু আক্রমণ করুক বা না করুক ইসলামের বাণীকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অব্যাহত ভাবে জিহাদ পরিচালনা করা মুসলিমদের উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব। এজন্যই স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করা মুসলিমদের জন্য *ফরযে কিফায়াহ্* (সামষ্টিক দায়িত্ব) এবং এ দায়িত্ব জিহাদের শারী'আহ্ আদেশেরই অন্তর্ভূক্ত।

জিহাদে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পনের বছর পূর্ণ হবার বাধ্যবাধকতা প্রসঙ্গে নাফিঈ'র বরাত থেকে আল বুখারী বর্ণিত হাদীসটি দলিল হিসাবে উপস্থাপন করা যায়:

"ইবনে উমর (রা) আমাকে (নাফিঈ'কে) বলেছেন যে, ওহুদের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর দিকে তাকালেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ এবং সে কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেননি। আবার খন্দকের যুদ্ধের দিন তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিলেন। তখন আমার বয়স ছিল পনের।" *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-২৬৬৪)*

এছাড়া, নাফিঈ আরও বলেছেন যে, "যখন উমর বিন আবদুল আজিজ খলীফা ছিলেন তখন তাঁর সাথে আমি সাক্ষাৎ করতে যাই। আমি তাঁকে এ হাদীস সম্পর্কে বলার পর তিনি বললেন, 'এটাই হল কৈশোর ও বয়ঃপ্রাপ্ত হবার মধ্যকার সীমা। সুতরাং, তিনি তাঁর গভর্ণরদেরকে যাদের পনের বছর হয়েছে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করার নির্দেশ দেন।" অর্থাৎ তাদের জন্য সামরিক কোষাগার থেকে অর্থ বরাদ্দের নির্দেশ দেন।

এ সকল দলিল-প্রমাণ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কোন মুসলিম (পুরুষ) পনের বছর বয়সে পৌঁছানোর সাথে সাথে তাকে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

সেনাবাহিনীর বিভাগসমূহ

সেনাবাহিনীকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা হবে। প্রথম ভাগে থাকবে "রিজার্ভ সেনাবাহিনী" – যার মধ্যে জিহাদ করতে সক্ষম প্রতিটি মুসলিম পুরুষ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর, দ্বিতীয় ভাগে থাকবে "নিয়মিত সেনাবাহিনী" – যাদের স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হবে এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য যে কোন কর্মচারীর মতোই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হবে।

বস্তুতঃ রিজার্ভ বাহিনীর ধারণা এসেছে প্রতিটি মুসলিমের উপর জিহাদ ফরয হবার শারী'আহ্ অর্পিত বাধ্যবাধকতা থেকে। কারণ, হুকুম শারী'আহ্ প্রতিটি সক্ষম মুসলিমের উপর জিহাদ ফরয করেছে। তাই, এ নির্দেশ একইসাথে জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেয়াকেও বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়া, নিয়মিত বাহিনী প্রস্তুত রাখার ব্যাপারটি "ফরয পালনের জন্য যা প্রয়োজন তা নিজেই ফরয" এ শারী'আহ্ মূলনীতির ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে। যেহেতু, একটি স্থায়ী ও নিয়মিত সেনাবাহিনী ব্যতীত জিহাদের দায়িত্ব অবিরামভাবে পালন করা এবং ইসলাম ও মুসলিমদের কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়, সেহেতু খলীফাকে অবশ্যই একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখতে হবে।

আর, সেনাসদস্যদের বেতন-ভাতার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, তাদেরকে অবশ্যই রাষ্ট্রের অন্যান্য কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের মতোই দেখতে হবে। একজন অমুসলিমের উপর জিহাদ করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু, কোন অমুসলিম যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চায় তাহলে তাকে অনুমতি দেয়া হবে এবং এর জন্য তাকে বেতনভাতা প্রদান করাও শারী'আহ্ সম্মত হবে। কারণ, আল-জুহরী থেকে আল-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে,

'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কিছু ইহুদীদের কাছ থেকে (যুদ্ধকালীন) সেবা গ্রহণ করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাদের জন্য পারিশ্রমিকও বরাদ্দ করেছিলেন।'

এছাড়া, ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, 'সাফওয়ান বিন উমাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে হুনায়নে একটি অভিযানে যান, যদিও তখন সে মুশরিক ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নওমুসলিমদের (*মু'য়াল্লাফাতি কুলুবিহীম*) জন্য রক্ষিত গণীমতের মাল থেকে কিছু অর্থ তার জন্য বরাদ্দ করেন।'

সুতরাং, মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে অমুসলিমরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং সেনাবাহিনীতে তাদের উপস্থিতির জন্য তাদের অর্থও প্রদান করা যাবে। তাছাড়া, *ইজারা'*র (hiring an employee) সংজ্ঞা অনুযায়ী নিয়োগকারী ব্যক্তি নিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে কোন উপযোগ গ্রহণ করলে ক্ষতিপূরণবাবদ সেই ব্যক্তি পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। তাই, এই নীতির ভিত্তিতে যে কেউ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যে কাউকে কোন কাজে নিযুক্ত করতে পারে। সেনাবাহিনীতে অমুসলিম নিয়োগ করা এই ধরনের *ইজারা'*র চুক্তির মধ্যে পড়ে, কারণ এটাও এক ধরনের উপযোগ। সুতরাং, উপযোগ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কাউকে নিযুক্ত করার ব্যাপারে যে শারী'আহ্ দলিল-প্রমাণগুলো পাওয়া যায় তার ভিত্তিতেই অমুসলিমদের সামরিকসেবা ও যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা বৈধ।

এটা গেল অমুসলিমদের কথা। আর, মুসলিমদের জন্য জিহাদ একটি ইবাদত হলেও *ইজারা'*র দলিল-প্রমাণের আওতায় সামরিক সেবা ও যুদ্ধের জন্য মুসলিমদেরও অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত করা যাবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে পারিশ্রমিক দেয়া তখনই বৈধ হবে যখন এর উপযোগ ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

'পারিশ্রমিকের জন্য সবচাইতে উপযুক্ত কাজ হল আল্লাহ্'র কিতাব শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা।' এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস হতে বুখারী বর্ণনা করেছেন। *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৫৭৩৭)*

আল্লাহ্'র কিতাব শিক্ষা দেয়া একটি ইবাদত। যেহেতু, আল্লাহ্'র কিতাব শিক্ষা দেয়া, আযান দেয়া এবং নামাযে ইমামতি করা, এ সবকিছুর জন্যই যে কোন মুসলিমকে অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত করা অনুমোদিত সেহেতু সামরিক সেবা বা জিহাদের মত ইবাদতের জন্যও কাউকে অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত করা শারী'আহ্ সম্মত হবে। কেননা এসব কাজের উপযোগিতা (benefit) সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে যায়। তাছাড়া, মুসলিমদের জন্য জিহাদ ফরয হওয়া সত্ত্বেও অর্থের বিনিময়ে কোন মুসলিমকে জিহাদে নিযুক্ত করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে, যা কিনা রাসূল (সাঃ) এর হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। আবদুল্লাহ বিন আমরু থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

'আল গাজীর জন্য বেতন-ভাতা রয়েছে এবং আল জা'ইলের জন্যও বেতন-ভাতা রয়েছে ...।' *(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-২৫২৬)*

আল গাজী এমন একজন ব্যক্তি যে নিজের জন্য জিহাদ করেছে। আর, আল জাইল এমন একজন ব্যক্তি যার পক্ষে আরেকজন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জিহাদ করেছে। আল মুহিত অভিধানে এ ব্যাপারে উল্লেখ আছে যে, আল জা'আলা শব্দের অর্থ হলো কাউকে তার কাজের বিনিময়ে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হয় এবং একজন মুজাহিদ (গাজী) যদি তোমার তরফ থেকে নিয়োগ পেয়ে জিহাদ করে এবং তার কাজের বিনিময়ে যে পরিমান পারিশ্রমিক দেয়া হয় তা হল জু'ল"। সুতরাং এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একজনের পক্ষে অন্য আরেকজন জিহাদ করতে পারবে এবং জিহাদের জন্য কাউকে অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত করা যাবে।

জুবায়ের বিন নুফায়ের থেকে আল বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

'আমার উম্মতের মধ্যে যারা জিহাদ করে এবং পারিশ্রমিক গ্রহণ করে এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তিশালী করে তারা যেন মুসার মাতার মত – যে মুসাকে দুধ পান করিয়েছে এবং তার আজর (পুরষ্কার) গ্রহণ করেছে।'

এখানে আজর বলতে পারিশ্রমিক বুঝানো হয়েছে। সুতরাং, সৈন্যদের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মতই বেতন-ভাতা দেয়া যাবে।

মুসলিম সেনাগণ বেতন-ভাতা গ্রহণ করলেও, আল্লাহ্'র কাছ থেকে তারা পুরষ্কার (সওয়াব) থেকে বঞ্চিত হবে না। আর এটা জায়েয হয়েছে আল বুখারীর হাদীস থেকে যেখানে আল্লাহ্'র কিতাব শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক নিতে বলা হয়েছে – যা মূলতঃ একটি ইবাদত। অর্থাৎ এ ধরনের শিক্ষক তার নিয়্যত অনুযায়ী আল্লাহ্'র কাছ থেকেও তার জন্য নির্দিষ্ট সওয়াব লাভ করবে।

ইসলামিক সেনাবাহিনী মূলতঃ একটি সেনাবাহিনী যা বিভিন্ন কন্টিনজেন্টের (contingents) সমন্বয়ে গঠিত। এইসব কন্টিনজেন্টকে বিভিন্ন সংখ্যা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায় যেমনঃ প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি বা বিভিন্ন প্রদেশের নামেও এদের নামকরণ করা যাবে, যেমনঃ আল শামের সেনাবাহিনী, মিশরের সেনাবাহিনী, সা'নার সেনাবাহিনী প্রভৃতি।

ইসলামিক সেনাবাহিনী বিশেষ ক্যাম্পে অবস্থান করে। একটি ক্যাম্পে সেনাগণ একটি ইউনিট হিসেবে অথবা একটি ইউনিটের অংশ বা অনেকগুলো ইউনিট হিসেবে থাকতে পারে। এই ক্যাম্পগুলোকে প্রত্যেকটি প্রদেশে স্থাপন করা উচিত এবং কিছু কিছু ক্যাম্পকে সেনাঘাঁটিতে রূপান্তর করা উচিত। কিছু কিছু ক্যাম্প ভ্রাম্যমান হবে এবং এগুলো হবে বিশাল। এ ক্যাম্পসমুহের নাম দেয়া যেতে পারে, যেমনঃ হাব্বানিয়ার ক্যাম্প। এবং প্রত্যেক ক্যাম্পের একটি করে ব্যানার থাকতে পারে।

উল্লেখিত কিছু কিছু বিষয় খলীফার জন্য মুবাহ (অনুমোদিত, permitted matters), যেমনঃ উলাই'য়াহ্র নাম অনুসারে সেনাবাহিনীর নামকরণ করা, কোন বিশেষ সংখ্যা দেয়া ইত্যাদি সবই খলীফার মতামত ও ইজতিহাদের উপর নির্ভর করে। আর অন্যান্য বিষয়সমূহের সাথে বাধ্যবাধকতার একটি ব্যাপার আছে, যেমনঃ রাষ্ট্রকে রক্ষা করবার প্রয়োজনীয়তা, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা, সীমান্তে সেনাবাহিনী প্রেরণ, সব উলাই'য়াহ্ ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ক্যাম্প স্থাপন ইত্যাদি।

উমর আল খাত্তাব (রা.) সব উলাই'য়াহ্ জুড়ে তার সেনাবাহিনীর ক্যাম্প ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একটি ইউনিট ফিলিস্তিনে এবং একটি ইউনিট আল মুসুলে স্থাপন করেছিলেন ইত্যাদি। তিনি অপর একটি ইউনিটকে রাষ্ট্রের কেন্দ্রে রাখতেন এবং আরেকটিকে এক মুহূর্তের নোটিশে মার্চ করবার জন্য প্রস্তুত রাখতেন।

খলীফা সেনাবাহিনীর প্রধান

খলীফা হলেন সেনাবাহিনীর প্রধান এবং তিনিই চীফ অব স্টাফ, প্রত্যেক ব্রিগেডের আমীর, প্রত্যেক ডিভিশনের কমান্ডার নিয়োগ দিয়ে থাকেন। আর ব্রিগেডের কমান্ডারগণ সেনাবাহিনীর অন্যান্য নেতৃত্ব নিয়োগ দিয়ে থাকেন। সেনাবাহিনীতে কোন স্টাফ নিয়োগ হয়ে থাকে সেনাবাহিনীর সংস্কৃতি ও চীফ অব স্টাফের অনুমোদনক্রমে।

খলীফা সেনাবাহিনীর প্রধান। কারণ, খলীফা হলেন শারী'আহ্ আইনকানুন বাস্তবায়ন ও বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ইসলাম পৌঁছে দেবার জন্য সব মুসলিমের সার্বজনীন নেতৃত্ব। আর, বিশ্বের দরবারে ইসলাম পৌঁছে দেয়ার শারী'আহ্ নির্ধারিত পদ্ধতি হল জিহাদ। সুতরাং, খলীফাকেই জিহাদ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, কারণ খিলাফতের চুক্তি তার সাথেই সম্পাদিত হয়েছে। সেকারণে তিনি ছাড়া আর কেউই এ দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। খলীফা নিজের কাঁধে এ দায়িত্ব তুলে নেবেন। প্রত্যেক মুসলিমের উপর জিহাদের ফরয দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে খলীফা দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। সুতরাং জিহাদে অংশ নেয়া একটি বিষয় এবং জিহাদের দায়িত্ব কাধে তুলে নেয়া আরেকটি বিষয়। জিহাদে অংশ নেয়া প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য কিন্তু জিহাদের পুরো দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার একমাত্র দায়িত্বশীল হলেন খলীফা।

খলীফা তার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্ববধানের আওতায় রেখে তার পক্ষে অন্য কাউকে এ কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করতে পারেন। তবে সে ব্যক্তি খলীফার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ব্যতীত স্বাধীনভাবে এ কাজ করতে পারবে না। এ প্রতিনিধিত্ব খলীফার সহকারীদের মত নয়। খলীফাকে এ ব্যাপারে নিয়মিত রিপোর্ট করার অর্থ হল খলীফার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি খলীফার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থেকে এ কাজ সম্পাদন করবেন। প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের শর্তে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব খলীফা পছন্দমত যে কাউকে দিতে পারেন। খলীফাকে নামমাত্র প্রধান রেখে তার তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ ব্যতীত কাউকে সেনাবাহিনী বা জিহাদের দায়িত্ব অর্পণ করা অনুমোদিত নয়। কেননা খিলাফতের চুক্তি তার সাথেই সম্পাদিত হয়েছে এবং তিনিই এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল। অনৈসলামিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান নামে মাত্র সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন এবং আরেকজন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করেন – যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একটি বিষয় যা শারী'আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত নয়। বরং, হুকুম শারী'আহ্ খলীফাকে সেনাবাহিনীর প্রকৃত নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। এছাড়া, সেনাবাহিনীর প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত বিষয় সমূহে নেতৃত্ব দেবার ক্ষেত্রে খলীফা তার পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করবার জন্য যে কাউকে নিযুক্ত করতে পারেন। তবে এ বিষয়সমূহও খলীফার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজেই সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন, যুদ্ধের ময়দানে নেতৃত্ব দিতেন এবং যে সব যুদ্ধে তিনি (সাঃ) অংশগ্রহণ করতেন না সেসব যুদ্ধের নেতৃত্ব নির্ধারণ করে দিতেন – যেগুলোকে মূলতঃ অভিযান বলা হয়। প্রত্যেক অভিযানেই তিনি কমান্ডার ঠিক করে দিতেন। এমনকি কিছু কিছু অভিযানে সাবধানতাবশতঃ কোন কমান্ডার নিহত হলে কে তার স্থলাভিষিক্ত হবে সেটাও আগে থেকে ঠিক করে দিতেন, যেমনটি দিয়েছিলেন মু'তার অভিযানের সময়। আবদুল্লাহ বিন উমরের (রা.) রেওয়াতে আল বুখারী বর্ণনা করেছেন যে,

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জায়েদ বিন হারিসকে মু'তার যুদ্ধে সৈন্যদের আমীর নিযুক্ত করলেন; অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, 'যদি তিনি শহীদ হয়ে যান তাহলে আমীর হবে জাফর বিন আবি তালিব; আর তিনিও যদি শহীদ হন তাহলে আমীর হবে আবদুল্লাহ ইবনে রুয়াহাহ"।

সুতরাং, খলীফাই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি সেনাবাহিনীর আমীর, কমান্ডার, বিভিন্ন বিভাগের আমীরদের নিযোগ দেবেন ও পতাকা বেঁধে দেবেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক মু'তায় প্রেরিত বাহিনী বা উসামার বাহিনী, যে বাহিনীকে সিরিয়া প্রেরণ করা হয়েছিল – তা মূলতঃ একটি ব্রিগেড। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উসামাকে পতাকা বেঁধে দিয়েছিলেন। এছাড়া, আরব উপদ্বীপে যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছে এবং পরে তারা মদীনায় ফেরত এসেছে, যেমন: সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের (রা.) মক্কা অভিমুখে গমণকৃত বাহিনী – এটা ছিল একটি ডিভিশন। এ থেকে নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন ব্রিগেডের আমীর ও ডিভিশনের কমান্ডারদেরও খলীফা নিয়োগ দিয়ে থাকেন। তবে ব্রিগেডের আমীর ও ডিভিশনের কমান্ডার ব্যতীত অন্যান্য আমীরদের রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিয়োগ দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। এর অর্থ হল, অভিযানের প্রধানের উপর এ দায়িত্ব তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া, কারিগরী বা প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয়ের প্রধান চীফ অব স্টাফকেও খলীফা নিয়োগ দেবেন। তবে, তিনি খলীফার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ছাড়া স্বাধীনভাবে তার কাজ পরিচালনা করতে পারেন – যদিও তাকে সবসময়ই খলীফার নির্দেশাধীন থাকতে হবে।

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে এবং এ বিভাগের দায়িত্বে থাকবেন একজন মহাব্যবস্থাপক। প্রত্যেক প্রদেশে এই বিভাগের একটি করে শাখা থাকবে যাকে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শাখা বলা হবে, এর প্রধানকে বলা হবে *সাহিব আল সুরতাহ্* (sahib al-shurta) এবং সেখানে তিনি প্রাদেশিক গভর্ণরের তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন। তবে, প্রশাসনিক বিষয়ে তিনি কেন্দ্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের অধীনস্ত থাকবেন যা পরিচালিত হবে একটি বিশেষ আইন দ্বারা।

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। এ বিভাগ পুলিশবাহিনীর (*সুরতাহ্*) মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইনশৃংখলা পরিস্থিতি বজায় রাখে। বস্তুতঃ এটাই হল নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান উপকরণ। নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে পুলিশবাহিনীকে যে কোন সময়, যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের জন্য অনুমোদিত এবং এ বিভাগের নির্দেশ পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ পুলিশবাহিনীকে তা কার্যকর করতে হবে। আবার, যদি পুলিশবাহিনীর সেনাবাহিনীর সহায়তার প্রয়োজন হয় তাহলে খলীফা বরাবর এ ব্যাপারে আবেদন করতে হবে। তিনি সেনাবাহিনীকে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগকে সহায়তা করার নির্দেশ দিতে পারেন কিংবা, অন্য কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তবে, খলীফা এ আবেদন প্রত্যাখানও করতে পারেন এবং পুলিশবাহিনীকেই এ কাজ সম্পাদনের নির্দেশ দিতে পারেন।

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ নাগরিকদের দ্বারাই পুলিশবাহিনী গঠিত হবে। তবে, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে নারীদের প্রয়োজনে মহিলাদেরও পুলিশ বিভাগে নিয়োগ দেয়া অনুমোদিত। হুকুম শারী'আহ্'র আলোকে এ ব্যাপারে একটি বিশেষ আইন প্রস্তুত করা হবে।

পুলিশবাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত থাকবে: এর এক ভাগে থাকবে সেনাপুলিশ এবং আরেক ভাগে থাকবে সরাসরি শাসকের নির্দেশাধীন পুলিশ; যাদের জন্য অবশ্যই বিশেষ পোষাক ও চিহ্ন নির্ধারিত থাকবে এবং এরা নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

সুরতাহ্'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল আজহারী বলেছেন, '*সুরতাহ্* শব্দের অর্থ হলো কোন কিছুর মধ্যে যা উত্তম। এই অর্থ *সুরাত*কেও (নিরাপত্তাবাহিনীকে) বুঝায় কেননা তারা শ্রেষ্ঠ সৈন্য। এটা বলা হয় যে, *সুরতাহ* হল প্রথম গ্রুপ যারা সেনাবাহিনীর অগ্রে অবস্থান নেয় । তাদেরকে *সুরাত* বলা হয় একারণে যে, পদবি ও পোষাকের দিক থেকে তাদের রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল আসমা'য়ী সুরতার এই সংজ্ঞা পছন্দ করেছেন। *আল কামুস* অভিধান গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, '*সুরতাহ্*'র প্রত্যেককে আলাদাভাবে *সুরাত* বলা হয় – যার অর্থ হল প্রথম ব্যাটালিয়ন হিসেবে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকবে। এই *সুরতাহ্* ওয়ালীদের সাহায্যকারীও বটে। আর, তাদেরকে এ নামে ডাকার কারণ হল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন দ্বারা তারা নিজেদের আলাদা করে নিয়েছে।'

আর, সেনা পুলিশ (military police) হল সেনাবাহিনীর একটি অংশ, তাদের রয়েছে বিশেষ চিহ্ন এবং তারা শৃংখলা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর অগ্রে থাকবে। তারা আমীরুল জিহাদ অর্থাৎ যুদ্ধ বিভাগের আনুগত্য করবে। কিন্তু, পুলিশবাহিনী যা শাসকদের নির্দেশে চলবে তা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের আনুগত্য করবে।

আল বুখারী আনাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, **'আমীরদের সাথে কথা বলার সময় কায়েস ইবনে সা'দ পুলিশের মত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সামনে থাকত।'** এখানে কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদা আল আনসারী আল খারাজকে বুঝানো হয়েছে। আল তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, **'আমীরদের সাথে কথা বলার সময় কায়েস ইবনে সা'দ পুলিশের মত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সামনে থাকত।'** আল আনসারী বলেছেন, এর অর্থ হল তাকে এ ব্যাপারে দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল।

খলীফা ইচ্ছে করলে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত *সুরতাহ্* বা পুলিশবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন অর্থাৎ যুদ্ধবিভাগের অধীন করতে পারেন। আবার, তিনি একটি স্বাধীন বিভাগও গঠন করতে পারেন; যেমন: আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ।

তবে, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমরা একটি পৃথক স্বাধীন বিভাগ গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি অর্থাৎ শাসকদের নির্দেশাধীন *সুরতাহ্* বা পুলিশবাহিনীকে অবশ্যই আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের অধীনস্থ থাকতে হবে – যা হবে স্বাধীন একটি বিভাগ এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত তাদের জবাবদিহিতা থাকবে সরাসরি খলীফার কাছে। আর এ ব্যাপারে দলিল হল কায়েস ইবনে সা'দ এর হাদীসটি। জিহাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত চারটি বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ে পূর্বে উল্লেখিত হুমকির কারণে এগুলো একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান হওয়ার পরিবর্তে প্রতিটি বিভাগই পৃথক পৃথক ভাবে খলীফার নির্দেশাধীন থাকবে। সুতরাং, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা *সুরতাহ্* আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের অধিনস্ত থাকবে।

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের কার্যপরিধি

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের কাজ হল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যে সব কর্মকান্ডের কারণে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে তাদের তালিকা বৃহৎ, যেমনঃ

ইসলাম ত্যাগ করা, ধ্বংসাত্মক ও অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা – যেমনঃ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আঘাত বা সেগুলো দখল করে নেয়া কিংবা ব্যক্তিগত, গণমালিকানাধীন বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট করা ইত্যাদি। এছাড়া, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমেও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

এছাড়াও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য যেসব কর্মকান্ড হুমকি হতে পারে সেগুলো হলঃ চুরি, লুটপাট, ডাকাতি ও আত্মসাৎ এর মাধ্যমে অন্যায় ভাবে জনগণের সম্পদ হরণ করা এবং সেইসাথে, হয়রানি, শারীরিক অত্যাচার-নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে আক্রমণ করা এবং মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদ আরোপ, কলঙ্ক লেপন ও ধর্ষণের মাধ্যমে মানুষের সম্মানহানি করা ইত্যাদি।

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের অন্যান্য কাজের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সন্দেহভাজনদের নজরে রাখা এবং তাদের সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রাষ্ট্র ও জনগণকে রক্ষা করা।

প্রধানতঃ এ সমস্ত কার্যাবলীই রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার জন্য সবচাইতে বেশী হুমকি স্বরূপ। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ মূলতঃ রাষ্ট্র ও জনগণকে এসব অন্যায় ও অপরাধপ্রবণ কর্মকান্ড থেকে রক্ষা করে। সুতরাং, কেউ (ইসলাম) ধর্ম ত্যাগ করার পর যদি অনুতপ্ত না হয়, তাহলে তার মৃত্যুদন্ডের রায় হবে এবং এই বিভাগ এই রায় কার্যকর করবে। যদি ধর্মত্যাগীরা একটি দল হয় তাহলে তাদেরকে প্রথমে ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানাতে হবে। যদি তারা অনুতপ্ত হয়ে ইসলামে ফিরে আসে এবং শারী'আহ্ আইনকানুন মেনে নেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের উচিত হবে না। আর, যদি তারা ধর্মত্যাগের উপর অটল থাকে তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যদি তারা সংখ্যায় কম হয়, তাহলে আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশবাহিনীই তাদের দমন করার জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু, যদি তারা সংখ্যায় বেশী হয় এবং পুলিশবাহিনী তাদেরকে দমন করার জন্য যথেষ্ট না হয়, তবে সেক্ষেত্রে তাদের অতিরিক্ত সেনাপুলিশ দিয়ে সাহায্য করার জন্য খলীফাকে অনুরোধ জানাতে হবে। যদি সেনাপুলিশও এ কাজের জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে তাদের অবশ্যই সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করার ব্যাপারে খলীফার বরাবর আবেদন করতে হবে।

এটা গেল ধর্মত্যাগীদের কথা। এছাড়া, সাধারণ জনগণের মধ্য হতে কেউ যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এ বিদ্রোহমূলক কর্মকান্ডে তারা যদি অস্ত্র ব্যবহার না করে শুধুমাত্র ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড, হরতাল, বিক্ষোভ কর্মসূচী, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ দখল করে নেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে; কিংবা, ব্যাপক ভাংচুরের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, গণমালিকানাধীন ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট করে, তাহলে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ এ সমস্ত ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য শুধুমাত্র পুলিশবাহিনীকে নিয়োজিত করবে। কিন্তু, যদি এ বিভাগ এসব আগ্রাসী কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ধ্বংসাত্মক ও ষড়যন্ত্রমূলক এসকল কর্মকান্ড বন্ধ করার লক্ষ্যে সেনাপুলিশের সাহায্য কামনা করে খলীফা বরাবর অনুরোধ জানাতে হবে।

তবে, যদি বিদ্রোহীরা অস্ত্র ব্যবহার করে ও একটি অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ কেবলমাত্র পুলিশের দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়, তাহলে অবস্থার উপর নির্ভর করে বিদ্রোহ দমনের জন্য তারা খলীফাকে সেনাবাহিনী পাঠাতে অনুরোধ জানাবে। তবে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার পূর্বে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের পক্ষ থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ করা উচিত এবং তাদের অভিযোগ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা ও তা খতিয়ে দেখা

উচিত। এছাড়া, আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা বিভাগের পক্ষ থেকে তাদের অস্ত্রসমর্পণের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্'র জামায়া'ত ও রাষ্ট্রের আনুগত্যে ফিরে আসার আহবান জানাতে হবে। যদি তারা এ প্রস্তাবে ইতিবাচক ভাবে সাড়া দিয়ে আত্মসর্মপণ করে এবং রাষ্ট্রের আনুগত্যে ফিরে আসে, তবে রাষ্ট্রকে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা থেকে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু, যদি তারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এবং বিদ্রোহের ব্যাপারে অটল থাকে, তবে শান্তিপ্রদান ও শৃংখলা ফিরিয়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, তাদের সমূলে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করার লক্ষ্যে নয়। রাষ্ট্র তাদের সাথে এ লক্ষ্যে যুদ্ধ করবে যেন তারা রাষ্ট্রের আনুগত্যে ফিরে আসে, বিদ্রোহের পথ পরিবর্তন করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করে।

এর চমৎকার উদাহরণ হল যেভাবে ইমাম আলী বিন আবি তালিব (রা.) খাওয়ারিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি তাদের প্রথমে আত্মসমর্পন করতে বলেন। তারা যদি বিদ্রোহের পথ থেকে সরে আসত তাহলে তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন না। কিন্তু, তারা বিদ্রোহের সিদ্ধান্তে অটল থাকায় তিনি শৃংখলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তাদের সাথে যুদ্ধ করেন, যেন তারা আনুগত্যের পথে ফিরে আসে, বিদ্রোহের পথ পরিবর্তন করে এবং সেইসাথে অস্ত্র সমর্পণ করে।

এছাড়া, যারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করে, যেমনঃ যারা মহাসড়কে ডাকাতি করে সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করে, জোরপূর্বক মহাসড়কে চলাচলকালে বাধা সৃষ্টি করে, ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয় ও হত্যা করে, তাদের দমনের জন্য আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ পুলিশবাহিনী প্রেরণ করবে এবং নিম্নোক্ত আয়াত অনুসারে তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবে – যা হতে পারে হত্যা *এবং* ক্রুশবিদ্ধ করা, হত্যা করা, বিপরীত অঙ্গচ্ছেদ করা অথবা তাদের অন্যত্র নির্বাসনে পাঠানো ইত্যাদি।

'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।' **[সূরা মায়েদা : ৩৩]**

এসব দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আর দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এক কথা নয়। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হল তাদের শৃংখলার ভেতর নিয়ে আসা। কিন্তু এইসব দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মানে হল তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো; সুতরাং, এইসব মহাসড়ক ডাকাতরা যদি নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে কিংবা পালিয়েও যায়, তারপরও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ, উপরোক্ত আয়াত অনুসারে তাদের সাথে আচরণ করা হবেঃ যে হত্যা করবে এবং সম্পদ ছিনিয়ে নেবে, তাকে হত্যা করা হবে *এবং* শূলে চড়ানো হবে; যে শুধুমাত্র হত্যা করবে কিন্তু সম্পদ ছিনিয়ে নেবে না, তাকে হত্যা করা হবে কিন্তু শূলে চড়ানো হবে না; যে হত্যা করবে না কিন্তু সম্পদ ছিনিয়ে নেবে তাকে হত্যা না করে তার হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে; আর যে ব্যক্তি অস্ত্র হাতে ভয়ভীতি বা আতঙ্ক সৃষ্টি করবে, কিন্তু হত্যাও করবে না বা সম্পদও ছিনিয়ে নেবে না তাকে নির্বাসনে পাঠানো হবে।

বস্তুতঃ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের জন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুলিশবাহিনীকে ব্যবহার করাই অনুমোদিত। পুলিশ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে বা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হলে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের জন্য অন্য কোন বাহিনীকে ব্যবহার করা অনুমোদিত নয়। তবে, এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে এ বিভাগ প্রয়োজনানুসারে সেনাপুলিশ বা সেনাবাহিনীর সাহায্য কামনা করে খলীফার কাছে আবেদন করতে পারে। এছাড়া, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ চুরি, ছিনতাই, লুটপাট, ডাকাতি, আত্মসাৎ ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ হরণ কিংবা, জুলুম-নির্যাতন ও হতাহত করা কিংবা, মিথ্যা অপবাদ, চরিত্র হনন বা ধর্ষণের মাধ্যমে সম্মান হানি করা ইত্যাদি অপরাধসমূহ নিয়মিত টহল, রক্ষী বা পাহারাদার মোতায়েন করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং সেইসাথে মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতের ওপর আক্রমণকারী দূর্বৃত্তদের উপর আদালতের রায় বাস্তবায়ন করেও এইসব অপরাধ দমন করতে পারে। বস্তুতঃ কেবলমাত্র পুলিশবাহিনীর মাধ্যমেই এ কাজগুলো সম্পাদন করা যায়।

আইন-শৃংখলা রক্ষা করা, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ও আদালয়ের রায় বাস্তবায়ন ইত্যাদি *সুরতাহ্*'র দায়িত্ব। আর এটা এ কারণে যে, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, কায়েস ইবনে সা'দ রাসূলুল্লাহ্ **(সাঃ)** এর সামনে *সাহিব আস সুরতাহ্* (পুলিশবাহিনীর প্রধান) হিসেবে দন্ডায়মান থাকতেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, *সুরতাহ্* শাসকদের সম্মুখে দন্ডায়মান থাকে। এর অর্থ হল, শারী'আহ্ আইনকানুন বাস্তবায়ন, আইন-শৃংখলা এবং নিরাপত্তা রক্ষার কাজে শাসকদের যে কোন ধরনের নির্দেশ পালন করতে তারা বাধ্য। এর মধ্যে টহলকার্যও অন্তর্ভূক্ত যেমনঃ রাতের বেলা টহলের মাধ্যমে চোর-ডাকাত, অপরাধী ও দুর্বৃত্ত দমন করা ইত্যাদি। আবু বকর (রা.) এর সময় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ

(রা.) রাতের টহলের আমীর ছিলেন। উমর ইবন খাত্তাব (রা.) নিজেই রাতের টহলের দায়িত্ব পালন করতেন এবং কখনওবা সাথে তাঁর ভৃত্য অথবা আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) থাকতেন।

সুতরাং, বর্তমানে কিছু কিছু মুসলিম দেশে দোকান মালিকেরা নিজ দায়িত্বে রাতের পাহারাদার নিয়োগ করে থাকে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে দোকান মালিকদের খরচে সরকার পাহারাদার নিয়োগ করে – এ সবই সম্পূর্ণরূপে ভুল। এর কারণ হল রাতের টহল বা পাহারা পুরোপুরি রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং এটি পুলিশবাহিনীর দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং, জনগণের কাঁধে এ দায়িত্ব অর্পণ করা যাবে না কিংবা তাদের কাছ থেকে এজন্য কোনপ্রকার অর্থ আদায় করা যাবে না।

এছাড়া, রাষ্ট্র, সম্প্রদায় ও ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর এরকম সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নজরে রাখা এবং তাদের সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রাষ্ট্র ও জনগণকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। উম্মাহ্'র মধ্য থেকে কারও কাছে যদি এ ধরনের ব্যক্তির ব্যাপারে কোন তথ্য থাকে তবে তা অবশ্যই রাষ্ট্রকে অবহিত করতে হবে। এ ব্যাপারে দলিল হল আল আরকাম থেকে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীসঃ

"আমি একটি অভিযানে ছিলাম এবং শুনতে পেলাম আবদুল্লাহ ইবন উবাই বলছে, আল্লাহ্'র রাসূল ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য তোমরা ব্যয় করো না এবং তোমরা তাঁর চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও; এরপর যখন আমরা আমার চাচা অর্থাৎ, উমরের কাছে পৌছালাম, তিনি এ ঘটনাটি আল্লাহ্'র রাসূলের কাছে বর্ণনা করলেন। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং আমি তাঁর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম।" *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং: ৪৯০১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৭৭২)*

মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী, **"আমি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে আবদুল্লাহ ইবন উবাই সম্পর্কে জানালাম, যে কিনা মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী কাফিরদের সাথে ঘন ঘন সাক্ষাৎ করে এবং একইভাবে, মদীনার চারপাশের ইহুদী এবং মুসলিমদের শত্রুদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে।"**

এ ব্যাপারটি আরও ভালভাবে বোঝার জন্য আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো যাতে করে এটি সাধারণ নাগরিকদের উপর গোয়েন্দাগিরির সাথে মিশ্রিত না হয়ে যায়, কারণ সাধারণ মানুষের উপর গোয়েন্দাগিরি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ বলেন,

'এবং একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান (গোয়েন্দাগিরি) করো না।' **[সূরা হুযুরাত : ১২]**

সুতরাং, গোয়েন্দাগিরি বা নজরদারীর বিষয়টি শুধুমাত্র সন্দেহভাজনদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

এখানে সন্দেহভাজন তারাই যারা কাফের শত্রুরাষ্ট্র অর্থাৎ, যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কিংবা যাদের সাথে যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে তাদের সাথে ঘন ঘন সাক্ষাৎ করে বা যোগাযোগ রক্ষা করে। এর কারণ হল, যুদ্ধের কৌশল হিসাবে এবং মুসলিমদের সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কাফিরদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা শারী'আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত; উপরন্তু, এ বিষয়ে যে শারী'আহ্ দলিলসমূহ পাওয়া যায় তার মধ্যে সকল শত্রুভাবাপন্ন কাফিররাই অন্তর্ভূক্ত। এর কারণ হল, যদি তারা প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত জনগোষ্ঠী হয় তাহলে তাদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা *আবশ্যক*। আর, যদি তারা মুসলিমদের প্রতি শত্রুত্বভাবাপন্ন হয়ে থাকে তবে তাদের উপর গোয়েন্দাগিরি *অনুমোদিত*, কেননা তাদের সাথে যে কোন সময় যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং, কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধরত কাফেরদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখে তাহলে সে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে; কারণ সে এমন কারও সাথে সম্পর্ক রাখছে যাদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা শারী'আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত, অর্থাৎ কাফের শত্রুত্বরাষ্ট্র।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপঃ

১. মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কাফেরদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক। উপরোক্ত দলিল ছাড়াও শারী'আহ্ মূলনীতি অনুসারে, 'ফরয সম্পাদনের জন্য যা করা প্রয়োজন তাও ফরয।' কারণ শত্রুকে পরাজিত করতে হলে শত্রুর শক্তিমত্তা, তার পরিকল্পনা, তার লক্ষ্য এবং এর কৌশলগত অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য জানা দরকার। আর, এ দায়িত্ব পালন করে থাকে যুদ্ধ বিভাগ। যুদ্ধের সম্পর্ক বজায় থাকায় যুদ্ধরত

কাফেরদের সাথে খিলাফত রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকার যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। তাই যদি তাদের সাথে এ ধরনের সম্পর্ক কোন নাগরিক বজায় রাখে তাহলে গুপ্তচরবৃত্তির আওতায় সে নাগরিকও পড়বে।

২. এছাড়া, যুদ্ধে জড়িয়ে পরার সম্ভাবনা রয়েছে এমন কাফেরদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করা অনুমোদিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে এটি বাধ্যতামূলক এই কারণে যে, এর মাধ্যমে রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়। বিশেষ করে যদি এমন আশঙ্কা থাকে যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধরত রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করবে বা তাদের সাথে যোগ দেবে, তবে অবশ্যই তাদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। যাদের সাথে যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে এরকম কাফেরদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

প্রথমত: নিজদেশে বসবাসরত সম্ভাব্য শত্রুভাবাপন্ন কাফের যাদের বিরুদ্ধে খিলাফত রাষ্ট্রের যুদ্ধবিভাগ গুপ্তচরবৃত্তি করবে।

দ্বিতীয়ত: সম্ভাব্য শত্রুভাবাপন্ন কাফের যারা ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করবে, যেমন: দূত হিসাবে বা চুক্তির কারণে আগত ব্যক্তিবর্গ ইত্যাদি। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ এদের পর্যবেক্ষণ করবে ও গোয়েন্দাগিরির আওতায় রাখবে।

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ খিলাফত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অবস্থানরত সম্ভাব্য শত্রুভাবাপন্ন কাফের রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকর্তা বা প্রতিনিধিদের সাথে যেসব নাগরিক নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখবে বা ঘন ঘন যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে তাদের উপরে নজরদারী ও গোয়েন্দাগিরি করবে। অন্যদিকে, খিলাফত রাষ্ট্রের যে সব নাগরিক মুসলিমদের সাথে প্রকৃত অর্থে যুদ্ধরত কাফের রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকর্তা বা প্রতিনিধিদের সাথে তাদের দেশে ভ্রমণ করে দেখা সাক্ষাৎ করবে তাদের উপর যুদ্ধবিভাগ গোয়েন্দাগিরি করবে। তবে এর জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে:

প্রথমত: আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ বা যুদ্ধ বিভাগের পর্যবেক্ষণে যদি এইরকম প্রমাণিত হয় যে, খিলাফত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বা বাইরে অবস্থানরত সম্ভাব্য শত্রুভাবাপন্ন কাফের রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকর্তা বা প্রতিনিধিদের সাথে খিলাফত রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক সম্পর্ক বা যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে তা অস্বাভাবিক ও দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত।

দ্বিতীয়ত: এই দু'বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও নজরদারীতে যা কিছু বের হয়ে আসবে তা অবশ্যই *কাজী হিসবা'*র সামনে পেশ করতে হবে এবং তিনি এ ব্যাপারে রায় দিবেন।

যদি এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তবেই আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অবস্থানরত শত্রুভাবাপন্ন কাফের রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকর্তা বা প্রতিনিধিদের সাথে যেসব নাগরিক সম্পর্ক বা যোগাযোগ রক্ষা করে চলে তাদের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করবে। অন্যদিকে, একই বাস্তবতার কারণে শত্রুভাবাপন্ন কাফের রাষ্ট্রে অবস্থানরত কাফেরদের বিভিন্ন কর্মকর্তা বা প্রতিনিধিদের সাথে খিলাফত রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক সম্পর্ক বা যোগাযোগ রক্ষা করে চলে ও সেসব রাষ্ট্রে ঘন ঘন ভ্রমণ করে তাদের উপর যুদ্ধবিভাগ গোয়েন্দাগিরি করবে।

এগুলোর ব্যাপারে দলিল হল:

১. নিম্নোক্ত আয়াত অনুসারে মুসলিমদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা হারাম। আল্লাহ্ বলেন,

'এবং একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান (গোয়েন্দাগিরি) করো না।' **[সূরা হুযুরাত-১২]**

এটা হল গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধের ব্যাপারে স্বাভাবিক নিষেধাজ্ঞা এবং উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত তা মেনে চলতে হবে। আল মুকদাদ ও আবু উমামাহ থেকে বর্ণিত এ হাদীসটিকে আহমাদ এবং আবু দাউদ নিশ্চিত করেছেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"যদি কোন আমীর তার লোকদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন তাহলে তিনি তাদেরকে অপমানিত করলেন।' *(সূনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৮৮৯ এবং আল হাইছামী, মাজমা' আল-জাওয়ায়িদ, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ২১৮)*

সুতরাং, উপরোক্ত দলিলসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট যে, মুসলিমদের বিষয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করা নিষিদ্ধ। রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের ব্যাপারেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। সুতরাং, মুসলিম বা অমুসলিম যে কোন নাগরিকের উপর গোয়েন্দাগিরি করা নিষিদ্ধ।

২. সেসব কাফের যারা খিলাফত রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে এবং যাদের সাথে যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে - যেমন: যারা দূত হিসাবে বা চুক্তির কারণে আমাদের রাষ্ট্রে আগত; কিংবা, নিজ দেশে অবস্থানরত মুসলিমদের সাথে প্রকৃত যুদ্ধরত কাফেরদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা বৈধ। প্রকৃত অর্থে, প্রকৃত যুদ্ধরত কাফেরদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা আবশ্যক এবং ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে শত্রুভাবাপন্ন কাফেরের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি ক্ষেত্র বিশেষে ফরয।

এ ব্যাপারে দলিলসমূহ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সীরাত থেকে স্পষ্ট:

- *সীরাত ইবনে হিশামে* আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের (রা.) অভিযান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নবী (সাঃ) তাঁকে দুই দিন ভ্রমণ করার নির্দেশ দেন। দুই দিন ভ্রমণের পর আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চিঠিখানা খুললেন এবং পড়লেন। যেখানে তাঁকে বলা হয়েছে, **'আমার চিঠিখানা পড়ার পর তুমি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাকলাহ্ পর্যন্ত ভ্রমণ করবে; তারপর সেখানে তাঁবু স্থাপন করবে এবং কুরাইশদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে আমাদের জন্য তথ্য সংগ্রহ করবে।'**

- *সীরাত ইবনে হিশামে* বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, ইবনে ইসহাক বলেন:

'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং আবু বকর (রা.) ঘোড়ার পিঠে যাত্রা করছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁদের একজন বয়োবৃদ্ধ আরবের সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি (সাঃ) ঐ ব্যক্তির কাছে কুরাইশ, মুহাম্মদ এবং তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে কোন তথ্য জানে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন তথ্য দেব না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা কোত্থেকে এসেছ এ ব্যাপারে আমাকে বল। রাসূল (সাঃ) বললেন, যদি তুমি আমাদের তথ্য দাও তাহলে আমরাও তোমাকে দেব। লোকটি বলল, তাহলে কি এটার বিনিময়ে ওটা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে তখন বলল, অমুক দিন, যদি লোকটি আমাকে সত্য বলে থাকে তাহলে তারা অমুক অমুক জায়গায় থাকবে; একথা বলে সে কুরাইশদের অবস্থানের জায়গার নাম উল্লেখ করে বললো। তারপর লোকটি বলল, তোমরা কোত্থেকে এসেছ? রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন: জলাশয় এবং তিনি তারপর তাঁর কাছ থেকে চলে এলেন। ইবনে ইসহাক বলেন, লোকটি তখন বলছিল, জলাশয় নাকি ইরাকের জলাশয়? তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীদের কাছে ফিরে গেলেন। যখন রাত নেমে এল তখন তিনি আলী ইবনে আবি তালিব, জুবায়ের ইবনে আল আওয়াম এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস সহ আরও কিছু সাহাবীকে খবর সংগ্রহের জন্য বদরের কূপের দিকে পাঠালেন অর্থাৎ কুরাইশদের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য।'

- ইবনে ইসহাক আরও বলেছেন যে, ইবনে হিশাম তার সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'বাসবাস ইবনে আমরু এবং আদী ইবনে আবু আল জাগবা খবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করতেন।' তিনি বলেছেন, তারা কুরাইশদের ব্যাপারে দু'জন দাসীর কথোপকথন শুনতে পেলেন। শোনামাত্র তারা লাফিয়ে উটের পিঠে উঠলেন এবং যা শুনেছেন সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে অবগত করলেন।

যদিও এ তথ্যসমূহ কুরাইশদের সম্পর্কে ছিল – যারা ছিল মুসলিমদের সাথে প্রকৃত অর্থে যুদ্ধরত কাফের। কিন্তু, এ বিধানটি সম্ভাব্য শত্রুভাবাপন্ন কাফেরদের বেলায়ও প্রযোজ্য, কারণ তাদের সাথে যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, প্রকৃত যুদ্ধরত কাফেরদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা *বাধ্যতামূলক*, কারণ শত্রুকে পরাজিত করার যুদ্ধকৌশল হিসাবে এটা প্রয়োজন। আর, অন্যদিকে সম্ভাব্য শত্রুভাবাপন্ন কাফেরদের জন্য বিষয়টি *অনুমোদিত*; কারণ তাদের সাথে যুদ্ধ কাঙ্খিত। তবে, যদি তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, যেমন এটা যদি ধারণা করা হয় যে তারা প্রকৃত যুদ্ধরত কাফেরদের সহযোগিতা করবে কিংবা প্রকৃতঅর্থে তাদের সাথে যুদ্ধে যোগদান করবে, তবে তাদের বেলায়ও গোয়েন্দাগিরি করা ফরয হয়ে যায়।

সুতরাং, কাফের শত্রুদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা মুসলিমদের জন্য অনুমোদিত এবং রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলকভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নির্দেশের কারণেই তা করতে হবে; কিংবা এক্ষেত্রে এ শারী'আহ্ মূলনীতিও প্রযোজ্য যে, 'ফরয সম্পাদনের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তাও ফরয।'

খিলাফত রাষ্ট্রের কোন নাগরিক, সে মুসলিম হোক বা না হোক, যদি কাফের শত্রুদের সাথে ঘন ঘন সাক্ষাৎ করে (তারা আমাদের সাথে প্রকৃত অর্থে যুদ্ধরত কাফের হোক বা আমাদের সম্ভাব্য শত্রু হোক, তারা নিজ দেশে অবস্থান করুক বা আমাদের দেশে অবস্থান করুক), তবে উক্ত নাগরিক সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে এবং তার উপর গোয়েন্দাগিরি করা ও তার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা অনুমোদিত হবে। কারণ, তারা এমন কারও সাথে সম্পর্ক রাখছে যাদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা অনুমোদিত। এছাড়া, তারা যদি কাফেরদের সাহায্যর্থে গুপ্তচরবৃত্তি করে থাকে তাহলে রাষ্ট্রের প্রবল ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে, এ ধরনের নাগরিকদের উপর গোয়েন্দাগিরি করার পূর্বে উপরোল্লিখিত বিষয় দুটি ভালভাবে খতিয়ে দেখতে হবে।

যুদ্ধ বিভাগ সেইসব নাগরিকদের উপর গোয়েন্দাগিরি করবে যারা আমাদের সাথে যুদ্ধরত কাফেরদের সাথে ঘন ঘন সাক্ষাৎ করে এবং যারা শত্রুভাবাপন্ন কাফেরদের কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের সাথে তাদের দেশে ঘন ঘন সাক্ষাৎ করে। আর, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ সেইসব নাগরিকের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করবে যারা খিলাফত রাষ্ট্রে অবস্থানরত শত্রুভাবাপন্ন দেশের কাফেরদের কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করে।

পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ

পররাষ্ট্র বিভাগ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয় অর্থাৎ, খিলাফত রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্র সম্পর্কিত সকল বিষয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে – এই বিষয় ও সম্পর্ক যাই হোক না কেন। এ বিষয়সমূহ রাজনৈতিক হতে পারে যেখানে শান্তি চুক্তি, যুদ্ধবিরতি, সমঝোতা চুক্তি, দূত নিয়োগ, বার্তাবাহক ও প্রতিনিধি প্রেরণ এবং দূতাবাস ও বাণিজ্যিক দূতের আবাস স্থাপন অন্তর্ভুক্ত। আবার অন্যান্য সম্পর্কও হতে পারে, যেমনঃ অর্থনৈতিক, কৃষি, বাণিজ্য, ডাকযোগাযোগ, তারযুক্ত বা তারবিহীন যোগাযোগ ইত্যাদি। খিলাফত রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ এসব কার্যই সম্পাদন করে থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তিনি উসমান বিন আফফান (রা.) কে কুরাইশদের সাথে সমঝোতার জন্য পাঠিয়েছিলেন; ঠিক একইভাবে তিনি কুরাইশ প্রতিনিধিদের সাথে সমঝোতার লক্ষ্যে আলোচনায় বসেছিলেন। তিনি বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্'র কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন এবং রাজা-বাদশাহ্ ও নেতাদের প্রতিনিধি গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, তিনি বিভিন্ন ধরনের চুক্তি ও শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছেন। পরবর্তীতে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে খোলাফায়ে রাশেদীনগণও (রা.) অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তাঁরা হয় নিজেরা এ সকল কাজ সম্পাদন করতেন কিংবা তাঁরা তাঁদের পক্ষ থেকে এ সকল কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্পর্কের জটিলতা, বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যতার কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, খলীফা তার পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র বিষয়ক একটি আলাদা বিভাগ গঠন করবেন; যেখানে খলীফা হয় রাষ্ট্রের অন্যান্য শাসন বিষয়ক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের মত প্রত্যক্ষভাবে শারী'আহ্ বিধিবিধান অনুযায়ী এ সব বিষয় তদারকী করবেন কিংবা, তার নির্বাহী সহকারীর মাধ্যমে এ সকল বিষয়ের তদারকী করবেন।

শিল্প বিভাগ

শিল্প বিভাগ হচ্ছে এমন একটি বিভাগ যা শিল্প সংক্রান্ত সকল বিষয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে; তা ভারী শিল্প সম্পর্কিতই হোক, যেমন: মোটর, ইঞ্জিন, যানবাহন, সরঞ্জামাদি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কিংবা হালকা শিল্পের সাথে সম্পর্কিতই হোক। রাষ্ট্রে অবস্থিত গণমালিকানাধীন বা ব্যক্তি মালিকানাধীন সকল শিল্পকারখানা, যেগুলোর সাথে সামরিক শিল্পের সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই যুদ্ধনীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এর কারণ হল, জিহাদের জন্য প্রয়োজন সেনাবাহিনী; আর, সেনাবাহিনীর প্রয়োজন অস্ত্রশস্ত্র। এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র যেন সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন এবং সর্বাবস্থায় সহজলভ্য হয় এজন্য রাষ্ট্রের নিজস্ব শিল্পকারখানা থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে সামরিক শিল্পকারখানা কারণ, জিহাদের সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

খিলাফত রাষ্ট্র যেন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয় এবং অন্যকোন রাষ্ট্র যেন তাকে প্রভাবিত করতে না পারে, এজন্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই নিজে নিজের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে হবে এবং এগুলোকে ক্রমাগতভাবে উন্নত করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এ নীতি খিলাফত রাষ্ট্রকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী করবে এবং রাষ্ট্রকে প্রযুক্তিগতভাবে সর্বাধুনিক ও সবচাইতে শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী রাষ্ট্রে পরিণত করবে। একইসাথে, এ নীতি রাষ্ট্রকে এমন সব যুদ্ধাস্ত্রের অধিকারী করবে যা রাষ্ট্রের নিশ্চিত ও সম্ভাব্য শত্রুর অন্তরে প্রচন্ড ভীতির সৃষ্টি করবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

'আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন ভীতির সঞ্চার হয় আল্লাহ্'র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন।' **[সূরা আনফাল : ৬০]**

সুতরাং, উপরোক্ত আয়াত অনুসারে, খিলাফত রাষ্ট্রের থাকবে নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি, সে উৎপাদন করবে তার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং এগুলোকে সে ক্রমাগত এমন ভাবে উন্নত করবে যাতে করে রাষ্ট্রের নিশ্চিত ও সম্ভাব্য শত্রুর অন্তরে প্রবল ভীতির সৃষ্টি করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ শক্তিশালী ও সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী হয়। সুতরাং, নিজের অস্ত্রশস্ত্র নিজে উৎপাদন করা খিলাফত রাষ্ট্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব এবং এ ব্যাপারে অন্য কারো উপর নির্ভর করা রাষ্ট্রের জন্য অনুমোদিত নয়। কারণ, তাহলে এ নির্ভরশীলতা অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহকে খিলাফত রাষ্ট্রের ইচ্ছাশক্তি, এর অস্ত্রশস্ত্র ও এর যুদ্ধঘোষণাকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ তৈরী করে দেবে।

বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় এটা সুস্পষ্ট যে, অস্ত্রবিক্রেতা দেশসমূহ অন্যান্য দেশগুলোর কাছে সাধারণতঃ সব ধরনের অস্ত্র বিক্রি করে না, বিশেষ করে সর্বাধুনিক অস্ত্র। এমনকি তারা বিশেষ শর্ত আরোপ ব্যতীতও অস্ত্র বিক্রয় করে না, যাতে করে তাদের স্বার্থ রক্ষিত হয়। আবার অস্ত্র বিক্রয়ের সময় ক্রেতা দেশ নয়, বরং তারা নিজেরাই এর পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে। যা অস্ত্রবিক্রেতা দেশটিকে ক্রেতা দেশটির উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরী করে এবং তারা সহজেই ক্রেতা দেশটির উপর তাদের নিজস্ব ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে ক্রেতা দেশটি যদি যুদ্ধরত অবস্থায় থাকে; কারণ, এ পরিস্থিতিতে তাদের ব্যাপক অস্ত্রশস্ত্র, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ও গোলাবারুদের প্রয়োজন হয়। ফলশ্রুতিতে, ক্রেতা দেশটি অস্ত্রবিক্রেতা দেশটির উপর ক্রমান্বয়ে আরও বেশী নির্ভরশীল হয়ে যায় এবং এ পরিস্থিতি দেশটিকে অন্যান্য দেশের চাওয়া-পাওয়ার অধীনস্থ করে তোলে। এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে, অস্ত্রবিক্রেতা দেশটি ক্রেতা দেশটির স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে পুরোপুরি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় যখন গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের ব্যাপক চাহিদা থাকে। এর ফলে, ক্রেতা দেশটি অস্ত্র রপ্তানীকারক দেশটির কাছে তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি বিকিয়ে দিয়ে জিম্মি রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

উপরোল্লিখিত কারণসমূহ পর্যালোচনা করে এটা বলা যায় যে, খিলাফত রাষ্ট্রকে অবশ্যই স্বাধীনভাবে নিজে নিজের অস্ত্রশস্ত্র এবং ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশসহ যুদ্ধযন্ত্রের সাথে জড়িত সমস্ত কিছু উৎপাদন করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। আর এটা কখনই সম্ভবপর হবে না, যদি না রাষ্ট্রের অধিকারে ভারী শিল্প থাকে এবং রাষ্ট্র এমন সব কলকারখানা স্থাপন করে যা সামরিক ও বেসামরিক ভারী শিল্পদ্রব্যাদি উৎপাদন করে। সুতরাং, এটা অত্যাবশ্যকীয় যে, সকল ধরনের পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র, রকেট, স্যাটেলাইট, উড়োজাহাজ, ট্যাঙ্ক, মহাকাশযান, মোটরগাড়ি, নৌযান, সাঁজোয়াযান এবং অন্যান্য সকল ভারী ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় কলকারখানা স্থাপন করতে হবে; এবং সেইসাথে এটাও প্রয়োজনীয় যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এমন সব কলকারখানা থাকবে যা যন্ত্রপাতি, মোটর, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, ইলেক্ট্রনিক পণ্য ইত্যাদি তৈরী করবে। এছাড়া, রাষ্ট্রে থাকবে গণমালিকানা সম্পদের সাথে সম্পর্কিত কলকারখানা এবং সেইসাথে থাকবে সামরিকশিল্পের

সাথে জড়িত হালকা সরঞ্জামাদি উৎপাদনের কারখানা। এ সমস্ত কিছুই যুদ্ধ প্রস্তুতির আওতাধীন এবং আল্লাহ্'র বিধান অনুযায়ী এ প্রস্তুতি গ্রহণ করা মুসলিমদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

'আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে' **[সূরা আনফাল : ৬০]**

যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র দাওয়াতী কার্যক্রম ও জিহাদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বাণী বহন করে নিয়ে যাবে, সেহেতু এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে সবসময় অব্যাহতভাবে জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আর একারণেই, যুদ্ধনীতির উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রকে নিজস্ব ভারী ও হালকা শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে হবে। যেন যে কোন সময় রাষ্ট্র এ কলকারখানাগুলোকে সামরিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে রূপান্তরিত করতে পারে। সুতরাং, খিলাফত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ সকল ভারী ও হালকা শিল্পকারখানা অবশ্যই যুদ্ধনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যে কোন সময় এ সকল কারখানাকে সামরিক সরঞ্জামাদি উৎপাদনের কাজে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হয়।

বিচার বিভাগ

আদালতের রায় কার্যকর করার লক্ষ্যে রায় প্রদান করা বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব। এ বিভাগ জনগণের মধ্যকার বিবাদের মীমাংসা করে, জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে বা জনস্বার্থের জন্য হুমকীস্বরূপ বিষয়সমূহ প্রতিহত করে এবং জনগণ ও শাসনব্যবস্থার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার বিবাদ নিরসন করে, এসব ব্যক্তিবর্গ হতে পারেন শাসক, সরকারী কর্মকর্তা, খলীফা বা অন্য কোন ব্যক্তি।

ইসলামী বিচারব্যবস্থার উৎস ও এর বৈধতার দলিল হল আল্লাহ্'র কিতাব ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

'আর আপনি তাদের পারস্পরিক বিষয়সমূহে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করুন।' **[সূরা মায়েদা : ৪৯]**

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,

'তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাদের মধ্য হতে কোন কোন দল মুখ ফিরিয়ে নেয়।' **[সূরা নূর : ৪৮]**

সুন্নাহ্'র ক্ষেত্রে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে বিচারব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনি (সাঃ) স্বয়ং লোকদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে বিচারকদের নিয়োগ দিতেন। তিনি (সাঃ) আলীকে ইয়েমেনের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং বিচারকার্য পরিচালনার জন্য এভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে,

'যদি দুইজন ব্যক্তি তোমার কাছে বিচারের জন্য আসে তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত একজনের পক্ষে রায় দিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি অপরজনের কথা শুনো; আর, এভাবেই তুমি লোকদের মধ্যে ফায়সালা করতে পারবে।' *(সূনানে তিরমিযী, হাদীস নং-১৩৩১ এবং মুসনাদে আহমাদ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬৫)*

আহমেদ এর অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যেঃ

'যদি দু'জন বিবাদমান ব্যক্তি তোমার সামনে বসে তবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি অন্যজনের কথা শোন, যেভাবে তুমি প্রথমজনের কথা শুনেছো।' *(মুসনাদে আহমাদ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬৫)*

এছাড়া, তিনি (সাঃ) মুয়াজকে আল-জানাদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেন। উল্লেখিত এ প্রতিটি ঘটনা বিচারব্যবস্থার বৈধতাকে প্রমাণ করে।

বিচারব্যবস্থার সংজ্ঞার মধ্যে জনগণের মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তি করা অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া, এর মধ্যে *হিসবাহ্* (জনগণের অধিকার) ও অন্তর্ভূক্ত, যার অর্থ হলঃ "বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনগণকে শারী'আহ্ বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিত করা, যে বিধিবিধান লঙ্ঘনের ফলে জনস্বার্থ ক্ষুন্ন বা জনগণের অধিকার বিনষ্ট হয়।" এই বিষয়টি খাদ্যের স্তুপ সম্পর্কিত হাদীসে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত আছে। আবু হুরাইরার বরাত দিয়ে সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে,

'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার খাবারের একটি স্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তুপের ভেতর তার আঙ্গুল প্রবেশ করানোর পর আর্দ্রতা অনুভব করলেন এবং তখন বিক্রেতাকে বললেন, 'এটা কি?' তখন উক্ত বিক্রেতা তাকে বললেন, 'হে 'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), এগুলো বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।' তখন তিনি (সাঃ) বললেন, 'তুমি এগুলোকে উপরে রাখছ না কেন যাতে লোকেরা দেখতে পায়? যে প্রতারণা করে সে আমাদের কেউ নয়।' *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১০২)*

এছাড়া, বিভাগের মধ্যে *মাযালিম* (অন্যায় আচরণ) ও অন্তর্ভূক্ত। কারণ, *মাযালিম* বিচারকার্যের অংশ, শাসনকার্যের নয়। প্রকৃত অর্থে, *মাযালিম* বলতে শাসকের বিরুদ্ধে কৃত অভিযোগকে বোঝায়। *মাযালিম*কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারেঃ "সাধারণ জনগণ এবং খলীফা কিংবা, তার কোন ওয়ালী বা কর্মকর্তার মধ্যকার বিবাদ নিরসনের জন্য বাস্তবায়নের

নিমিত্তে শারী'আহ্ রায় প্রদান করা; কিংবা, জনগণকে শাসন করার নিমিত্তে ব্যবহৃত কোন শারী'আহ্ দলিলের ব্যাখ্যার ব্যাপারে জনগণ ও শাসকের মধ্যে কোন প্রকার মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে সে বিষয়টি নিরসন করা।" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত হাদীসে *মাযালিম* -এর ব্যাপারটি উল্লেখিত আছে, যেখানে তিনি (সাঃ) বলেছেন:

'এবং আমি অবশ্যই আশা করি যে, আমি আল্লাহ্ ওয়া জাল্লার সামনে এমনভাবে হাজির হব যাতে কেউ আমার বিরুদ্ধে মাযালিমা'র (অন্যায় আচরণের) অভিযোগ না করতে পারে, সেটা রক্ত সম্পর্কিত হোক বা অর্থ সম্পর্কিতই হোক।' *(আনাসের বরাত দিয়ে আহমাদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; দেখুন: আল হাইছামী, মাজমা' আল-জাওয়ায়িদ, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১০২)*

এ হাদীসটি আমাদের দিকনির্দেশনা দেয় যে, শাসক, ওয়ালী অথবা জনপ্রশাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে মাযালিমের বিচারকদের নিকট পেশ করতে হবে এবং তিনি প্রয়োগের নিমিত্তে এ ব্যাপারে শারী'আহ্ বিধিবিধান অনুযায়ী রায় প্রদান করবেন।

সুতরাং, রাসূল (সাঃ) এর হাদীস ও কর্মকান্ড থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বিচারব্যবস্থার সংজ্ঞার মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত এবং এগুলো হল: জনগণের মধ্যকার বিবাদ নিরসন করা, জনগণের অধিকার ক্ষুন্ন হতে পারে এমন কর্মকান্ড প্রতিরোধ করা এবং জনগণ ও শাসকের মধ্যকার বিরোধ অথবা জনপ্রশাসক ও জনগণের মধ্যকার বিরোধের মীমাংসা করা।

বিচারকদের প্রকারভেদ

ইসলামী বিচারব্যবস্থায় তিন ধরনের বিচারক রয়েছে:

১. *কাজী আল-খুশুমাত*: যিনি হুদুদ (শাস্তি সম্পর্কিত) এবং লেনদেন বিষয়ে জনগণের মধ্যকার বিবাদ নিরসন করবেন।

২. *কাজী আল-মুহতাসিব*: যিনি কোন আইন লঙ্ঘনের কারণে যদি জনস্বার্থ ক্ষুন্ন বা জনসম্পদ বিনষ্ট হয় তাহলে সে বিষয়ে বিচার করবেন।

৩. *কাজী আল- মাযালিম*: যিনি রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যকার বিবাদের নিষ্পত্তি করবেন।

কাজী আল-খুশুমাত (যিনি জনগণের মধ্যকার বিবাদ নিরসন করবেন) এর ব্যাপারে দলিল হল রাসূল (সাঃ)এর কর্মকান্ড এবং রাসূল (সাঃ) কর্তৃক বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারক নিযুক্তকরণ। যেমন: তিনি মুয়াজ ইবন জাবালকে ইয়েমেনের একটি অঞ্চলের বিচারক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

কাজী আল-মুহতাসিব (যিনি জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে বিচার করবেন) এর ব্যাপারে দলিল হল রাসূল (সাঃ) এর কাজ এবং উক্তি যেখানে তিনি বলেছেন: **"যে প্রতারণা করে সে আমাদের কেউ নয়।"** [এটি আবু হুরাইরার বরাত দিয়ে আহমাদ বর্ণিত একটি হাদীসের অংশ]; এ হাদীস থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সাঃ) প্রতারকদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করতেন এবং তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন।

এছাড়া, তিনি (সাঃ) ব্যবসায়ীদের ব্যবসাকালে সত্য কথা বলার এবং সাদাকা প্রদানের নির্দেশ দিতেন। কায়েস ইবনে আবি ঘারজা আল কিনানীর সূত্রে আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, আবি ঘারজা বলেছেন: "আমরা মদিনাতে সাধারণত মালামাল ভর্তি কার্গো ক্রয় করতাম এবং নিজেদের ফরিয়া বলে পরিচয় দিতাম। রাসূল (সাঃ) আমাদের কাছে এলেন এবং আমাদের উত্তম নামে অভিহিত করলেন এবং বললেন,

'হে ব্যবসায়ীগণ, অবশ্যই ব্যবসার সাথে শপথ গ্রহণ ও কথাবলার বিষয়গুলো জড়িত। সুতরাং, তোমরা এর সাথে সাদাকাকে সম্পর্কিত করে নাও।'

এছাড়া, আবু আল মিনহাল থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে:

'জায়েদ ইবনে আরকাম ও আল বারা ইবনু 'আযিব ব্যবসায়িক অংশীদার ছিল। তারা কিছু রৌপ্য নগদ অর্থে এবং কিছু বাকীতে খরিদ করল। এ খবর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকট পৌছালো তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যে, 'যেখানে নগদ পরিশোধ করা হয়েছে সেখানে কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু, যা বাকীতে বিক্রয় করা হয়েছে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।' এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে ঋণের সাথে যুক্ত সুদ থেকে রক্ষা করলেন।

এ সবই কাজী হিসবাহ্'র বিচারকার্যের এখতিয়ারভূক্ত বিষয়। জনস্বার্থের জন্য হুমকীস্বরূপ বিষয়সমূহ মীমাংসা করার জন্য বিচারব্যবস্থার হিসবাহ্ নামক এ বিভাগটি আসলে একটি বিশেষ অর্থবোধক শব্দ যা দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রে সম্পাদিত একটি বিশেষ কাজকে বোঝানো হয়ে থাকে; যেমনঃ ব্যবসায়ী ও দক্ষ শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করা যেন তারা তাদের ব্যবসা, তাদের শ্রম, উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমে কিংবা পণ্যদ্রব্য ওজন ও পরিমাপের সময় কিংবা অন্যকোন পদ্ধতিতে জনগণকে প্রতারিত করতে না পারে, যা কিনা জনস্বার্থকে ক্ষুন্ন করতে পারে। বস্তুতঃ এটা হচ্ছে সেই কাজ যা রাসূল (সাঃ) নিজে করে দেখিয়েছেন, এ বিষয়ে তদারকি করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সরাসরি রায় প্রদান করেছেন; যা কিনা আল-বারা ইবনে আযিব বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, যেখানে তিনি (সাঃ) উভয়পক্ষকে সুদভিত্তিক ঋণে ক্রয়বিক্রয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়া, মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) সা'ইদ ইবনুল আসকে মক্কার বাজারের মুহতাসিব হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, যা ইবন সা'দ এর *তাবাকাত* ও ইবন 'আবদ আল-বার এর *আল-ইসতিয়াব* গ্রন্থে উল্লেখিত আছে। সুতরাং, হিসবাহ্'র দলিল হল রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্। এছাড়া, উমর (রা.) তাঁর নিজ গোত্রের উম্ম সুলাইমান ইবন আবি হিশমা উরফে আশ-শিফা নামের এক মহিলাকে বাজার পর্যবেক্ষক (ইন্সপেক্টর) হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন; এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইবন উতবাহ'কে মদিনার বাজারের বিচারক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন, যা ইমাম মালিক তাঁর আল-মুয়াত্তা এবং ইমাম শাফী' তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া, তিনি নিজেও মুহাম্মদ (সাঃ) এর মতো বাজারে টহল দিতেন এবং হিসবাহ সম্পর্কিত বিষয়াদি তদারকি করতেন। খলীফাগণ এভাবেই নিজেরা হিসবাহ্ সম্পর্কিত বিষয়াদি তদারকী করতে থাকেন যে পর্যন্ত না আল-মাহদী তার শাসনামলে হিসবাহ্'কে বিচারব্যবস্থার একটি বিশেষ বিভাগে পরিণত করেন। খলীফা হারুনুর রশীদের সময় মুহতাসিবগণ (হিসবাহ'র বিচারক) বাজারে ঘুরে ঘুরে টহল দিতেন, ওজন ও পরিমাপের বিষয়সমূহ তদারকি করতেন এবং সকল প্রকার লেনদেন পর্যবেক্ষণ করতেন।

আর, *কাজী আল-মাযালিমের* দলিল পাওয়া যায় পবিত্র কুর'আন থেকে যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

'যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পর, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।' **[সূরা নিসা : ৫৯]**

এর ঠিক আগে আল্লাহ্ বলেন,

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্'র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের।' **[সূরা নিসা : ৫৯]**

সুতরাং, সাধারণ জনগণ ও কর্তৃত্বশীলদের মধ্যকার যে কোন বিরোধ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) এর দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ, আল্লাহ্'র হুকুমের নিকট পেশ করতে হবে। মূলতঃ এ ব্যাপারটিই একজন বিচারকের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে যিনি এ ধরনের বিবাদের ব্যাপারে আল্লাহ্'র হুকুম অনুযায়ী রায় প্রদান করবেন; আর এ বিচারকই হচ্ছেন মাযালিমের বিচারক। এছাড়া, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) এর কাজ ও উক্তি থেকেও এ বিষয়ে দলিল পাওয়া যায়। তবে, রাসূল (সাঃ) সমগ্র রাষ্ট্রের উপর বিশেষ কাউকে মাযালিমের বিচারক হিসাবে নিয়োগ করেননি; কিংবা তাঁর পরবর্তী সময়ে খোলাফায়ে রাশেদীনগণও তা করেননি। বরং, তাঁরা নিজেরাই এ দায়িত্ব পালন করেছেন; যেমনটি হয়েছিল 'আলী ইবন আবি তালেবের (রা.) সময়। কিন্তু, তিনি মাযালিমের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় বা বিশেষ কোন পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি; তিনি এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই সেটি ফয়সালা করতেন। সুতরাং, এটা আসলে তিনি তার সাধারণ দায়িত্ব-কর্তব্যের অংশ হিসাবেই করতেন। খলীফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপারটি এভাবেই চলতে থাকে। বস্তুতঃ তিনিই হচ্ছেন প্রথম খলীফা যিনি মাযালিমের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেন। যখনই মাযালিম সম্পর্কিত কোন বিষয় তার কাছে অস্পষ্ট মনে হত তিনি তখন তার বিচারককে এ বিষয়টি ফয়সালার দায়িত্ব দিতেন। এর পরবর্তী সময় থেকে খলীফাগণ জনগণের অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয় দেখাশুনার জন্য সহকারী নিয়োগ করতেন। তখন থেকেই মাযালিমের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থার জন্ম হয়, যা কিনা 'সুবিচারের গৃহ' বা দার-উল-আদল

নামে পরিচিতি লাভ করে। মাযালিমের বিচারক নিয়োগ করা এজন্য অনুমোদিত যে, খলীফা তার নির্বাহী ক্ষমতা বলে তার পক্ষ থেকে যে কাউকে তার সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন। সুতরাং, এ কাজ সম্পাদনের জন্য তিনি একজন বিচারকও নিয়োগ করতে পারেন। এছাড়া, মাযালিমের জন্য কোন বিশেষ সময় বা পদ্ধতি নির্ধারণ করাও অনুমোদিত, কারণ এসবই মুবাহ্ (অনুমোদিত) কাজের অন্তর্ভূক্ত।

বিচারকের যোগ্যতার শর্তাবলী

যিনি বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তাকে অবশ্যই মুসলিম, স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, ন্যায় বিচারক, ফকীহ্ (বিজ্ঞ আলেম) এবং বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে শারী'আহ্ আইন প্রয়োগের ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে। এছাড়া, যিনি মাযালিমের বিচারকের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তাকে উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ করা ছাড়াও অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে পুরুষ ও মুজতাহিদ হতে হবে, যা কিনা প্রধান বিচারপতির (*কাজী আল কুদাহ্*) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ, মাযালিমের বিচারকের কাজে বিচার ও শাসন এদু'টি বিষয়ই জড়িত ও এক্ষেত্রে শাসকের উপর শারী'আহ্ আইন বাস্তবায়ন করা হয়। সুতরাং, বিচারকের অন্যান্য পদের ব্যতিক্রম হিসেবে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে মাযালিমের বিচারককে পুরুষ হতে হবে। এছাড়া, শাসকগণ আল্লাহ্'র আইন ছাড়া অন্যকোন কিছু দিয়ে শাসন করছেন কিনা, অর্থাৎ, তারা এমন কোন আইন প্রয়োগ করছেন কিনা যার কোন শারী'আহ্ দলিল নেই, সে বিষয়গুলোকে প্রতিহত করতে, কিংবা, তারা এমন কোন দলিল ব্যবহার করছেন কিনা যা ঘটনার সাথে সম্পর্কিত নয় তা বোঝার জন্য তাকে মুজতাহিদও হতে হবে। কারণ, একমাত্র একজন মুজতাহিদই মাযালিমা সম্পর্কিত এ জটিল বিষয়সমূহ বুঝতে পারেন। আর, তিনি যদি মুজতাহিদ না হন তবে এমন হতে পারে যে, তিনি এমন সব বিষয়ে বিচার করতে পারেন যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই, যা কিনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। একারণে, শাসক বা অন্যান্য বিচারক পদের যোগ্যতার শর্তের ব্যতিক্রম হিসাবে মাযালিমের বিচারককে মুজতাহিদ হতে হবে।

বিচারক নিয়োগ

কাজী-উল খুশুমাত, মুহতাসিব এবং মাযালিমের বিচারকগণকে সমগ্র রাষ্ট্রব্যাপী সব বিষয়ে সাধারণ ক্ষমতা দিয়ে নিয়োগ করা অনুমোদিত। আবার, তাদের ভৌগলিক অঞ্চল ভেদে কোন বিশেষ এলাকায় কিংবা, কোন বিশেষ বিষয়ের দায়িত্ব দিয়ে নিয়োগ দেয়াও অনুমোদিত। রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্'তে এ ব্যাপারে দলিল রয়েছে; যেমনঃ তিনি (সাঃ) আলী ইবনে আবি তালিবকে সমগ্র ইয়েমেনের উপর, মু'য়াজ ইবনে জাবালকে ইয়েমেনের কিছু অঞ্চলের উপর এবং আমর ইবনে আল আসকে একটি বিশেষ বিষয়ে বিচারক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

বিচারকদের সম্মানী বা বেতন ভাতা

আল হাফিয তার *আল-ফাতেহ্* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যেঃ সম্মানী বা বেতন ভাতা হচ্ছে সেটাই যা মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার কাজে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিকে ইমাম বাইতুল মাল থেকে প্রদান করেন। বিচারকার্য সম্পাদন করা রাষ্ট্রের এমন একটি কাজ যার জন্য অবশ্যই বাইতুল মাল থেকে সম্মানী গ্রহণ করা বৈধ। কারণ, এটি জনস্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত কাজ। বস্তুতঃ কাউকে যদি মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার্থে শারী'আহ্ আইন অনুযায়ী কোন কাজ সম্পাদন করার জন্য নিযুক্ত করা হয়, তা ইবাদত সংক্রান্ত হোক বা অন্য কোন বিষয় হোক, তাহলেই সে সম্মানী পাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। এর পক্ষে দলিল হল আল্লাহ্'র আয়াত; কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকাহ্ সংগ্রহকারীদের জন্য সাদাকার (যাকাতের) একটি অংশ নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

'*এবং যারা তা সংগ্রহ করে।*' **[সূরা তাওবা : ৬০]**

আবু দাউদের *শুনান* গ্রন্থে এবং ইবনে খুজায়মা'র সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে বুরাইদা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে – যাকে আল বায়হাকী ও আল হাকীম বুখারী ও মুসলিমের সহীহ্ হাদীসের শর্ত পূরণ করেছে বলে মতামত দিয়েছেন এবং আল জাহাবীও এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। উক্ত হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন যেঃ

'আমরা যদি কোন কর্মচারীকে নিয়োগ দেই ও তার জন্য সম্মানী ভাতা নির্ধারণ করে দেই, তারপরও যদি কেউ এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে তবে তা অবশ্যই প্রতারণা (ঘুলুল)।' *(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-২৯৪৩)*

আল মাওয়ারদী তার *আল-হাওয়ী* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'বিচারকগণ বাইতুল মাল থেকে ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন। কেননা আল্লাহ্ সাদাকার মধ্যে সাদাকা সংগ্রহকারীদের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করেছেন। এছাড়া, উমর (রা.) সুরাই'কে নিয়োগ করেছিলেন এবং তার জন্য মাসিক একশত দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। আলীর (রা.) খিলাফতের সময় তিনি সুরাই এর জন্য মাসিক পাঁচশত দিরহাম নির্ধারণ করেন; এছাড়া জায়েদ ইবনে সাবিতও (রা.) বিচারকার্যের জন্য অর্থ গ্রহণ করতেন।' আল বুখারী এ বক্তব্যের ব্যাপারে বলেছেন যে, 'সুরাই বিচারকার্যের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন।'

এছাড়া, আল-হাফিয এ মন্তব্যের ব্যাপারে বলেন যে, 'সা'ইদ ইবন মানসুর সুরাই এর অর্থ গ্রহণের বিষয়ে সুফিয়ান হতে, সুফিয়ান মুজাহিদ হতে, আবার মুজাহিদ আশ-শা'বী থেকে আমাদের জানান যে: 'মাশরুক বিচারকার্যের জন্য অর্থ গ্রহণ করতেন না; আর, সুরাই সম্মানী গ্রহণ করতেন।' আল-হাফিয তার *আল-ফাতিহ্* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে: 'ইবন আল মুনদির বলেছেন যে, জায়িদ ইবন ছাবিত বিচারকার্যের জন্য সম্মানী গ্রহণ করতেন।' নাফি' থেকে ইবন সাদ বর্ণনা করেছেন যে: 'উমর ইবনুল খাত্তাব যায়িদ ইবন ছাবিতকে বিচারক হিসাবে নিয়োগ দেন এবং তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন।' বিচারকার্যের জন্য সম্মানী গ্রহণ করা যে শারী'আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত এ ব্যাপারে সাহাবীদের (রা.) ঐক্যমত এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের (তাবেঈনদের) ঐক্যমত ছিল। আল-হাফিয তার *আল-ফাতিহ্* গ্রন্থে বলেছেন যে: "আবু আলী আল-কারাবিজি বলেছেন: বিচারকদের বিচারকার্যের জন্য সম্মানী গ্রহণ করার মধ্যে কোন দোষ নেই; এ বিষয়টিকে সাহাবী (রা.) ও তাবেঈনগণ সহ ইসলামের সকল পন্ডিত একইভাবে দেখেছেন এবং বুঝেছেন। সেইসাথে, সকল প্রদেশের আইনবিদদের এ বিষয়ে একই মতামত এবং জানামতে তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈততা নেই। মাশরুক এটিকে অপছন্দ করেছেন; কিন্তু, কেউই এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি।" ইবন কুদামাহ্ তার *আল-মুগনী* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "মুয়াজ ইবন জাবাল ও আবু উবাইদাহ'কে আল-শাম অঞ্চলে প্রেরণকালে উমর (রা.) তাঁদের পত্র মারফত কিছু ভাল লোক খুঁজে বের করার এবং তাদেরকে বিচারকার্যে নিয়োগ করার নির্দেশ দেন। তিনি তাঁদের বলেন যে, "তাদের জন্য যথাসাধ্য কর, তাদের জন্য সম্পদ বরাদ্দ কর এবং আল্লাহ্'র সম্পদ দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট কর।"

ট্রাইবুনাল গঠন

ইসলামী বিচারব্যবস্থায় একের বেশী বিচারকের সমন্বয়ে ট্রাইবুনাল (Bench) গঠন করা, যাদের বিচারের রায় প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে, তা অনুমোদিত নয়। তবে, শুধুমাত্র পরামর্শ করার খাতিরে কিংবা, মতামত ব্যক্ত করার জন্য একের অধিক বিচারকের উপস্থিতি অনুমোদিত; তবে, এক্ষেত্রে একজন বিচারক ছাড়া অন্য কারো রায় প্রদানের কোন ক্ষমতা থাকবে না বা উক্ত বিচারকের জন্য অন্যান্যদের মতামত বা পরামর্শ গ্রহণে কোনপ্রকার বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

কারণ, রাসূল (সাঃ) কখনও একটি বিষয়ের জন্য দু'জন বিচারক নিযুক্ত করেননি; বরং, তিনি (সাঃ) একটি বিষয়ের জন্য শুধুমাত্র একজন বিচারক নিয়োগ করেছেন। এছাড়া, বিচারব্যবস্থা হল প্রয়োগের নিমিত্তে কোন বিষয়ে শারী'আহ্ রায় প্রদান করা। আর, একজন মুসলিমের জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে শারী'আহ্ বিধান একের অধিক হতে পারে না; কারণ, প্রদত্ত রায়টি তার জন্য আল্লাহ্'র বিধান এবং একটি বিষয়ে আল্লাহ্'র বিধান একটিই হবে। তবে এটা ঠিক যে, একটি শারী'আহ্ হুকুমের বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কিন্তু, মুসলিমদের জন্য বাস্তবিকভাবে হুকুমটি *প্রয়োগের ক্ষেত্রে* এটা একটি মাত্র বিধান হতে হবে এবং তা কখনও বিভিন্ন রকম হতে পারবে না। সুতরাং, বিচারক যখন কোন বিশেষ বিষয়ে প্রয়োগের নিমিত্তে কোন রায় প্রদান করবেন, তখন এই রায় অবশ্যই একটি হতে হবে। কারণ, প্রয়োগের বাধ্যবাধকতার শর্তে রায়টি প্রদান করা হয়েছে এবং এই রায় কার্যকর করার অর্থ হল উক্ত বিষয়ে আল্লাহ্'র বিধান কার্যকর করা। আর, বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহ্'র বিধান কখনও বিভিন্ন রকম হবে না, যদিও এর ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। এজন্য, একই বিষয়ের জন্য একই আদালতে একের অধিক বিচারক নিয়োগ করা বৈধ নয়। তবে কোন দেশের ক্ষেত্রে, দুটি পৃথক আদালতে একটি অঞ্চলের সব ধরনের বিষয়সমূহ ফয়সালা করা অনুমোদিত। কারণ, বিচারব্যবস্থার কার্যাবলী খলীফার দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং, বিচারকার্য পরিচালনার জন্য কাউকে নিয়োগ করা আসলে খলীফার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ করার সাথে তুলনীয়, অর্থাৎ, একের অধিক প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ; আর তাই, একই অঞ্চলে একের অধিক বিচারক থাকা বৈধ। যদি বিবাদমান দু'পক্ষ কোন ট্রাইবুনাল বা আদালতে তাদের বিবাদ মীমাংসা করবে বা কোন বিচারকের দারস্থ হবে এ বিষয়ে মতৈক্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয়, তবে বিবাদীর পছন্দের উপর বাদীর পছন্দকে গুরুত্ব দেয়া হবে এবং তার পছন্দের বিচারকের হাতেই মামলা ন্যস্ত করা হবে। যেহেতু মামলা করার মাধ্যমে সে তার অধিকার দাবি করছে, তাই এক্ষেত্রে বিবাদীর চাইতে বাদীর পছন্দকে বেশী গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

বিচারকগণ একমাত্র আদালতেই বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারেন; এবং শুধুমাত্র আদালতেই দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন, সাক্ষ্য প্রদান এবং শপথগ্রহণ করতে হবে। কারণ, আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবায়ের (রা.) এর বরাত দিয়ে আবু দাউদের সুনানে বর্ণিত আছে যে:

'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, বিবাদমান দু'পক্ষকে অবশ্যই বিচারকের সামনে বসতে হবে।' *(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৫৮৮)*

এ হাদীসটি বিচারকার্য কিভাবে পরিচালনা করতে হবে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছে এবং এটাই বিচারকার্য পরিচালনার আইনসঙ্গত পদ্ধতি। অর্থাৎ, এ হাদীস নির্দেশ দিচ্ছে যে, বিচারকার্য পরিচালনার জন্য অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কাঠামো থাকতে হবে। আর, তা হল, বিবাদমান দু'পক্ষকে অবশ্যই বিচারকের সামনে উপস্থিত থাকতে হবে এবং এটাই হবে আদালত। সুতরাং, বিচারকার্যক্রমের বৈধতার ক্ষেত্রে এটা শর্ত যে, প্রথমতঃ এ কাজের জন্য অবশ্যই একটি নির্ধারিত স্থান থাকতে হবে যেখানে মামলা সংক্রান্ত রায় প্রদান করা হবে এবং শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই এই রায়কে আইনসঙ্গত রায় বলে বিবেচনা করা হবে। আর, দ্বিতীয়তঃ বিবাদমান দু'পক্ষকে অবশ্যই বিচারকের সামনে উপস্থিত থাকতে হবে।

এ বিষয়টি আলী (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারাও সমর্থিত, যেখানে রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

'হে 'আলী, যদি তোমার সামনে বিচারের জন্য বিবাদমান দু'পক্ষ বসে; তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত একজনের পক্ষে রায় দিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি প্রথম পক্ষের মত অন্য পক্ষের কথাও শুনে থাক।'

এ হাদীসটিও বিচারের জন্য একটি বিশেষ কাঠামোর প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে; কারণ, এ হাদীসে বলা হয়েছে: **'যদি তোমার সামনে বিচারের জন্য বিবাদমান দু'পক্ষ বসে...'**।

সুতরাং, বিচারের রায় বৈধ হিসাবে বিবেচিত হবার শর্ত হিসাবে আদালতের উপস্থিতি আবশ্যক; এবং একইসাথে এটা শপথগ্রহণের জন্যও আবশ্যকীয়। কারণ, রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

'বিবাদীকে অবশ্যই শপথ নিতে হবে।' এই হাদীসটি ইবনে আব্বাসের সূত্রে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন। *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-২৬৬৮)*

বস্তুতঃ আদালত ব্যতীত বিবাদীকে বিবাদী হিসাবে বিবেচনা করা হবে না; এবং একই কথা সাক্ষ্যপ্রমাণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করা ব্যতীত তা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। কারণ, রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

'ফরিয়াদীকে সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে হবে এবং শপথগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হবে তার প্রতিপক্ষের উপর (অর্থাৎ, আসামীর উপর)।' *(বায়হাকী)*

উপরন্তু, আদালত ব্যতীত কোন ফরিয়াদীকে বাদী হিসাবে বিবেচনা করা হবে না।

মামলার প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের আদালত থাকা অনুমোদিত। সুতরাং, এটা অনুমোদিত যে, কিছু সংখ্যক বিচারক একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কিছু বিশেষ ধরনের মামলার দায়িত্বে থাকবেন; এবং অন্য মামলাসমূহকে তারা অন্য আদালতে পাঠাবেন।

এর কারণ হল, বিচারকার্যের জন্য বিচারক নিয়োগ করা খলীফার পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি নিয়োগের অনুরূপ; এবং এদুটো বিষয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃত অর্থে, বিচারব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বের (deputyship) আরেকটি রূপ, যা কিনা সাধারণভাবে খলীফার প্রতিনিধিত্ব করা হতে পারে, আবার কোন বিশেষ বিষয়ে তার প্রতিনিধিত্ব করার অনুরূপও হতে পারে। সুতরাং, একজন বিচারককে শুধু কিছু বিশেষ ধরনের মামলা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োগ করা যেমন অনুমোদিত, যেখানে উক্ত বিচারক নির্ধারিত ঐ ধরনের মামলা ছাড়া অন্য কোন মামলা পরিচালনা করতে পারবেন না; আবার, অন্য কোন বিচারককে একই স্থানে নির্ধারিত ঐ ধরনের মামলাসমূহ সহ সকল প্রকার মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে নিয়োগ করাও অনুমোদিত। সুতরাং, বিভিন্ন স্তরের ট্রাইবুনাল গঠন করা অনুমোদিত এবং অতীতে মুসলিমদের এই ধরনের ট্রাইবুনাল ছিল।

আল মাওয়ারদী তাঁর *আল আহ্কাম আল সুলতানিয়্যাহ্* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে: ‘আবু আবদুল্লাহ আল যুবায়ের বলেছেন, “কিছুকাল যাবত এখানে বসরার আমীরগণ কেন্দ্রীয় মসজিদে (*আল মাসজিদ আল-জামী’*) একজন বিচারক নিয়োগ করতেন, তারা তাকে মসজিদের বিচারক বলে অভিহিত করতেন। তিনি (উক্ত বিচারক) সাধারণতঃ বিশ দিনার বা দুইশ’ দিরহামের অনুর্দ্ধ পরিমাণ অর্থ সম্পর্কিত বিবাদগুলো মীমাংসা করতেন; এবং ভরণপোষণ আরোপ করতেন (অর্থাৎ, ভরণপোষণ সম্পর্কিত মামলাগুলো পরিচালনা করতেন)। তিনি তার জন্য নির্ধারিত ঐ স্থানের বাইরে যেতেন না কিংবা, তার জন্য বেঁধে দেয়া সীমা অতিক্রম করতেন না।”

আল্লাহ্’র রাসূল (সাঃ) তাঁর পক্ষ থেকে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ করতেন। যেমন: তিনি (সাঃ) আমর ইবনুল আস’কে (রা.) একটি এলাকার মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দেন; এবং তিনি (সাঃ) ’আলী ইবন আবি তালিব’কে যে কোন ধরনের মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে ইয়েমেনের বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করেন। এ সমস্ত ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, সাধারণ কিংবা বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন আদালত, এদু’টোই শারী’আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত।

ইসলামী বিচারব্যবস্থায় আপীল বা খারিজের জন্য কোন আদালত নেই। সুতরাং, একটি মামলার ক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়া অভিন্ন হবে এবং একই হবে। যদি কোন বিচারক কোন রায় প্রদান করেন, তবে তা কার্যকর করা বাধ্যতামূলক হবে; এবং কোন অবস্থাতেই অন্য কোন বিচারকের এ রায় পরিবর্তন করার কোন এখতিয়ার থাকবে না। কারণ, শারী’আহ্ মূলনীতি অনুযায়ী: “একই বিষয়ের উপর কৃত একটি *ইজতিহাদ* আরেকটি *ইজতিহাদ’*কে বাতিল করে না।” সুতরাং, একজন *মুজতাহিদের* বিপক্ষে আরেকজন *মুজতাহিদ* প্রামাণ্য দলিল নন। সুতরাং, একটি আদালতের রায়কে খারিজ করে দিতে পারে এইরকম একটি আদালতের অস্তিত্ব অবৈধ।

তবে, যদি কোন বিচারক বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে শারী’আহ্ পরিত্যাগ করেন এবং কুফর আইন দিয়ে বিচার করেন; কিংবা, তার অনুসৃত আইন যদি আল্লাহ্’র কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ্ এবং সাহাবীদের ইজমা’র সাথে সাংঘর্ষিক হয় কিংবা, যদি তিনি এমন কোন রায় দেন যা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়, যেমন: তিনি কাউকে খুনী সাব্যস্ত করার পর যদি প্রকৃত খুনী উপস্থিত হয় – তবে, এ সকল ক্ষেত্রে বিচারের রায় পরিবর্তন করা যেতে পারে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

‘যদি কেউ আমাদের দ্বীনের (ইসলামের) ভেতর এমন কোন কিছু উদ্ভাবন করে যা আসলে ইসলাম থেকে নয়, তবে তা প্রত্যাখাত।’ এ হাদীসটি আয়শা (রা.) এর সূত্রে সহীহ্ আল বুখারী *[হাদীস নং-২৬৯৭]* ও সহীহ্ মুসলিমে *[হাদীস নং-১৭১৮]* বর্ণিত আছে।

জাবির বিন আবদুল্লাহ’র সূত্রে বর্ণিত আছে যে: “এক ব্যক্তি এক মহিলার সাথে যিনাহ্ করলে রাসূল (সাঃ) তাকে চাবুক মারার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে যখন তিনি জানলেন যে, লোকটি বিবাহিত, তখন তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন।” এছাড়া, মালিক বিন আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: “আমি উসমান (রা.) সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, তাঁর কাছে একজন (যিনাহকারী) মহিলাকে আনা হল যে ছয়মাস পরে একটি সন্তান প্রসব করেছে। উসমান মহিলাটিকে পাথর মারার নির্দেশ দিলেন। আলী (রা.) তাঁকে বললেন, ‘মহিলাটিকে পাথর মারা বৈধ হবে না, কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,

‘*তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও দুগ্ধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস।’* **[সূরা আল আহকাফ : ১৫]**

এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আরও বলেন,

‘*আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু’বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়।’* **[সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৩৩]**

সুতরাং, তাকে (এখন) পাথর মারা বৈধ হবে না। একথা শুনে উসমান (রা.) উক্ত মহিলাটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু, দেখা গেল যে, ততক্ষণে পাথর নিক্ষেপ হয়ে গেছে।” আব্দুর রাজ্জাক, ইমাম ছাওরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে: “যদি কোন বিচারক আল্লাহ্’র কিতাব কিংবা, রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ অথবা, সাহাবীদের ঐক্যমত আছে এমন কোন বিষয়ের বিপরীত কোন রায় প্রদান করে, তবে অন্য বিচারক চাইলে সে রায় পরিবর্তন করতে পারবেন।”

তবে, বিচারের রায় পরিবর্তনের দায়িত্ব আসলে মাযালিমের বিচারকের।

মুহ্তাসিব

মুহ্তাসিব হচ্ছেন সেই বিচারক, যিনি সেই সমস্ত মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করেন যেগুলো জনসাধারণের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত এবং যে সকল মামলার কোন বাদী বা ফরিয়াদী নেই, যদি না এ মামলাগুলো পেনাল কোড (হুদুদ) এবং ফৌজদারী আইন (Criminal laws) এর অন্তর্ভূক্ত হয়।

এটাই হচ্ছে হিসবাহ্'র বিচারকের সংজ্ঞা, যা কিনা রাসূল (সাঃ) এর খাবারের স্তুপ সম্পর্কিত হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে। রাসূল (সাঃ) খাবারের স্তুপের ভেতর হাত দিয়ে স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থা দেখতে পেলেন। তখন, তিনি (সাঃ) ভেজা খাবারগুলোকে উপরে রাখার নির্দেশ দিলেন যেন লোকেরা তা দেখতে পায়। সুতরাং, এটা ছিল জনস্বার্থ সম্পর্কিত একটি বিষয়, যে ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) তদারকী করেছিলেন; এবং ঠকবাজি বা প্রতারণামূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধ করার জন্য তিনি (সাঃ) ভেজা খাবারগুলোকে উপরে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ বিষয়টি জনগণের অধিকার বা স্বার্থসম্পর্কিত একই প্রকৃতির সকল বিষয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আর, পেনাল কোড (হুদুদ) এবং ফৌজদারী আইন (Criminal laws) এর অন্তর্ভূক্ত নয়, এগুলো এই প্রকৃতির (জনগণের অধিকার বা স্বার্থসম্পর্কিত) নয়, এগুলো জনগণের মধ্যকার বিবাদ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

মুহ্তাসিবের আবশ্যিক ক্ষমতা

কোন অপরাধ সংঘটিত হলে, সে বিষয়ে অবহিত হবার সাথে সাথে ঘটনাস্থলেই *মুহ্তাসিব* সে ব্যাপারে রায় প্রদান করতে পারেন; এবং এ রায় প্রদান অপরাধ সংঘটিত হবার স্থানে কিংবা, যে কোন স্থানে হতে পারে; এজন্য তার কোন আদালতের প্রয়োজন নেই। মুহ্তাসিবের নির্দেশ এবং (যে কোন স্থানে) রায় কার্যকর করার লক্ষ্যে তার অধীনে কিছু পুলিশ নিযুক্ত থাকবে।

তার অধীনস্থ মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য মুহ্তাসিবের কোন আদালতের প্রয়োজন নেই। যখনই তিনি নিশ্চিত হবেন যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তখনই তিনি এ ব্যাপারে রায় প্রদান করবেন; এবং তার যে কোন স্থানে এবং যে কোন সময়ে রায় প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে; সেটা হাট-বাজারে হোক, কিংবা, কোন গৃহে হোক, কিংবা, ভ্রমনরত অবস্থায় বা যানবাহনে থাকা অবস্থায় দিনে কিংবা রাতে যে অবস্থাতেই হোক না কেন। কারণ, যে সমস্ত দলিল-প্রমাণ আদালতের প্রয়োজনীয়তার অপরিহার্যতাকে প্রমাণ করে, তা মুহ্তাসিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যে হাদীসটি আদালতের অপরিহার্যতাকে প্রমাণ করে সেখানে বলা হয়েছেঃ

'বিবাদমান দু'পক্ষকে বিচারকের সামনে বসতে হবে।'

এবং রাসূল (সাঃ) আরও বলেছেন, **'যদি বিবাদমান দু'পক্ষ তোমার সামনে বসে...**।' এ শর্তটি *হিসবাহ্*'র বিচারকের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ, তার এখতিয়ারভূক্ত মামলাসমূহে কোন বাদী বা বিবাদী নেই; বরং, এটা জনগণের অধিকার যা ক্ষুন্ন করা হয়েছে, অথবা, এ বিষয়ে শারী'আহ্ আইন লঙ্ঘিত হয়েছে।

এছাড়া, রাসূল (সাঃ) যখন খাবারের স্তুপের বিষয়টি তদারকী করছিলেন, সে সময় তিনি (সাঃ) বাজারের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলেন এবং খাবারগুলো বিক্রির জন্য সাজানো ছিল। রাসূল (সাঃ) উক্ত বিক্রেতাকে তাঁর কাছে উপস্থিত হবার নির্দেশ দেননি; বরং, তিনি (সাঃ) অপরাধটি শনাক্ত করার সাথে সাথে ঐ স্থানেই এ বিষয়ে রায় দিয়েছেন। এটিই প্রমাণ করে যে, রায় প্রদানের জন্য *হিসবাহ্*'র বিচারকের আদালতের প্রয়োজন নেই।

এছাড়া, মুহ্তাসিবের তার নিজের জন্য ডেপুটি নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে। তবে, তাদেরকে অবশ্যই *মুহ্তাসিব* পদের সকল শর্ত পূরণ করতে হবে। এছাড়া, তিনি তার ডেপুটিদের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করতে পারেন। এসব ডেপুটি বা সহকারীগণ তাদের জন্য নির্ধারিত অঞ্চলে এবং তাদেরকে যে সমস্ত বিষয় তদারকী করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে মুহ্তাসিবের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

অবশ্য এটা নির্ভর করবে, মুহ্তাসিবের নিয়োগপত্রে তাকে ডেপুটি নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা বা না করার উপর। যদি, এ বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করে তার নিয়োগপত্রে কোন অনুচ্ছেদ অন্তর্ভূক্ত থাকে, শুধুমাত্র তখনই তিনি তার নিজের জন্য সহকারী নিয়োগ করতে পারবেন। আর, যদি তাকে এ ব্যাপারে কোন ক্ষমতা দেয়া না হয়, তবে নিজের জন্য কোন সহকারী নিয়োগ করার অধিকার তার থাকবে না।

মাযালিমের বিচারক

মাযালিমের বিচারক হলেন এমন একজন বিচারক যাকে রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কৃত সকল প্রকার *মাযলিমা*'র (অন্যায় আচরণ) মীমাংসা করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়; সে ব্যক্তি হতে পারে রাষ্ট্রের কোন সাধারণ নাগরিক কিংবা, হতে পারে রাষ্ট্রের শাসন-কর্তৃত্বের নীচে বসবাসরত কেউ; এবং এ অন্যায় আচরণ (*মাযলিমা*) খলীফা কিংবা, তার অধীনে কর্মরত কেউ কিংবা, কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত হতে পারে।

এটাই হল মাযালিমের বিচারকের সংজ্ঞা। মাযালিমের বিচারকের উৎস হিসাবে রাসূল (সাঃ) এর হাদীসকে উল্লেখ করা হয়, যেখানে তিনি (সাঃ) জনগণের উপর শাসন পরিচালনা কালে শাসক কর্তৃক নাগরিকদের উপর কৃত অন্যায় আচরণকে *মাযলিমা* বলে অভিহিত করেছেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে:

'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সময়ে একবার মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। তখন তা তাঁরা (সাহাবীরা) তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহ্'র রাসূল, আপনি কেন দাম নির্ধারণ করে দিচ্ছেন না?' তখন তিনি (সাঃ) বললেন, 'অবশ্যই আল্লাহ্ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, সব বিষয়ের অধিকর্তা, সম্পদ বৃদ্ধিকারী, রিযিকদাতা এবং মূল্য নির্ধারণকারী, এবং আমি আশা করি যে, আমি এ অবস্থায় আল্লাহ্'র সাথে সাক্ষাৎ করবো যাতে কেউ আমার বিরুদ্ধে মাযালিমা'র অভিযোগ না আনতে পারে, হোক সেটা রক্ত সম্পর্কিতই হোক বা অর্থ সম্পর্কিত হোক।' এ হাদীসটি ইমাম আহমদ তার মুসনাদে উল্লেখ করেছেন *(মুসনাদে আহমদ খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৮৬)।* রাসূল (সাঃ) এক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ করে দেয়ার বিষয়টিকে *মাযালিমা* বা অন্যায় আচরণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ, তিনি যদি মূল্য নির্ধারণ করে দিতেন, তাহলে এক্ষেত্রে তিনি তাঁর এখতিয়ার বর্হিভূত কাজ করতেন।

এছাড়া, তিনি (সাঃ) রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত কোন বিষয়, যা জনস্বার্থ ক্ষুন্ন করে তাকেও *মাযলিমা* হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোন বিষয় পরিচালনার জন্য যদি কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠিত হয় এবং কোন ব্যক্তি যদি সে ব্যবস্থাকে তার স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করে, তবে তার বিষয়টি মাযালিমের বিচারক খতিয়ে দেখবেন। কারণ, এটি জনগণের স্বার্থরক্ষার নিমিত্তে রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা। যেমন এটা হতে পারে, গণমালিকানাধীন কোন জলাধারের বিষয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বসাধারণের কৃষিজমিতে সেচকার্য করা।

এ ব্যাপারে দলিল হল, রাসূল (সাঃ) এর সময় রাষ্ট্র কর্তৃক সেচকার্যের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মদিনার একজন আনসারীর অভিযোগ। রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাটি ছিল এরকম যে: যার জমির উপর দিয়ে জলধারা প্রথমে বয়ে যাবে সে প্রথমে সেচকাজ করবে, তারপর তার পরবর্তী জন করবে। আনসারী ঐ ব্যক্তিটি চাচ্ছিলেন যে, আল-যুবায়ের (রা.) (যার জমির উপর দিয়ে প্রথমে জলধারা বয়ে গিয়েছিল) নিজের জমিতে সেচকার্য করার পূর্বেই তার (উক্ত আনসারীর) জমিতে পানি প্রবাহিত হতে দেবেন। কিন্তু, আল-যুবায়ের তা প্রত্যাখান করেন এবং শেষপর্যন্ত বিষয়টি রাসূল (সাঃ) এর নিকট উত্থাপিত হয়। তিনি (সাঃ) বিষয়টি ফয়সালা করে দেন এবং যুবায়েরকে তার জমিতে হালকা ভাবে সেচকার্য করার পর তার প্রতিবেশী আনসারীকে পানি ছেড়ে দিতে বলেন (অর্থাৎ, প্রতিবেশীকে সাহায্যের নিদর্শন হিসাবে তিনি (সাঃ) আল-যুবায়েরকে তার প্রাপ্য পানি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করার পূর্বেই তা ছেড়ে দিতে বলেন)। কিন্তু, উক্ত আনসারী এ রায় প্রত্যাখান করে এবং আল-যুবায়েরের পূর্বে সে নিজ জমিতে সেচকার্য করার দাবি জানায়। তারপর সে রাসূল (সাঃ) বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, আল-যুবায়ের সম্পর্কে তার চাচাতো ভাই হবার কারণে তিনি (সাঃ) এ রায় দিয়েছেন (যা ছিল আল্লাহ্'র রাসূলের বিরুদ্ধে উত্থাপিত গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ; আল-বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে উক্ত আনসারীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়)।

ঘটনার এ পর্যায়ে, রাসূল (সাঃ) রায় দেন যে, যুবায়ের তার সেচকার্যের পূর্ণ অধিকার ভোগ করবে; অর্থাৎ, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার জমিতে সেচকার্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পানি তার দেয়ালের মূলে কিংবা গাছের মূল পর্যন্ত না পৌঁছায়। যাকে আলেমগণ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ততক্ষণ পর্যন্ত পানির উচ্চতা বাড়তে দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা মানুষের পা

ডুবিয়ে দেয়। এই সম্পূর্ণ হাদীসটি 'উরওয়া ইবন আল-যুবায়েরের বরাত দিয়ে সহীহ্ মুসলিমে *[হাদীস নং-২৩৫৭]* এভাবে বর্ণিত আছে যে:

"আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়ের তাকে বলেছেন যে, আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর সামনেই *সিরাজ আল-হাররাহ্* নিয়ে আল-যুবায়েরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়, যার দ্বারা তারা তাদের খেজুর বাগানে পানি দিত। উক্ত আনসারী (আল-যুবায়েরকে) পানি ছেড়ে দিতে বলে; কিন্তু, আল-যুবায়ের তা প্রত্যাখান করেন। তারা রাসূল (সাঃ) এর সামনেই বিবাদে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্'র রাসূল যুবায়েরকে বলেন: "হে যুবায়ের, তুমি প্রথমে সেচকাজ কর, তারপর তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দাও।" এতে উক্ত আনসারী খুব রাগান্বিত হয়ে যায় এবং বলে: "হে আল্লাহ্'র রাসূল, এরকম রায়ের কারণ হল সে আপনার চাচাতো ভাই।" তার একথা শুনে রাসূল (সাঃ) এর মুখের রঙ পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তারপর তিনি (সাঃ) বলেন: "হে যুবায়ের! তুমি সেচকাজ কর এবং ততক্ষণ পর্যন্ত পানি ধরে রাখো যতক্ষণ পর্যন্ত না তা দেয়ালের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছায়।" আল-যুবায়ের বলেন: "আল্লাহ্'র কসম, আমার মনে হয় এ বিষয়েই এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে: *"তোমার রবের কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনরকম সংকীর্ণতা না পায় এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেয়।"* [*সিরাজ আল-হাররাহ্* হল মদিনার *আল-হাররাহ্* অঞ্চলের একটি নদী। আবু উবাইদ বলেছেন যে, মদিনাতে দু'টি নদী ছিল, যাতে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হত এবং মদিনার লোকেরা এ নদীগুলোর ব্যাপারে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতো। এজন্য রাসূল (সাঃ) সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রথম ব্যক্তি প্রথমে সেচকাজ করবে; যার অর্থ হল, নদীর শুরুর দিকে যার জমি রয়েছে সে প্রথমে সেচকাজ করবে এবং তারপর সে পানিকে পরবর্তী জমিতে প্রবাহিত হতে দেবে এবং ব্যাপারটি এভাবে চলতে থাকবে]।

সুতরাং, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাসক বা রাষ্ট্রের কোন প্রতিষ্ঠান বা নির্দেশের কারণে যদি কোন অন্যায় আচরণ ঘটে থাকে, তবে এ বিষয়টিকে *মাযলিমা* হিসাবে বিবেচনা করা হবে, যা কিনা উপরোল্লিখিত দু'টি হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে এ বিষয়সমূহ ফয়সালার জন্য খলীফার কাছে ন্যস্ত করা হবে কিংবা, তিনি মাযালিমের বিচারক হিসাবে তার পক্ষ থেকে যাকে নিয়োগ করবেন তার নিকট উপস্থাপন করা হবে।

মাযালিমের বিচারক নিয়োগ ও অপসারণ

মাযালিমের বিচারক খলীফা বা প্রধান বিচারপতি (*কাজী আল কুদাহ্*) কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। এর কারণ হল, *মাযালিম* বিচারব্যবস্থার একটি অংশ, যার মাধ্যমে শারী'আহ্ আইন কার্যকর করার নিমিত্তে রায় প্রদান করা হয় এবং সকল ধরনের বিচারককে অবশ্যই খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হতে হয়। এছাড়া, রাসূল (সাঃ) এর সীরাত থেকেও এটি প্রমাণিত যে, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) নিজেই বিচারকদের নিয়োগ দিতেন। এ সবকিছুই প্রমাণ করে যে, খলীফাই মাযালিমের বিচারক নিয়োগ করবেন। তবে, প্রধান বিচারপতিও মাযালিমের বিচারক নিয়োগ করতে পারেন, যদি খলীফা তার নিয়োগপত্রে তাকে এ বিষয়ে ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি অনুচ্ছেদ আকারে যুক্ত করেন। এটি অনুমোদিত যে, রাষ্ট্রের কেন্দ্রে থাকা মাযালিমের প্রধান আদালত (*মাহকামাতুল মাযালিম*) শুধুমাত্র খলীফা, তার সহকারীবৃন্দ এবং প্রধান বিচারপতির পক্ষ থেকে সংঘটিত অন্যায় আচরণের বিষয়ে তদন্ত করবে; অন্যদিকে, বিভিন্ন প্রদেশে *(উলাই'য়াহ্)* অবস্থিত *মাযালিম* আদালতের শাখাসমূহ ওয়ালী বা রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত *মাযলিমা* তদন্ত করবে। খলীফা ইচ্ছা করলে মাযালিমের প্রধান আদালতকে বিভিন্ন উলাই'য়াহ্তে অবস্থিত মাযালিমের শাখা আদালত সমূহের বিচারক নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন।

তবে, খলীফাই হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাষ্ট্রের কেন্দ্রে অবস্থিত মাহকামাতুল মাযালিমের সদস্যদের নিয়োগ ও অপসারণ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। তবে, মাহকামাতুল মাযালিমের প্রধান বিচারককে অপসারণের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, যদিও তিনিই খলীফার অপসারণ সম্পর্কিত বিষয়ে তদন্ত করবেন, তারপরেও নীতিগতভাবে খলীফারই রয়েছে তাকে অপসারণের ক্ষমতা। এর কারণ হল, খলীফাই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার তাকে নিযুক্ত করার ক্ষমতা রয়েছে, ঠিক যেভাবে তিনি অন্যান্য বিচারকদের নিযুক্ত করে থাকেন। তবে, খলীফার বিরুদ্ধে কোন তদন্ত চলাকালে যদি তাকে মাযালিমের প্রধান বিচারককে অপসারণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়, তবে প্রদত্ত এ ক্ষমতা তাকে হারামের দিকে পরিচালিত করতে পারে। এজন্য, এ ধরনের পরিস্থিতিতে শারী'আহ্ মূলনীতি: "যা কিছু হারামের দিকে ধাবিত করে, তা নিজেই হারাম" এটি প্রযোজ্য হবে। যেহেতু এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু এক্ষেত্রে শারী'আহ্ এ মূলনীতিটি প্রযোজ্য হবে।

এই ধরনের পরিস্থিতি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, যখন খলীফা কিংবা, তার সহকারীবৃন্দ অথবা, তার প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে কোন তদন্ত বা মামলা চলতে থাকবে। এর কারণ হল, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যদি খলীফাকে মাযালিমের প্রধান বিচারককে অপসারণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়, তবে তা বিচারের রায়কে প্রভাবিত করতে পারে; এবং স্বাভাবিকভাবেই এ পরিস্থিতি, প্রয়োজনের খাতিরে উক্ত বিচারকের খলীফা বা, তার সহকারীবৃন্দ কিংবা, প্রধান বিচারককে অপসারণ করার ক্ষমতাকে সংকুচিত করবে। এক্ষেত্রে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে খলীফার হাতে উক্ত বিচারককে অপসারণ করার প্রদত্ত ক্ষমতা হারাম কার্য সম্পাদনের একটি উপায় বা পন্থা; অর্থাৎ, এ পরিস্থিতিতে খলীফার হাতে এ ক্ষমতা প্রদান করা শারী'আহ্ দৃষ্টিকোন থেকে হারাম বা নিষিদ্ধ।

এছাড়া অন্য সবক্ষেত্রে, বিধানটি একই রকম থাকবে। অর্থাৎ, মাযালিমের বিচারককে অপসারণ করার ক্ষমতা খলীফার হাতেই ন্যস্ত থাকবে, যেভাবে তার উক্ত বিচারককে নিয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে।

মাযালিমের বিচারকের আবশ্যিক ক্ষমতা

মাযালিম আদালতের অন্যায় আচরণ (*মাযলিমা*) সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে তদন্ত করার আবশ্যিক ক্ষমতা রয়েছে; সে অন্যায় আচরণ সরকারী কোন কর্মচারীর দ্বারা সংঘটিত হোক; কিংবা, খলীফার কাজের সাথে শারী'আহ্'র দ্বন্দ বিষয়ক হোক; কিংবা, সংবিধানের আইনী ব্যাখ্যা বিষয়ক হোক; কিংবা, খলীফা কর্তৃক গৃহীত আইনকানুন বা বিভিন্ন প্রকারের শারী'আহ্ বিধিবিধান যেমনঃ জনগণের উপর করধার্য করা বা অন্যকোন বিষয় সম্পর্কিত হোক।

মাযালিম আদালত যে কোন ধরনের অন্যায় আচরণ, তা কোন সরকারী কর্মচারীর সাথে সম্পর্কিত হোক, খলীফার দ্বারা শারী'আহ্ আইন লঙ্ঘনের বিষয়ে হোক, সংবিধান, আইনী দলিল বা খলীফা কর্তৃক জারিকৃত কোন আইনকানুনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত হোক, জনগণের উপর করধার্যের বিষয়ে হোক; কিংবা, রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক জনগণের উপর কৃত জুলুম-নির্যাতন বিষয়ক হোক, যেমনঃ রাষ্ট্র কর্তৃক জোরপূর্বক জনগণের সম্পদ দখল করা বা, তাদের নিকট হতে সম্পদ সংগ্রহ কালে শারী'আহ্ নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা; কিংবা, সরকারী কর্মচারী বা সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেতনভাতা কমিয়ে দেয়া বা বেতন প্রদানে বিলম্বিত করা ইত্যাদি বিষয়ক হোকঃ এ সকল বিষয়ের তদন্ত করার জন্য কোন ব্যক্তির বিচারকের সম্মুখে উপস্থিতি, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমনজারী বা, কোন ফরিয়াদীর প্রয়োজন নেই। বরং, এটা হল এ সকল বিষয়ে *মাযালিম* আদালতের তদন্ত করার আবশ্যিক ক্ষমতা, এমনকি এ সব বিষয়ে যদি কেউ কোন অভিযোগ দায়ের না করে তবুও।

এর কারণ হল, যে সমস্ত শারী'আহ্ দলিল-প্রমাণ বিচারকার্য চলাকালে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিতিকে শর্ত হিসাবে আরোপ করে, সেগুলো *মাযালিম* আদালতের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ, এ সকল মামলার কোন ফরিয়াদী নেই, তাই ফরিয়াদীর আদালতে উপস্থিতি শর্ত হিসাবে বিবেচ্য নয়। বস্তুতঃ কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে কোন অভিযোগ দায়ের না করলেও *মাযালিম* আদালতের কোন *মাযলিমা* (অন্যায় আচরণ) তদন্ত করার অধিকার রয়েছে; এ কারণে বাদীর আদালতে হাজির হবার কোন প্রয়োজন নেই। একইসাথে, বিবাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি ব্যতীতই এ আদালত এ সকল মামলার তদন্ত করতে পারে। সুতরাং, আদালতের প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্য প্রমাণিত করে এমন শারী'আহ্ দলিল এক্ষেত্রে বিবেচিত হবে না। আদালতের প্রয়োজনীতাকে অপরিহার্য করে এ রকম দলিলসমূহ হলঃ আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়েরের বরাত দিয়ে আবু দাউদ ও আহমাদ বর্ণিত হাদীসটি, যেখানে তিনি বলেছেনঃ "আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, **"বিবাদমান দু'পক্ষ যেন বিচারকের সামনে বসে।"** এবং আলী (রা.) এর প্রতি রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশঃ **"যদি বিবাদমান দু'পক্ষ তোমার সামনে উপস্থিত হয়...।"**

সুতরাং, মাযালিমের বিচারক এ ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন যে, কোন *মাযলিমা* সংঘটিত হলে যে কোন স্থানে, যে কোন সময় কিংবা, কোন আদালত ব্যতীতই এ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারেন। বস্তুতঃ এ আদালতের আবশ্যিক ক্ষমতা এবং এর অবস্থানগত মর্যাদার ভিত্তিতে, অতীতে সবসময়ই এটি উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ও আড়ম্বরপূর্ণতা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। মিশর ও আল-শামে সুলতানদের শাসনামলে, সুলতানদের কাউন্সিল যা কিনা *মাযলিমা* সংক্রান্ত বিষয়সমূহ দেখাশুনা করতো, তা 'ন্যায়বিচারের গৃহ' (House of Justice) নামে পরিচিত ছিল; যেখানে সুলতান তার পক্ষ থেকে সহকারী নিয়োগ করতেন এবং সেইসাথে, বিচারক ও ফকীহ্‌গণও সেখানে উপস্থিত থাকতেন। আল মাকরিজী তার *"আল-সুলুক ইলা মা'রিফাত দুওয়াল আল-মুলক"* (The Way to Know the States of the Kings) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সুলতান আল-মালিক আল-সালিহ্ আইয়ুব *হাউস অব জাস্টিস*-এ তার পক্ষ থেকে ডেপুটি নিয়োগ করতেন; যেখানে তারা সাক্ষী, বিচারক এবং *ফকীহ্*'দের উপস্থিতিতে সকল প্রকার অন্যায় আচরণ দূরীভূত করার লক্ষ্যে কাজ করতেন। সুতরাং,

মাযালিমের আদালতের জন্য চমৎকার ও আকর্ষণীয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ভবন নির্মাণে কোন ক্ষতি নেই; কারণ, এটি *মুবাহ্* (অনুমোদিত) কাজের অন্তর্ভূক্ত; বিশেষ করে এ রকম একটি ভবনের মাধ্যমে যদি বিচারব্যবস্থার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিফলিত হয়।

খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেকার চুক্তি, লেনদেন ও বিচারিক রায়

খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ও লেনদেন, সেইসাথে এ সংক্রান্ত আদালতের রায় যা ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ও খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই *কার্যকর* হয়েছে, তা খিলাফতের অধীনে বৈধ বলে বিবেচিত হবে। খিলাফতের বিচার বিভাগ এ মামলাগুলো পূণরায় তদন্ত করবে না, বা এগুলোকে পূণরায় নিষ্পত্তি করবে না। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পর এগুলোর ব্যাপারে আর নতুন কোন মামলা গৃহীত হবে না।

তবে, দু'টি বিষয় এর বাইরে থাকবে:

১) খিলাফতের পূর্বে যে মামলাটি নিষ্পন্ন হয়েছে এবং কার্যকরী হয়েছে যদি এর ধারাবাহিকতা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পরও রয়ে যায় এবং তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

২) যদি মামলাটি এমন কারও সাথে সম্পর্কিত হয়, যার কারণে ইসলাম ও মুসলিম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উপরোক্ত দু'টি বিষয় ব্যতীত, খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেকার নিষ্পত্তিকৃত চুক্তি, লেনদেন এবং মামলাসমূহ, যে সংক্রান্ত রায় খিলাফতের পূবেই কার্যকরী হয়েছে, তা পূণরায় নিষ্পত্তি না করা বা এ সংক্রান্ত মামলা নতুন করে গৃহীত না হবার দলিল হিসাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে গৃহ থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন, মক্কাবিজয়ের পর তিনি আর সে গৃহে ফিরে যাননি। কুরাইশদের আইন অনুসারে, উকাইদ ইবন আবি তালিব তার সে সব আত্মীয়-স্বজনের গৃহসমূহ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং হিজরত করেছিল।

উত্তরাধিকার সূত্রে এ গৃহসমূহের মালিকানা লাভ করার পর উকাইদ এগুলো অধিগ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে বিক্রি করে দেয়, যার মধ্যে রাসূল (সাঃ) এর গৃহও অন্তর্ভূক্ত ছিল। মক্কাবিজয়ের পর রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলঃ "আপনি কোন গৃহে অবস্থান করতে চাচ্ছেন?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, **"উকাইদ কি আমাদের কোন গৃহ ছেড়ে দিয়েছে?"** *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৩০৫৮*) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বললেন: **"উকাইদ কি আমাদের জন্য কোন গৃহ ছেড়ে দিয়েছে?"** তখন তাঁকে বলা হল যে, উকাইদ রাসূল (সাঃ) এর বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে, কিন্তু রাসূল (সাঃ) তা বাতিল বলে ঘোষণা করলেন না। এই হাদীসটি উসামা বিন যায়িদের সূত্রে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (উসামা (রা.)) বলেছেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্'র রাসূল! আগামীকাল আপনি কোথায় থাকতে চান?" তখন রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, **"উকাইল কি আমাদের কোন বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে?"** *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৩০৫৮)*

এছাড়া, আরও বর্ণিত আছে যে, আবু আল-'আস ইবন আল-রাবী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় হিজরত করেন। কিন্তু, এর পূর্বে তার স্ত্রী যয়নাব ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বদরের যুদ্ধের পর মদিনায় হিজরত করেন, তখনও তিনি (ইবন আল-রাবী) মুশরিক অবস্থায় মক্কায় ছিলেন। (মুসলিম হবার পর) রাসূল (সাঃ) বিবাহ্চুক্তি নবায়ন না করেই তার স্ত্রী'কে তার নিকট ফেরত দেন। এটা ছিল অন্ধকার যুগে সম্পাদিত বিবাহ্চুক্তির স্বীকৃতি প্রদান। এছাড়া, ইবন আব্বাসের সূত্রে ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন যে:

"রাসূল (সাঃ) দুই বছর পর তাঁর কন্যাকে অর্থাৎ, যয়নাবকে প্রথম বিবাহের চুক্তির উপর ভিত্তি করেই আবু আল-'আস ইবন আল-রাবী কাছে ফেরত পাঠান।" *(সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-১১৪২)*

এছাড়া, খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বের যেসব লেনদেন ও মামলার ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ধারাবাহিক প্রভাব বিদ্যমান থাকে, সেসব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেগুলোকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন: ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে আসার পর মক্কার লোকদের উপর ইবন আব্বাসের ঋণের যে সুদ ছিল, তিনি (সাঃ) তা বাতিল বলে ঘোষণা করেন এবং লোকেরা শুধু প্রকৃত ঋণ ফেরত দেয়। এর অর্থ হচ্ছে, দার-উল-ইসলামে তাদের উপর আরোপিত সুদ বাতিল বলে গণ্য হয়েছিল। সূলাইমান ইবন আমরু তার পিতা হতে এবং আবু দাউদ সুলাইমান হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সুলাইমানের পিতা) বলেছেন যে:

'আমি বিদায়হজ্জের দিন আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যেঃ

"সাবধান! অন্ধকার যুগের (জাহিলিয়াতের) সমস্ত সুদ বাতিল করা হয়েছে। তোমরা কেবলমাত্র আসল অর্থের দাবি করতে পারবে। তোমরা একে অন্যের উপর জুলুম করো না এবং জুলুমের শিকার হয়ো না।"

এছাড়া, জাহিলিয়াতের সময় যাদের চারের অধিক স্ত্রী ছিল, দার-উল-ইসলামে তাদেরকে শুধুমাত্র চারজন স্ত্রী রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, ঘাইলান ইবনে সালামাহ্ ইবনে ছাকাফি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার দশজন স্ত্রী ছিল যারা তার সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে স্ত্রীদের মধ্য হতে চারজনকে পছন্দ করার নির্দেশ দেন।"

সুতরাং, সেইসব চুক্তি, যার ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ধারাবাহিক প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে, এই ধরনের প্রভাব অবশ্যই দূরীভূত করতে হবে। এই প্রভাব দূর করা আবশ্যকীয় বলে বিবেচিত হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি কোন মুসলিম নারী খিলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্বে কোন খ্রিষ্টান পুরুষকে বিয়ে করে, তাহলে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে শারী'আহ্ নিয়ম অনুযায়ী সে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

আর, যাদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করার ব্যাপারে বলা যায় যে, এটা অনুমোদিত এ কারণে যে, মক্কাবিজয়ের পর আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) ক্ষমা ঘোষণার সাথে সাথে কিছু কিছু কাফের ব্যক্তিদের রক্তপাতের ঘোষণা দেন; কারণ, তারা সবসময় ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতিসাধনে ব্যস্ত ছিল। এমনকি যদি তারা কাবার চাদর ধরে ঝুলে থাকে তবুও তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। যদিও এর পূর্বে তিনি (সাঃ) এ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, **"ইসলাম তার পূর্বের সবকিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়"**, যে হাদীসটি আমর ইবনুল 'আস (রা.) এর সূত্রে আহমাদ ও তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ হল, যারা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা এ হাদীসের বর্হিভূত বলে বিবেচিত হবে।

তবে, যেহেতু রাসূল (সাঃ) পরবর্তীতে এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যেমন, তিনি (সাঃ) ইকরামা ইবন আবু জাহলকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এজন্য খলীফা চাইলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন; কিংবা, তাদেরকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

উপরোল্লিখিত বিষয় দু'টি বাদে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে নিষ্পত্তিকৃত সকল চুক্তি ও লেনদেন এবং এ সংক্রান্ত মামলার রায় বাতিল বলে গণ্য করা হবে না; বা, পূণরায় নিষ্পত্তি করা হবে না, যদি সেগুলো খিলাফতের পূর্বেই নিষ্পত্তি ও কার্যকরী হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি স্কুলের দরজা ভাঙ্গার দায়ে দু'বছরের কারাদন্ড প্রাপ্ত হয় এবং খিলাফত প্রতির্ষ্ঠিত হবার পূর্বেই সে তার সাজার মেয়াদ শেষ করে এবং জেল থেকে বেরিয়ে যায়; এরপর, খিলাফত প্রতির্ষ্ঠিত হবার পর যদি সে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা শুরু করতে চায়, কারণ, তার দৃষ্টিতে তার উপর অন্যায় করা হয়েছে, তবে এ বিষয়ে কোন মামলা গৃহীত হবে না। কারণ, ঘটনাটি ঘটে গেছে এবং এ ব্যাপারে রায় প্রদান করা হয়েছে এবং সাজার মেয়াদ খিলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্বেই শেষ হয়েছে। এ ধরনের বিষয়সমূহ পুরস্কারের আশায় আল্লাহ্'র তা'আলার কাছে পেশ করতে হবে।

কিন্তু, যদি এমন হয় যে, উক্ত ব্যক্তিকে এ অভিযোগে দশ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়েছে এবং দশ বছরের মধ্যে সে দু'বছর সাজা ভোগ করেছে এবং এর মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন এক্ষেত্রে খলীফার বিষয়টি পুনঃতদন্ত করার এখতিয়ার রয়েছে; হয় তিনি শাস্তির এ রায় বাতিল করে এবং তাকে অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দিয়ে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে পারেন; কিংবা, যে শাস্তি সে ইতিমধ্যে ভোগ করেছে তা যথেষ্ট মনে করে তাকে মুক্ত করতে পারেন। আবার এমনও হতে পারে যে, তিনি জনস্বার্থ ও এ সংশ্লিষ্ট শারী'আহ্ আইন বিবেচনায় রেখে, বিশেষ করে এ বিষয়টি যদি জনস্বার্থের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে তিনি শাস্তির বাকী সময়টুকু পূণর্বিবেচনা করতে পারেন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা (জনকল্যাণ বিভাগ, Administrative System)

রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনগণের স্বার্থসংক্রান্ত কার্যাবলী বিভিন্ন অফিস, বিভাগ এবং প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় – যাদের কাজ হল জনগণের স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়াবলী ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। প্রত্যেক অফিসের (মাসলাহা) প্রধান হিসেবে একজন মহাব্যবস্থাপক, প্রত্যেক বিভাগ (দায়রাহ্) ও প্রশাসনের (ইদারা) প্রধান হিসেবে একজন পরিচালক এর পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন। এই পরিচালকগণ পেশাগতভাবে তাদের অফিস, বিভাগ ও প্রশাসনের মহাপরিচালকের কাছে এবং আইন ও সাধারণ নিয়মনীতি পালনের ক্ষেত্রে ওয়ালী বা আমীলের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাধারণত প্রশাসন পরিচালনা ও জনগণের বিষয়াদি দেখভাল করতেন এবং প্রশাসনে কর্মরত সচিবদেরও তিনি (সাঃ) নিয়োগ দিতেন। এভাবেই, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনার লোকদের দেখাশোনার দায়িত্ব নেন, তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেন, তাদের মধ্যকার বিভিন্ন সম্পর্ক নির্ধারণ করেন, তাদের সকল প্রয়োজন নিশ্চিত করেন এবং তাদের জন্য যথোপযুক্ত বিষয়ে নির্দেশনা দিতেন। এসবই ছিল প্রশাসনিক বিষয় যা তাদের জীবনের বিভিন্ন জটিলতা বা সমস্যা দূর করে জীবনকে করেছিল সহজ।

শিক্ষাক্ষেত্রে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দশজন মুসলিম শিশুকে শিক্ষা দেওয়াকে কাফের বন্দীদের জন্য মুক্তিপণ হিসেবে ধার্য করেছিলেন, যেখানে মুক্তিপণ গণীমতের মালের বিনিময়ে দেয়া হত যা মুসলিমদের সম্পদ হিসাবে গণ্য হত। এভাবেই তিনি (সাঃ) মুসলিমদের শিক্ষা লাভের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছিলেন।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য তিনি (সাঃ) তাঁর নিজের জন্য উপহার হিসেবে প্রাপ্ত একজন ডাক্তারকে মুসলিমদের সেবার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। বস্তুতঃ রাসূল (সাঃ) তাঁর নিজের জন্য প্রাপ্ত উপহারটি নিজে ব্যবহার না করে কিংবা নিজে গ্রহণ না করে জনসেবার জন্য নিয়োজিত করার ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বাস্থ্যসেবা মুসলিমদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি কাজ।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে ভিক্ষা করার বদলে আগে একটি জামা ও পরে একটি কুঠার ক্রয় করার নির্দেশ দিলেন। তারপর সেই কুঠার দিয়ে বন থেকে কাঠ কেটে তিনি (সাঃ) তাকে বাজারে বিক্রির নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ, ভিক্ষার ক্ষেত্রে ভিক্ষুককে কেউ ভিক্ষা দিতেও পারে আবার প্রত্যাখানও করতে পারে। এভাবে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক লোকটির কর্মসংস্থানের ঘটনা প্রমাণ করে যে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও মুসলিমদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি কাজ। তিরমিযী সমর্থিত আহমাদ বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে,

'আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি নবী (সাঃ) এর কাছে আসলো এবং তাঁর কাছে সাদাকা চাইলো। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ঘরে কি কিছুই নেই?' লোকটি বললো,'আছে।' তিনি (সাঃ) বললেন, 'ওগুলো আমার কাছে নিয়ে আসো।' লোকটি রাসূল (সাঃ) এর কথা অনুসারে কাজ করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এগুলো হাতে নিয়ে বললেন, 'এ দু'টিকে কে খরিদ করবে?' একজন লোক বললো, 'দুই দিরহামের বিনিময়ে আমি এগুলো ক্রয় করতে চাই।' তিনি (সাঃ) জিনিসগুলো তাকে দিলেন এবং বিনিময়ে দিরহাম দু'খানা নিলেন এবং দিরহাম দুটো আনসারীকে দিয়ে বললেন, 'একটি দিরহাম পরিবারের জন্য খরচ কর এবং আরেকটি দিয়ে কুঠার খরিদ করে আমার কাছে নিয়ে এস।' লোকটি তাই করল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বললেন, 'যাও কুঠার দিয়ে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ কর ও বিক্রয় কর; আর পনের দিনের আগে আমার সাথে দেখা করো না।' লোকটি এ কথা মেনে নিল এবং পরবর্তীতে দশ দিরহাম নিয়ে ফেরত এল।' *(সূনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-১৬৪১)*

আল বুখারী থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

'মানুষের কাছে ভিক্ষা করার চাইতে তোমাদের জন্য একটি রশি দিয়ে জ্বালানী কাঠ বেঁধে পিঠে বয়ে নিয়ে বাজারে বিক্রি করে তার মুখ (সম্মান) রক্ষা করা শ্রেয়তর; কারণ মানুষ তাকে ভিক্ষা দিতেও পারে আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারে।' *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-২০৭৫)*

রাস্তাঘাট নির্মাণের ক্ষেত্রে, রাসূল (সাঃ) তাঁর সময়ে বিবাদের আশঙ্কার ক্ষেত্রে রাস্তার প্রশস্ততা সাত হাত করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবু হুরাইরার সূত্রে আল বুখারী বর্ণনা করেছেন যে,

‘বিবাদের আশঙ্কার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সিদ্ধান্ত ছিল রাস্তার প্রশস্ততা হবে সাত হাত।’ *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং- ২৪৭৩)*

আর মুসলিমে বর্ণিত

‘যদি রাস্তার ব্যাপারে বিবাদ হয় তাহলে তোমরা এর প্রশস্ততা সাত হাত করো।’

তখনকার প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। শাফীঈ’র মতানুযায়ী, প্রয়োজনে রাস্তার প্রশস্ততা এর থেকে বেশী করাও অনুমোদিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাস্তার উপর দখল প্রতিষ্ঠা বা আগ্রাসন থেকে নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাবারানী (আল জামী’) আল সগীরে বর্ণনা করেছেন যেঃ

‘যে ব্যক্তি মুসলিমদের রাস্তা থেকে এক হাত পরিমাণ জায়গা নিল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তাকে সাত জমীনের মাটি দ্বারা আবদ্ধ করবেন।’

সেচকাজের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, আল যুবায়ের তার জমির উপর দিয়ে যাওয়া একটি জলধারার পানি দিয়ে সেচকার্য নিয়ে একজন আনসারের সাথে দ্বন্দে জড়িয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে বলেন,

‘হে যুবায়ের, সেচকার্যের পর তোমার প্রতিবেশীকে পানি ছেড়ে দাও।’ (মুসলিমের বর্ণিত এ হাদীসটির ব্যাপারে ঐকমত্য আছে)

এভাবেই রাসূল (সাঃ) মুসলিমদের প্রতিটি বিষয় দেখাশুনা করতেন এবং কোন প্রকার জটিলতা ব্যতীত সহজ সরল ভাবে তাদের সমস্যাসমূহ সমাধান করতেন। এ সমস্ত কার্য পরিচালনার জন্য তিনি (সাঃ) কিছু কিছু সাহাবীদের (রা.) সাহায্য নিতেন, এবং এভাবেই তিনি (সাঃ) জনগণের বিষয়সমূহ দেখাশুনার বিষয়টিকে খলীফার তত্ত্বাবধানের অধীন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন; কিংবা, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি (সাঃ) এ বিষয়সমূহ দেখাশুনা করার জন্য যোগ্য পরিচালক নিয়োগ করেন। এজন্যই আমরা খলীফার গুরুভার লাঘব করার জন্য এটিকে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিশেষ করে, বর্তমানে যখন জনগণ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে। সুতরাং, জনগণের বিষয়সমূহ দেখাশুনা করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান (জনকল্যাণ বিভাগ) থাকবে, যার দায়িত্বভার একজন যোগ্য পরিচালকের হাতে ন্যস্ত করা হবে, এবং এমন উপায় উপকরণ ও পদ্ধতিতে তা পরিচালনা করা হবে যা রাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের জীবনকে সহজতর করে।

এ ব্যবস্থাটি বিভিন্ন প্রশাসন, বিভাগ ও পরিষদের দ্বারা গঠিত হবে। প্রশাসন হল রাষ্ট্রের যে কোন কর্মকান্ড সম্পর্কিত সার্বিক পরিচালনা, যেমনঃ নাগরিকত্ব, যাতায়াত, মুদ্রা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসংস্থান, রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত। এই প্রশাসন তার নিজস্ব কর্মকান্ড এবং এর অধীনস্থ বিভাগ ও পরিষদ সমূহের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। প্রতিটি বিভাগ আবার তার নিজস্ব কর্মকান্ড এবং এ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পরিষদের পরিচালনা করবে। পরিষদগুলো আবার তাদের নিজস্ব কর্মকান্ড এবং এর অধীনস্থ প্রতিটি শাখা ও বিভাগ পরিচালনা করবে।

বস্তুতঃ এই প্রশাসন, বিভাগ ও পরিষদ প্রতিষ্ঠা করার মূল লক্ষ্য হল রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা এবং সেইসাথে, জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ দেখাশুনা করা।

এছাড়া, এইসব প্রশাসন, বিভাগ ও পরিষদগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবশ্যই এদের জন্য পরিচালক নিযুক্ত করতে হবে। প্রতিটি প্রশাসনে একজন মহাব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হবে, যিনি সরাসরি এর দায়িত্বে থাকবেন এবং এর অধীনস্থ সকল বিভাগ ও পরিষদের কর্মকান্ড তদারকী করবেন। আবার, প্রত্যেক বিভাগ ও পরিষদে একজন পরিচালক নিয়োগ করা হবে, যিনি সরাসরি এর দায়িত্বে থাকবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ও বিভাগসমূহের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করবেন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রশাসন পরিচালনার একটি বিশেষ পদ্ধতি, এটি শাসনকার্য সম্পর্কিত নয়

প্রশাসনিক ব্যবস্থা হল কোন কাজ সম্পাদনের পন্থা (style) এবং মাধ্যম (means)। সুতরাং, এর জন্য সুনির্দিষ্ট কোন শারী'আহ্ দলিলের প্রয়োজন নেই। এজন্য, প্রশাসনের উৎস বা মূলকে নির্দেশ করে এমন সাধারণ দলিল-প্রমাণই যথেষ্ট। সুতরাং, এটা বলা ভুল হবে যে, এই পন্থা বা মাধ্যমগুলো মানুষের কাজ, যার প্রতিটির জন্য শারী'আহ্ দলিলের প্রয়োজন। কারণ, এই বিষয় সম্পর্কিত কর্মকান্ডগুলোর মূল সাধারণ দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত। সুতরাং, এই মূল থেকে উৎসারিত সকল শাখাপ্রশাখা এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর শাখাপ্রশাখার ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট দলিল থাকে। সেক্ষেত্রে, এ নির্দিষ্ট বিষয়ে শারী'আহ্ দলিলের অনুসরণ করতে হবে। যেমনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

'এবং তোমরা যাকাত আদায় কর।' **[সূরা মুয্যাম্মিল : ২০]**

যা মূলতঃ যাকাতের ব্যাপারে একটি সাধারণ দলিল। এরপর, এ কাজের শাখাপ্রশাখার ব্যাপারেও দলিল এসেছে। যেমনঃ নিসাবের পরিমাণ, যাকাত সংগ্রহকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে এবং কোন ধরনের মানুষের কাছ থেকে যাকাত আদায় করা হবে ইত্যাদি। এই সমস্ত কর্মকান্ডই '*তোমরা যাকাত আদায় কর*' এ আয়াত থেকে উৎসারিত হয়েছে।

কিন্তু, যাকাত সংগ্রহকারী ব্যক্তিবর্গ কোন উপায়ে যাকাত সংগ্রহ করবেন এ ব্যাপারে কোন দলিল পাওয়া যায়নি। যেমনঃ তারা কি পায়ে হেঁটে সংগ্রহ করবে, না কোন বাহনে চড়ে করবে? তারা কি এ কাজে তাদের সাহায্য করার জন্য কোন কর্মচারী নিযুক্ত করবে? তারা কি কোন রেকর্ড অনুযায়ী তা সংগ্রহ করবে? তারা কি এ কাজের জন্য কোন কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবে, যেখানে তারা সকলে একত্রিত হবে? তারা কি কোন গুদামঘর তৈরি করবে যেখানে তারা তাদের সংগৃহীত মালামাল জমা করবে? এ স্থাপনাসমূহ কি মাটির নীচে হবে, নাকি শস্য রাখবার ঘরের মতই হবে? নগদ যাকাত কি ব্যাগে নাকি তহবিলে জমা দিতে হবে? বস্তুতঃ এ সমস্ত কাজ '*এবং তোমরা যাকাত আদায় কর*' এই আয়াত থেকে উৎসারিত এবং এ আয়াতের নির্দেশাধীন কাজ।

সুতরাং, এ সকল কাজই যাকাত আদায়ের সাধারণ দলিল-প্রমাণের আওতাধীন। কারণ, এ সকল কাজের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এছাড়া, এ কাজগুলো আসলে উপায় বা পন্থার সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং, কোন কাজ করার উপায় বা পন্থা হচ্ছে সে কাজের অধীনস্থ একটি বিষয়। এ কারণেই কোন কাজের উপায় বা পন্থা নির্ধারণের জন্য কোন নির্দিষ্ট দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। কারণ, মূল কাজটির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত দলিলই এ বিষয়ের দলিল হিসাবে যথেষ্ট হয়।

সুতরাং, প্রশাসনিক পন্থা বা মাধ্যম যে কোন ব্যবস্থা থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি না কোন সুনির্দিষ্ট শারী'আহ্ দলিলের দ্বারা ঐ বিশেষ পন্থা বা মাধ্যম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়। এ ধরনের পরিস্থিতি ছাড়া, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা এবং জনগণের বিষয়সমূহ দেখাশুনা করার জন্য যে কোন পন্থা বা উপায়ে প্রশাসন পরিচালনা করা যায়। এর কারণ হল, প্রশাসন পরিচালনার পন্থা বা উপায় কোন শারী'আহ্ বিধান নয় যার জন্য শারী'আহ্ দলিল প্রয়োজন। এ কারণে, উমর (রা.) তাঁর সেনাসদস্য ও নাগরিকদের নামের তালিকা করার প্রয়োজনে দিওয়ান নিযুক্ত করেছিলেন যেন রাষ্ট্রীয় বা গণমালিকানাধীন সম্পদভূক্ত অর্থ থেকে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত মজুরী বা বেতনভাতা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা যায়।

আল হারিস ইবনু নুফায়েলের বরাত দিয়ে 'আবিদ ইবনে ইয়াহিয়া বর্ণনা করেছেন যে, উমর মুসলিমদের সাথে দিওয়ান এর তালিকার ব্যাপারে পরামর্শ করেন। তখন আলী (রা.) তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বলেন যে, 'প্রতি বছরের সংগৃহীত সম্পদ না রেখে সবই আপনি বন্টন করে দিন।' উসমান ইবনে আফফান বলেন, 'আমি দেখছি যে বড় আকারের সম্পদ জনগণের মাঝে বন্টিত হয়। যারা পেল আর যারা পেল না এদের কোন তালিকা না করা হলে আমার ভয় হয় পরিস্থিতি আওতার বাইরে চলে যাবে।' এ বিষয়ে আল ওয়ালিদ ইবনু হিশাম ইবনে আল মুগীরা বলেন, 'আমি আল-শামে ছিলাম এবং লক্ষ্য করেছি যে, সেখানকার বাদশাহ্গণ সৈন্য সংগ্রহের সময় দিওয়ান ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। সুতরাং, আপনি এটার প্রচলন করছেন না কেন?' তখন উমর তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেন এবং কুরাইশ যুবক আকীল ইবনে আবি তালিব, মাখরামা ইবনে নুফায়েল এবং যুবায়ের ইবনে মাতাম'কে ডেকে পাঠান এবং নির্দেশ দেন যে, 'প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে জনসংখ্যার তালিকা প্রস্তুত কর।'

যখন ইসলাম ইরাকে পৌঁছাল, তখন তহবিল সংগ্রহ ও বেতনভাতা পরিশোধের জন্য দিওয়ান পূর্বের মতই অব্যাহত থাকে। আল-শামের দিওয়ান ছিল ল্যাটিন ভাষায়, কারণ এটি রোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল; আর, বাগদাদের দিওয়ান ছিল ফারসী ভাষায়, কারণ এটি পারস্য সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। খলীফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের সময় আল-শামের দিওয়ান আরবী ভাষায় রূপান্তর করা হয় (৮১ হিজরীতে)। জনগণের স্বার্থরক্ষার নিমিত্তে প্রয়োজন অনুসারে বেশকিছু দিওয়ান চালু করা হয়। সেনাসদস্যদের অর্ন্তভূক্তি ও বরাদ্দকৃত মজুরীর প্রয়োজনে সেনাবাহিনীতে দিওয়ানের প্রচলন করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ফি ও লেনদেনের দাবি দাওয়ার তালিকা সংরক্ষরণের আরও কিছু দিওয়ানের প্রচলন করা হয়। আরেকটি দিওয়ানের সূচনা করা হয় প্রত্যেক ওয়ালী ও আমীলের নিয়োগ ও পদচ্যুতির তালিকা সংরক্ষণের জন্য। বাইতুল মালের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্যও দিওয়ানের প্রচলন হয়। দিওয়ানের প্রচলণ হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে এবং সময়ের আবর্তে এর পন্থায় অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। কারণ, এগুলো হল পন্থা বা মাধ্যম, যা প্রয়োজনের তাগিদে এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন করা অনুমোদিত।

প্রতিটি দিওয়ানে অন্যান্য কর্মচারীসহ একজন প্রধান নিয়োগ করা হত। কখনো কখনো দিওয়ানের প্রধানকে তার অধীনস্থ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হত; আবার, কখনো বা তার জন্য তা নিয়োগ করে দেয়া হত।

এভাবে, প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনানুসারে এবং যে পন্থা বা উপায় উক্ত কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করবে, সে অনুযায়ী দিওয়ান প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে; এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকা, বা উলাই'য়াহ্ ভেদে বিভিন্ন রকম পন্থা ও উপায় অনুসরণ করা অনুমোদিত।

সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা যায় যে, একদিকে তারা রাষ্ট্রের বেতনভূক্ত কর্মচারী এবং অন্যদিকে, একইসাথে তারা রাষ্ট্রের নাগরিক। সুতরাং, পেশাগত দিক থেকে তারা তাদের নিজ নিজ বিভাগ বা পরিষদের ব্যবস্থাপকদের কাছে জবাবদিহিতা করতে বাধ্য; আবার, নাগরিক হিসাবে তারা শাসকের কাছে, অর্থাৎ, খলীফা, তার সহকারীবৃন্দ বা ওয়ালীদের কাছেও জবাবদিহিতার ব্যাপারে দায়বদ্ধ। এজন্য তাদের শারী'আহ্ বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক নিয়মনীতি সবই মেনে চলতে হবে।

প্রশাসনিক নীতি

প্রশাসনিক নীতির ভিত্তি হল ব্যবস্থার সহজীকরণ, কাজের গতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং প্রশাসকদেও যোগ্যতা নিশ্চিত করা। জনগণের স্বার্থ নিশ্চিত করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ভিত্তিতেই এ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, যদি কোন ব্যক্তির কর্মসংস্থান বা চাকুরীর প্রয়োজন হয়, তবে তার এ প্রয়োজন যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে ও দক্ষ প্রক্রিয়ায় পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

'অবশ্যই আল্লাহ্ সবকিছু নিখুঁতভাবে সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন; যখন তুমি হত্যা কর, তখন তা সুন্দরভাবে কর এবং যখন জবাই কর তখনও তা সুন্দরভাবে কর।' *(এ হাদীসটি সাদ্দাদ বিন আওসের সূত্রে সহীহ্ মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং-১৯৫৫)*

সুতরাং, নিখুঁত, পূর্ণাঙ্গ বা সঠিকভাবে কার্যসম্পাদন করা শারী'আহ্ কর্তৃক নির্দেশিত। আর, এ যোগ্যতা অর্জন করতে হলে প্রশাসনকে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে:

প্রথমত: প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সহজ-সরল করতে হবে, যেন তা যে কোন প্রক্রিয়াকে দ্রুতগতিসম্পন্ন করে মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজতর করে; বিপরীতক্রমে, প্রশাসনিক জটিলতা মানুষের জীবনকে দূর্বিসহ করে।

দ্বিতীয়ত: লেনদেনের প্রক্রিয়াকে দ্রুতগতিসম্পন্ন করতে হবে, যেন তা জনগণকে অহেতুক বিলম্বজনিত হয়রানি থেকে রক্ষা করে।

তৃতীয়ত: কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে; কারণ, তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপরই নির্ভর করবে কাজের পূর্ণাঙ্গতা ও ফলাফল।

রাষ্ট্রীয় বিভাগে কাজের যোগ্যতা

যে কোন ব্যক্তি, যারা রাষ্ট্রের নাগরিক ও যোগ্য, হোক সে নারী কিংবা পুরুষ, মুসলিম কিংবা অমুসলিম, প্রশাসনের যে কোন বিভাগের পরিচালক বা কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হতে পারে।

এ নীতিটি *ইজারা* বা অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত করা সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে, যেখানে নারী বা পুরুষ, মুসলিম বা অমুসলিম যে কাউকে অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত করা অনুমোদিত। এর কারণ হল *ইজারা*'র জন্য প্রাপ্ত দলিল-প্রমাণ সার্বজনীন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

'যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে' **[সূরা ত্বালাক : ৬]**

এটি হল সার্বজনীন দলিল।

আবু হুরাইরা থেকে বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমি হাশরের ময়দানে তিন ধরনের ব্যক্তিকে কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি করব... এবং সে ব্যক্তি যে কাউকে কাজে নিয়োগ দিল, তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিল কিন্তু, তাকে পারিশ্রমিক দিল না।' *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-২২৭)*

এই দলিলটিও সার্বজনীন।

এছাড়া, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) স্বয়ং বনু আল-দীল গোত্রের এক অমুসলিম ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের বেতনভূক্ত কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, যা প্রমাণ করে যে, মুসলিম নাগরিকের মতো রাষ্ট্রের একজন অমুসলিম নাগরিককেও প্রশাসনে নিযুক্ত করা অনুমোদিত। এছাড়া, এ বিষয়ে দলিলের সার্বজনীনতা প্রমাণ করে যে, পুরুষের মতো একজন নারীকেও এ সমস্ত কাজের জন্য নিয়োগ করা অনুমোদিত। সুতরাং, নারীকে সরকারী কোন বিভাগের পরিচালক বা কর্মচারী যে কোন পদে নিয়োগ দেয়া যেমন অনুমোদিত; তেমনিভাবে, একজন অমুসলিম নাগরিককেও পরিচালক বা কর্মচারী যে কোন পদে নিযুক্ত করা অনুমোদিত। কারণ, এরা সকলেই রাষ্ট্রের বেতনভূক্ত কর্মচারী (শাসক নন) এবং কর্মচারী নিযুক্ত করার সাধারণ দলিল-প্রমাণই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

বাইতুল মাল

বাইতুল মাল শব্দটি গঠনের দিক থেকে জটিল ও বহু অর্থবোধক এবং এটি রাষ্ট্রের এমন একটি স্থানকে নির্দেশ করে যেখানে ব্যয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রাপ্ত সকল রাজস্ব জমা রাখা হয়। এছাড়া, এর দ্বারা এমন একটি কর্তৃপক্ষকেও বোঝানো হয়ে থাকে, যা মুসলিমদের অধিকারকৃত সম্পদসমূহ গ্রহণ ও ব্যয়ের জন্য দায়িত্বশীল।

আমরা ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, সেনাবাহিনী, বিচারব্যবস্থা এবং তহবিল ব্যতীত ওয়ালীকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হবে। সুতরাং, সমগ্র সেনাবাহিনীর একটি কেন্দ্রীয় বিভাগ থাকবে, যার নেতৃত্বে থাকবে *আমীর-উল-জিহাদ*। একইভাবে, বিচারব্যবস্থার জন্যও একটি কেন্দ্রীয় বিভাগ, যাকে বিচারবিভাগ বলা হবে এবং রাষ্ট্রের সকল রাজস্ব বা তহবিল একটি কেন্দ্রীয় বিভাগের অধীনে থাকবে, যাকে বলা হবে *বাইতুল মাল*।

এ ব্যাপারে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) এর সময় *বাইতুল মাল* সরাসরি তাঁর কিংবা, তিনি (সাঃ) যাকে এর প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করতেন তার তত্ত্বাবধানের অধীন ছিল। আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) ক্ষেত্রবিশেষে সরাসরি রাষ্ট্রীয় তহবিল তদারকী করতেন, যেখানে এ তহবিল একটি সিন্দুকে জমা রাখা হত। তিনি (সাঃ) সাধারণত নিজে তহবিল গ্রহণ করতেন, এগুলো বন্টন করতেন এবং সঠিক স্থানে সেগুলো ব্যয় করতেন। আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি (সাঃ) অন্য কাউকে এ তহবিলের দায়িত্বে নিযুক্ত করতেন। রাসূল (সাঃ) কে অনুসরণ করে খোলাফায়ে রাশেদীনরাও (রা.) একই কাজ করেছেন; হয় তাঁরা নিজেরা সরাসরি *বাইতুল মাল* এর দায়িত্ব নিয়েছেন কিংবা, তাঁদের পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালন করার জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মসজিদেই *বাইতুল মাল*-এর তহবিল রাখতেন। আনাসের (রা.) সূত্রে আল বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আনাস (রা.)) বলেছেনঃ

'বাহরাইন থেকে আগত কিছু তহবিল নবী (সাঃ) এর নিকট আনা হল। তিনি (সাঃ) বললেন, 'এগুলো মসজিদে ছড়িয়ে রাখো।' *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৪২১)*

তিনি (সাঃ) মাঝে মাঝে এগুলো তাঁর স্ত্রীদের কক্ষে রাখতেন। এ ব্যাপারে আল বুখারী উকবা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উকবা বলেছেন,

'আমি মদীনাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পেছনে আসরের সালাত আদায় করলাম। নামাজের শেষে তিনি সালাম দিয়ে অতি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। তিনি কাতারবন্দী মুসলিমদের অতিক্রম করে তাঁর স্ত্রীদের ঘরের দিকে ছুটে গেলেন। লোকেরা তাঁর গতিতে অবাক হয়ে গেল। তিনি ফিরে আসলেন এবং দেখলেন লোকেরা তাঁর দ্রুতগতিতে ছুটে চলা দেখে অবাক হয়ে আছে। তিনি বললেন, 'আমার মনে পড়ল, কিছু স্বর্ণের ধূলা আমাদের জিম্মায় আছে। এগুলো আমাকে পেছন থেকে তাড়া করবে ভেবে ভীত ছিলাম এবং সে কারণে ওগুলোকে বন্টন করার নির্দেশ দিয়ে এলাম।'' অন্যথায় তিনি (সাঃ) এগুলোকে তাঁর (সাঃ) সিন্দুকে জমা রাখতেন। এ ব্যাপারে উমর (রা.) থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে,

'সুতরাং আমি তাঁকে (তাঁর স্ত্রীকে) বললাম, 'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোথায়?' তিনি বললেন, 'তিনি তাঁর সিন্দুকের ঘরে।', আমি রাসূল (সাঃ) এর সিন্দুকের দিকে তাকালাম এবং হঠাৎ করে এক সা' (ক্ষুদ্র পরিমাণের একক) পরিমাণ বার্লি দেখতে পেলাম এবং ঘরের ফলের রস তৈরীর জন্য এক পাশে একই পরিমাণের কিছু ফল দেখতে পেলাম; আর দেখলাম ঘরের দেয়ালে টাঙানো একখানা চামড়ার টুকরা। তা দেখে আমার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'হে খাত্তাবের পুত্র, কিসে তোমাকে কাঁদালো?' আমি বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ্! কেন আমি কাঁদবো না, যখন আমি দেখতে পাচ্ছি এই পাটির দাগ আপনার শরীরে বসে গেছে এবং এই হচ্ছে আপনার সিন্দুক, যেখানে আমি যা দেখলাম এছাড়া আর কিছুই নেই।''

খোলাফায়ে রাশেদীনদের (রা.) সময়ে রাষ্ট্রীয় তহবিল রাখার স্থানকে *বাইতুল মাল* নামে অভিহিত করা হয়। সাহল ইবন আবু হাছমা এবং অন্যান্যদের থেকে সা'দ তার *আল তাবাকাত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ''আল-শানে আবু বকরের একটি গৃহ ছিল যার জন্য কোন পাহারাদার নিযুক্ত ছিল না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, 'কেন আপনি এর জন্য কোন পাহারাদার নিযুক্ত করছেন না?' উত্তরে তিনি বললেন, 'এর জন্য তালা আছে।' তিনি এ গৃহ থেকে এর মধ্যে যা রক্ষিত থাকত তা

বিতরণ করতেন যে পর্যন্ত না তা খালি হয়ে যেত। যখন তিনি মদিনায় গেলেন, তিনি এটিকে (তহবিল) স্থানান্তরিত করে নিজ গৃহে রাখলেন।"

হিনাদ তার *আল জুহদ* গ্রন্থে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "এক ব্যক্তি উমরের নিকট আসলো এবং বললো, 'হে আমীর-উল-মু'মিনীন! আমাকে সাহায্য করুন, যেন আমি জিহাদে যেতে পারি।' উত্তরে উমর বললেন, 'তার হাত ধর এবং তাকে বাইতুল মাল-এ নিয়ে যাও, যেন সে তার প্রয়োজন মত অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।' আল-শাফীঈ তার *আল-উম্ম* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যে বর্ণনাকে আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াদিয়্যাহ'র সূত্রে ইবন হাজার সঠিক বলেছেন, তিনি বলেছেন: 'আবু হুজাইফা'র সালিম নামের এক দাস ছিল, পূর্বে যে আমাদের গোত্রের সালমা বিনত ইয়ার নামের এক নারীর দাস ছিল। অন্ধকার যুগেই সে তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল। যখন উক্ত দাস ইয়ামামা'র যুদ্ধে শহীদ হলেন, তখন তার রেখে যাওয়া সম্পদ (উত্তরাধিকার) উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে নিয়ে আসা হল। তখন তিনি ওয়াদিয়্যাহ ইবন খিদমাহ্'কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন: 'এটা হল তোমার দাসের উত্তরাধিকার এবং তোমরাই এর অধিক দাবিদার।' (একথা শুনে) তিনি বললেন: 'হে আমির-উল-মু'মিনীন! আল্লাহ্ আমাদেরকে এর মুখাপেক্ষী করেননি। আমাদের বংশের নারী তাকে কোন শর্ত ছাড়াই মুক্ত করে দিয়েছে। সুতরাং, আমরা আমাদেরকে এ বিষয়ে অসম্মানিত করতে চাই না।' অতঃপর, উমর তার (উক্ত দাসের) উত্তরাধিকারের সম্পদ বাইতুল মালে জমা রাখলেন।" এছাড়া, আল বায়হাকী এবং আল দারিমী বর্ণনা করেছেন এবং ইবন হাজিম এটাকে শুদ্ধ করেছেন: "সুফিয়ান ইবন আবদুল্লাহ ইবন রাবিয়্যাহ আল ছাকাফি একটি চামড়ার ব্যাগ কুড়িয়ে পান এবং তা উমর ইবন আল-খাত্তাবের কাছে নিয়ে যান। তিনি বলেন: 'এক বছরের জন্য ঘোষণা দাও এবং এ সময়ের মধ্যে যদি কোন দাবিদার চিহ্নিত হয়, তাহলে এটি ফিরিয়ে দাও। আর, যদি না পাওয়া যায় তাহলে এটা তোমার।'

এক বছরের মধ্যে এটার কোন দাবিদার আসল না। পরের বছর তার সাথে সাক্ষাৎ কালে তাকে এটা স্মরণ করিয়ে দেয়া হল। তখন উমর বললেন: "এটা এখন তোমার। কারণ, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) আমাদের এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।" তিনি (সুফিয়ান ইবন আবদুল্লাহ) বললেন: 'আমি এটা চাই না।' তখন 'উমর সেটাকে নিলেন এবং বাইতুল মালে জমা রাখলেন।" এছাড়া, আবদুল্লাহ ইবন আমরু থেকে আল দারিমী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "উসমানের শাসনামলে এক ভৃত্য কোন আত্মীয়-স্বজন না রেখেই মৃত্যুবরণ করলো। তিনি তার সম্পদ বাইতুল মাল-এ জমা করার নির্দেশ দিলেন।" আনাস ইবন শিরিন থেকে ইবন আবদ আল-বার তার *আল-ইসতিদকার* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, "আলী সে পর্যন্ত সম্পদ বিতরণ করতেন যে পর্যন্ত না বাইতুল মাল শূণ্য হয়ে যেত। এরপর, তা পরিস্কার করা হত এবং তখন তিনি সেখানে বসতেন।"

এসব হাদীস বা ঘটনায় *বাইতুল মাল'*কে স্থান অর্থে বোঝানো হয়েছে। আর, *বাইতুল মাল*-এর দ্বিতীয় অর্থ, যেখানে এ শব্দসমূহের দ্বারা একটি দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে বোঝানো হয়; সে সম্পর্কে বলা যায় যে, তহবিল বা সম্পদ অনেক সময় কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে থাকে না বলে এ কর্তৃপক্ষের অপরিহার্যতা তৈরি হয়েছে, যেমন: জমি, তেলের খনি, গ্যাসের খনি, যে সব সাদাকা গ্রহণ করার পর কোন নির্দিষ্ট স্থানে না রেখেই উপযুক্ত লোকদের মাঝে তা বন্টন করে দেয়া হয় ইত্যাদি। আল বায়হাকী, আহমদ ইবনে হাম্বল এর *আল মুসনাদ*, আবদুর রাজ্জাক এর *মুসান্নাফে* বর্ণিত হাদীস অনুসারে দেখা যায় যে, *বাইতুল মাল'*কে কখনও কখনও একটি কর্তৃপক্ষ বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। লাহিক ইবনে হুমাইয়াদ থেকে জানা যায়, 'ইবনে মাসউদকে বিচারব্যবস্থা ও বাইতুল মালের প্রধান হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল।' এর অর্থ এই নয় যে, উমর (রা.) ইবনে মাসউদকে *বাইতুল মাল*-এর দরজার পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন; বরং, এর অর্থ হল, তাঁকে তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ের কর্তৃত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। আল-হাসান থেকে ইবন আল-মুবারক তার *আল-জুহদ* গ্রন্থে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, সেখানেও *বাইতুল মাল'*কে একই অর্থে বোঝানো হয়েছে। যখন বসরার আমীরগণ আবু মুসা আল-আশয়ারী'র সাথে আসলেন, তারা তাঁকে তাদের জন্য কিছু খাবার বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি একথা বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন: 'হে আমীর সম্প্রদায়! আমি আপনাদের জন্য *বাইতুল মাল* থেকে দুটি ভেড়া এবং এক টুকরো কৃষি (*গারীব*) জমি বরাদ্দ করছি।" এখানেও বাইতুল মাল বলতে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ বোঝানো হতে পারে।

খলীফা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি বাইতুল মালের আয়-ব্যয় তত্ত্বাবধান করেন

রাসূল (সাঃ) হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর নিজের কোলে উসমান (রা.) এর কাছ থেকে বিপদসঙ্কুল (*'উসরাহ*) যাত্রার সেনাবাহিনী'র জন্য অনুদান গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া, হাসান ও গারীব থেকে তিরমিযী এবং আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং আব্দুর রহমান ইবন সামরাহ্ থেকে আল-হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং শুদ্ধ করেছেন এবং আল জাহাবী এর সাথে একমক পোষণ করেছেন, তিনি বলেছেন যে:

“উসমান রাসূল (সাঃ) এর নিকট এক হাজার দিনার নিয়ে আসলেন, যখন তিনি (সাঃ) বিপদসঙ্কুল যাত্রার সেনাবাহিনী অর্থাৎ, তাবুকের যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করছিলেন। তিনি এ মুদ্রাগুলো রাসূল (সাঃ) এর কোলের উপর রাখলেন। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এগুলোকে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেনঃ “আজকের পর থেকে আর কোন কাজের দ্বারা উসমান ক্ষতিগ্রস্থ হবে না; এবং তিনি (সাঃ) এ কথাটি অনেকবার বললেন।” তিনি (সাঃ) মাঝে মাঝে বাইতুল মাল-এর অর্থ নিজেই বন্টন করতেন। আল বুখারী আনাসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যেঃ

“বাইরাইন থেকে আগত অর্থ রাসূল (সাঃ) এর নিকট আনা হল। তিনি (সাঃ) বললেনঃ এগুলোকে মসজিদে ছড়িয়ে রাখ। নামাজ শেষ করে তিনি (সাঃ) এগুলোর খুব কাছে বসলেন এবং উপস্থিত কাউকে সে অর্থ থেকে বঞ্চিত করলেন না। যখন রাসূল (সাঃ) উঠে দাঁড়ালেন তখন আর কোন অর্থই অবশিষ্ট থাকল না।”

আবু বকরের (রা.) শাসনামলেও তিনি নিজে বাহরাইন থেকে আগত অর্থ বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আল বুখারী জাবিরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ

“রাসূল (সাঃ) বলেছিলেনঃ ‘যদি বাহরাইন থেকে অর্থ আসে তবে আমি তোমাকে এভাবে, এভাবে এবং এভাবে দেব, অর্থাৎ, তিনবার বললেন। রাসূল (সাঃ) এর ইন্তিকালের পর বাহরাইন থেকে অর্থ আসলো। তখন আবু বকর কাউকে এ ঘোষণা দেবার নির্দেশ দিলেনঃ যার যার রাসূল (সাঃ)এর কাছে কোন ঋণ বা অন্যকিছু পাওনা আছে, সে যেন আমার কাছে আসে। এ কথা শোনার পর আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম আল্লাহ্’র রাসূল আমাকে বলেছিলেনঃ “আমার জন্য এভাবে, এভাবে এবং এভাবে; তারপর তিনি আমাকে তিনবার দিলেন।”

উপরে উল্লিখিত সুফিয়ান আল-ছাকাফী’র চামড়ার ব্যাগ সম্পর্কিত হাদীসটি যেখানে তিনি ব্যাগটি পাবার পর ঘোষণা দেন এবং শেষ পর্যন্ত কোন দাবিদার না পাওয়ায়ঃ “উমর সেটাকে নিলেন এবং বাইতুল মালে জমা রাখলেন।” আল শাফীঈ তার *আল-উম্ম* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ “একাধিক পন্ডিত ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, যখন ইরাকের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট আসলো, বাইতুল মাল-এর তত্ত্বাবধায়ক তাকে বললেনঃ “আমাকে এগুলো বাইতুল মালে রাখতে দিন।” তিনি বললেনঃ “না! কাবার প্রভুর শপথ! এগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত কোন গৃহে রাখা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এগুলোকে বন্টন করা হবে।” এরপর তিনি এগুলোকে মসজিদে রাখার নির্দেশ দিলেন এবং চামড়ার মাদুর দিয়ে এগুলোকে ঢেকে দেয়া হল। তারপর, আনসার ও মুহাজিরিনদের মধ্য হতে কিছু ব্যক্তি এগুলোকে পাহারা দেবার দায়িত্বে নিয়োজিত হল। সকাল বেলায় আল-আব্বাস ইবন আব্দুল-মুত্তালিব (রা.) এবং আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা.) তাঁর (উমর (রা.)) সাথে বের হলেন; হয় তিনি এদের মধ্যে কোন একজনের হাত ধরে ছিলেন কিংবা, এদের মধ্যে কেউ একজন তাঁর হাত ধরে ছিলেন। যখন তারা (পাহারাদার) তাঁকে দেখল, তারা গণীমতের মালগুলোর উপর থেকে চামড়ার মাদুর সরিয়ে নিল। এরপর তিনি এমন এক দৃশ্য অবলোকন করলেন, যা তিনি পূর্বে কখনও দেখেননি। তিনি দেখলেন স্বর্ণ, ইন্দ্রনীলমণি, ক্রিসোলাইট, মুক্তা ঝল্‌মল্‌ করছে। এ দৃশ্য অবলোকন করার পর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তাদের একজন বললেন, “আল্লাহ্’র কসম! আজকের এদিন কান্নার নয়; বরং, এদিন আনন্দের, এদিন (আল্লাহ্’র) প্রশংসা করার।” তিনি (উমর (রা.)) বললেনঃ “আল্লাহ্’র কসম! তুমি বিষয়টিকে যেভাবে দেখছো আমি সেভাবে দেখছি না। এ ধরনের সম্পদ কোন জাতির মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো তাদের ক্ষতি সাধন করেছে।” তারপর তিনি কিবলা’র দিকে ফিরলেন, তাঁর দুই হাত তুলে বললেন, “হে আমার প্রভু! আমি এসবের প্রলোভন থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কারণ তুমি বলেছোঃ

“আমি তাদের অজ্ঞাতসারে তাদেরকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাব।” **[সূরা 'আরাফ : ১৮২]**

তারপর তিনি বললেন, সুরাকা ইবন জা’শম কোথায়? তাকে নিয়ে আসা হল যখন তার দুই হাত ছিল সরু ও চুলে আবৃত। তিনি তাকে কিসরা’র বাহুবন্ধনীগুলো দিলেন এবং বললেনঃ ‘এগুলো পরো’। তারপর তিনি বললেন, ‘বল, আল্লাহু আকবর।’ সে বলল, ‘আল্লাহু আকবর’। তখন তিনি বললেন, ‘বল প্রশংসা সেই আল্লাহ্’র যিনি কিসরা ইবন হিরমিজের হাত থেকে এটা বের করে করেছেন এবং বনু মিদলাজের এক (সামান্য) বেদুইন সুরাকা ইবন জা’শামকে তা দিয়ে অলঙ্কৃত করেছেন।’ তারপর তিনি একটি লাঠি দিয়ে মালামালগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলেন এবং বললেন, ‘নিঃসন্দেহে যে এগুলো আমাদের কাছে সমর্পণ করেছে সে সৎ।’ তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, ‘আমাকে বলতে দিন, আপনি আল্লাহ্’র পক্ষ থেকে (আমাদের) তত্ত্বধায়ক (আমিন উল্লাহ্) এবং তারা আপনার কাছে তাই সর্মপণ করেছে, যা আপনি আল্লাহ্’র কাছে সর্মপণ করেছেন। একথা শুনে তিনি বললেন, ‘তুমি সত্য বলেছো।’ তারপর তিনি সেগুলোকে বন্টন করে দিলেন।

এছাড়া, আমরা ইতোমধ্যে আবদুল্লাহ ইবন আমরু'র সূত্রে আল-দারিমী বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছি: "এক ভৃত্য কোন আত্মীয়-স্বজন না রেখেই মৃত্যুবরণ করলো। সুতরাং, উসমান তার উত্তরাধিকারের সম্পদ বাইতুল মালে জমা করতে বললেন।" এর সাথে সাথে *আল-ইসতিদকার* গ্রন্থে উল্লেখিত আনাস ইবন শিরিন এর হাদীসটিই উল্লেখ করা হয়েছে যে: "আলী (রা.) ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থ বিতরণ করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না বাইতুল মাল শূণ্য হয়ে যেত (তারপর সে গৃহকে পরিস্কার করা হত এবং তিনি সেখানে বসতেন)।"

কখনও কখনও রাসূল (সাঃ) সম্পদ বন্টনের সময় সাহাবীদের (রা.) মধ্য হতে কাউকে সামগ্রিকভাবে এ বিষয়ে নেতৃত্ব দেবার জন্য মনোনীত করতেন। কিংবা, তিনি তহবিল বন্টন সম্পর্কিত কিছু বিষয়ের দায়িত্ব দিয়ে কাউকে নিযুক্ত করতেন। উকবাহ্'র সূত্রে আল বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

'আমার মনে পড়ল, কিছু স্বর্ণের ধুলা আমাদের জিম্মায় আছে। এগুলো আমাকে পেছন থেকে তাড়া করবে ভেবে ভীত ছিলাম এবং সে কারণে ওগুলোকে বন্টন করার নির্দেশ দিয়ে এলাম।"

এছাড়া, ইবন শিহাবের একটি হাদীস, যা ইবন আবি শায়বাহ বর্ণনা করেছেন এবং এ বর্ণনাটি আল-হাফিয ইবন আল হাজার আল-আশক্বালানী, আল মুনদিরী এবং আল হাইছামী বিশুদ্ধ বলেছেন: **"আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) বিলালের সিন্দুকের ঘরে গেলেন যেখানে তিনি সাদাকাহ্ জমা রাখতেন। সেখানে তিনি (সাঃ) কিছু স্তুপীকৃত খেজুর দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এ খেজুরগুলো কিসের জন্য, বিলাল?" তিনি বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ্! আমি এগুলো আপনার দূর্দিনের জন্য রেখে দিয়েছি।' তখন তিনি বললেন, 'তুমি কি নিজেকে নিরাপদ মনে কর, যখন তুমি ঘুম থেকে উঠো এবং নিজেকে জাহান্নামের ধোঁয়ার মধ্যে আবিস্কার করো?' এগুলো বিতরণ করে দাও এবং আরশের মালিকের পক্ষ থেকে কোন প্রকার কৃপণতার ভয় করো না।"**

এছাড়া, অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "রাসূল (সাঃ) এর সময় আব্দুর রহমান ইবন আউফ সাদাকা'র উট ও ভেড়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। আর, বিলাল নিযুক্ত ছিলেন সাদাকা'র ফল-ফলাদির দায়িত্বে; আর, মাহমিয়্যাহ ইবন জুয (আল্লাহ্'র রাসূল ও তাঁর পরিবারের) এক পঞ্চমাংশের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। আর, খলীফা বলেছেন: "এবং বিলাল তাঁর ব্যয়ের জন্য দায়িত্বশীল ছিলেন।"

আবদুল্লাহ ইবন লাহী আল-হুযানী'র সূত্রে ইবন হিব্বান তার *সহীহ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন: 'আমি রাসূল (সাঃ) এর মুয়াজ্জিন বিলালের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে বিলাল! আল্লাহ্'র রাসূল এর ব্যয়ের পরিমাণ কেমন ছিল?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তাঁর (ব্যয় করার মত) কিছুই ছিল না। আমি তাঁর রাসূল হিসাবে মনোনীত হবার দিন থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এ দায়িত্বে ছিলাম। তাঁর কাছে যদি কোন মুসলিম আসতো, যার পরনে কোন কাপড় থাকতো না, তিনি আমাকে দ্রুত কিছু অর্থ ঋণ করে নিয়ে আসার নির্দেশ দিতেন, যেন তিনি ঐ ব্যক্তির জন্য পোষাক ও খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন।' ইমাম মুসলিম রাসূল (সাঃ) এর ক্রীতদাস আবু রাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন যে:

'রাসূল (সাঃ) একটি বাচ্চা উট ধার করেছিলেন। যখন তাঁর কাছে উটের সাদাকাহ্ পৌঁছাল, তখন তিনি আমাকে ঐ উটের মালিককে বাচ্চা উটটি ফেরত দেবার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, চার বছরের একটি ভাল উট ছাড়া আমি আর কোন উট দেখতে পাচ্ছি না। রাসূল (সাঃ) বললেন, 'ওটাই তাকে দাও; কারণ, উত্তম মানুষ তারাই যারা ঋণ পরিশোধে উত্তম।'

এছাড়া, ইবনে আব্বাসের হাদীসে এটি উল্লেখিত আছে, যে ব্যাপারে চার ইমাম একমত পোষণ করেছেন:

'রাসূল (সাঃ) যখন মু'য়াজকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন, তখন তিনি (সাঃ) তাঁকে বলেন:

'যদি তারা তোমার কথা মেনে নেয়, তবে তাদের জানাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর সাদাকাহ্ ধার্য করেছেন, যা তাদের মধ্যকার সম্পদশালী ব্যক্তিদের নিকট হতে সংগ্রহ করা হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তবে তাদের নিকট হতে তাদের সর্বাপেক্ষা ভালো সম্পদ নেয়া থেকে বিরত থাকবে; এবং মজলুমদের অভিশাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে; কারণ, তাদের ও আল্লাহ্'র মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।"

এছাড়া, আবু হুরাইরাহ থেকে দুটি সহীহ্ গ্রন্থে (*সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম*) বর্ণিত আছে যে: "আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) উমর (রা.) কে সাদাকাহ্ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন।"

খোলাফায়ে রাশেদীনগণও তাঁর পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন; এজন্য তাঁরাও তহবিল সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনার জন্য কিছু মানুষ নিযুক্ত করেছিলেন। ইবন ইসহাক এবং খলীফা বর্ণনা করেছেন যে: "আবু বকর *বাইতুল মাল*-এর দায়িত্বে আবু উবাইদাহ ইবন আল-জাররাহ্'কে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তারপর, তিনি তাঁকে আল-শামে প্রেরণ করেছিলেন।"

মুয়াকিবের জীবনের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে আল জাহাবী বলেছেন যে, আবু বকর ও উমর তাকে *বাইতুল মাল*-এর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের হতে ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, যা *আল-তারাতিব আল-ইদারিয়্যাহ* (প্রশাসনিক বিন্যাস) গ্রন্থের রচয়িতা আল-হাকিম কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: "তিনি আবু বকরকে পত্র লিখেন এবং আবু বকর তাকে *বাইতুল মাল*-এর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন এবং উমর ইবনুল খাত্তাব এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন।" এখানে আবদুল্লাহ ইবন আল-আরকামকে বোঝানো হয়েছে। ইবন সা'দ তার *তাবাকাত* গ্রন্থে এবং ইবন হাজার তার *আল-ইসাবাহ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উমর (রা.) এর কোষাধ্যক্ষ ছিল তাঁর ভৃত্য ইয়াছ্ছার ইবন নুমায়ের। ইমাম আহমাদ তাঁর *আল-মুসনাদে* এবং আব্দুর রাজ্জাক তার *আল-মুসান্নাফে* লাহিক ইবনে হামিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "এবং তিনি (উমর) ইবন মাসউদকে বিচারবিভাগ ও *বাইতুল মাল*-এর দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করলেন।" অর্থাৎ, আল-কুফাতে প্রেরণ করলেন। মালিক ইবন আনাস থেকে খলীফা এবং মালিক ইবন আনাস বর্ণনা করেছেন যায়িদ ইবন আসলাম থেকে, তিনি বলেছেন: "উমর বাইতুল মাল-এর দায়িত্ব দিয়ে আবদুল্লাহ ইবন আরকাম'কে নিযুক্ত করেছিলেন।"

উরওয়া ইবনে আল যুবায়ের থেকে ইবনে খুজায়মা তার *সহীহ্* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, 'আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল ক্বারী বলেছেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাবের সময় আমি *বাইতুল মাল*-এর দায়িত্বে ছিলাম।' আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের গুণাবলীর বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে হাজার তার *আল-ফাতহ্* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'এবং উমর ও উসমান তাঁকে কুফায় *বাইতুল মাল*-এর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।' আল জাশাইয়ারী তার *আল-ওজারা ওয়াল কুত্তাব* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'মনে করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর লেখক (scribe) আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম ইবনে আবদ ইয়াগুছ তাঁর সময় বাইতুল মাল-এর দায়িত্ব ছিলেন' অর্থাৎ উসমান এর খিলাফত কালে। আল যুবায়ের ইবনে বক্কর থেকে আল হাকীম *আল মুসতাদরাক* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম ইবনে আবদ ইয়াগুছ 'উমরের সময়ে এবং উসমানের শাসনামলের শুরুর দিকে বাইতুল মাল এর দায়িত্বে ছিলেন, যে পর্যন্ত না তার মৃত্যু হয়; এবং তিনি কিছুদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাহচার্য পেয়েছিলেন।'

আল ইসতি'য়াব গ্রন্থে ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করেছেন যে, "উসমানের খিলাফতের সময় যায়িদ ইবনে সাবিত *বাইতুল মাল*-এর দায়িত্বে ছিলেন; যায়িদ এর ওয়াহিব নামে একজন ক্রীতদাস ছিল। উসমান তাকে বাইতুল মালে সহায়তা করতে দেখেন। উসমান বললেন, 'কে এই ব্যক্তি?' যায়িদ প্রত্যুত্তরে বললেন, 'আমার ক্রীতদাস।' তিনি বললেন, 'আমি তাকে মুসলিমদের সহায়তা করতে দেখছি এবং একারণে সে কিছু পাবার অধিকার লাভ করেছে; আমি তার জন্য এটা (ভাতা) বরাদ্দ করলাম।' এরপর, তিনি ঐ ক্রীতদাসের জন্য দু'হাজার (দিরহাম) বরাদ্দ করলেন। যায়িদ বললেন, 'আল্লাহ্'র কসম, আপনি একজন দাসকে দু'হাজার দিতে পারেন না।' অতঃপর, তিনি তার জন্য একহাজার বরাদ্দ করলেন।'

আল সাফাদি মিশরের পন্ডিতগণ ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাহাবীদের (রা.) সম্পর্কে তার গ্রন্থে বলেছেন, 'আবু রাফি'কে 'আলী ইবনে আবু তালিবের কাছে প্রেরণ করা হলে তিনি তাকে কুফায় *বাইতুল মাল*-এর দায়িত্ব দেন।' *আল ইসতি'য়াব* গ্রন্থে ইবনে আবদুল বার উল্লেখ করেছেন যে, 'উবায়দুল্লাহ ইবনে রাফি' আলীর একজন কোষাধ্যক্ষ ও সচিব ছিলেন।' আল আইনী তার *উমদাত উল ক্বারী* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব আল সুয়ি্য'কে আলী সম্মান করতেন, ভালবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। সেকারণে তিনি আল-কুফা'তে তাকে বাইতুল মাল-এর দায়িত্ব প্রদান করেন।' এছাড়া, আলী বসরাতে এ কাজের জন্য যিয়াদকে নিযুক্ত করেন। আল জাশিয়্যারী বলেছেন, 'আল-বসরা ত্যাগ করার সময়, তিনি তাকে আল-খারাজ ও দিওয়ানের দায়িত্ব অর্পণ করেন।'

বাইতুল মাল'কে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

১. **রাজস্ব** : এর মধ্যে তিনটি দিওয়ান আছে:

- *গণীমত* ও *খারাজ* এর দিওয়ান: এর মধ্যে রয়েছে - *গণীমত*, *খারাজ*, ভূমি, *জিজিয়া*, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং কর।

- গণমালিকানাধীন সম্পত্তির দিওয়ানঃ এর মধ্যে রয়েছে তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, খনিজ সম্পদ, সমুদ্র, নদী, খালবিল, ঝর্ণা, বন, তৃণভূমি এবং *হিমা* (সংরক্ষিত ভূমিসমূহ)।

- *সাদাকাহ্*'র দিওয়ানঃ এর মধ্যে রয়েছে টাকা, ব্যবসায়িক পণ্য, ফসল ও ফলমূল, উট, গরু ও ভেড়ার উপর যাকাত ।

২. <u>ব্যয়</u> : এর মধ্যে আটটি দিওয়ান রয়েছেঃ

- খলীফার বাসভবনের দিওয়ান
- রাষ্ট্রীয় সেবার দিওয়ান
- মঞ্জুরীর দিওয়ান
- জিহাদের দিওয়ান
- সাদাকাহ্ ব্যয়ের দিওয়ান
- গণমালিকানাধীন সম্পদের ব্যয়ের দিওয়ান
- জরুরী অবস্থার দিওয়ান
- সাধারণ বাজেট, হিসাব-নিকাশ ও পরিদর্শনের দিওয়ান

তথ্য বিভাগ (*আল ই'লাম*)

রাষ্ট্র এবং এর দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যতগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ আছে, তথ্যবিভাগ তাদের মধ্যে একটি। এটি জনস্বার্থের (*মাসালিহ্*) সাথে সম্পর্কিত নয় যে, এটি জনকল্যাণ বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে; বরং, রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের মতোই একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটি সরাসরি খলীফার তত্ত্বাবধানের অধীন থাকবে।

একটি সুনির্দিষ্ট তথ্যনীতি যা বিশ্বের দরবারে ইসলামকে শক্তিশালী ও কার্যকরভাবে উপস্থাপন করবে, স্বাভাবিকভাবেই তা ইসলামের প্রতি গণমানুষের মনকে আকৃষ্ট করবে; সেইসাথে, তাদের আগ্রহী করবে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও চিন্তাভাবনা করতে। এছাড়া, মুসলিম ভূমিসমূহকে খিলাফত রাষ্ট্রের সাথে একীভূত করার ক্ষেত্রেও এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া, তথ্য-উপাত্তের মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে, যা রাষ্ট্রের (ভাল-মন্দের) সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত; এজন্য খলীফার অনুমতি বা নির্দেশ ব্যতীত এ তথ্যগুলো প্রকাশ করা যাবে না। বিশেষতঃ এটা প্রযোজ্য সামরিক বাহিনী এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো, যেমনঃ সেনাবাহিনীর গতিবিধি; কিংবা, জয় বা পরাজয়ের সংবাদ, কিংবা, সামরিক শিল্পবিষয়ক তথ্য ইত্যাদি। এই জাতীয় তথ্যগুলো সরাসরি ইমাম বা খলীফার সাথে যুক্ত থাকতে হবে, যেন কোন কোন খবর গোপন রাখতে হবে এবং কোন কোন সংবাদ ঘোষণা এবং প্রচার করতে হবে সে বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

এ বিষয়ে শারী'আহ্ দলিল হল আল্লাহ্'র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্।

আল্লাহ্'র কিতাবের ক্ষেত্রে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"আর যখন তাদের নিকট কোন শান্তি সংক্রান্ত বা ভীতিজনক কোন বিষয় উপস্থিত হয়, তখন তারা সেটা রটনা করতে থাকে। যদি তারা ওগুলোকে (সংবাদ) রাসূল ও তাদের উপর কর্তৃত্বশীলদের কাছে পৌঁছে দিত তবে অবশ্যই তথ্যঅনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গ তা উপলব্ধি করতো।" **[সূরা নিসা : ৮৩]**

এ আয়াতের বিষয়বস্তু সরাসরি তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত।

আর, রাসূলের সুন্নাহ্'র দলিল হিসাবে মক্কা বিজয়ের উপর ইবন আব্বাসের হাদীসটি উল্লেখ করা যায়, যে হাদীসটি আল-হাকিম তার *আল-মুসতাদরাক* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী এটি সহীহ্ হাদীসের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এবং আল-জাহাবী এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেনঃ "কুরাইশদের নিকট হতে তথ্য গোপন করা হয়েছিল; যেন আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) এর সংবাদ তাদের কাছে না পৌঁছায়; এবং তারা যেন তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারে।"

আবু সালামাহ্'র একটি *মুরসাল* হাদীস (যে হাদীস সরাসরি রাসূলুল্লাহ্'র সাথে যুক্ত নয়; বরং এখানে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি) আছে যা ইবনে আবু শায়বাহ্ বর্ণনা করেছেন, যেখানে বলা হয়েছেঃ

'অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আয়েশাকে বললেনঃ **আমাকে সবকিছু প্রস্তুত করে দাও এবং এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলো না। তারপর তিনি রাস্তা-ঘাট বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিলেন, যেন মক্কার লোকেরা চলাচল করতে না পারে এবং তাদের কাছে কোন সংবাদ না পৌঁছে।'**

এছাড়া, *গাজওয়া 'উসরাহ্* (তাবুকের অভিযান) সম্পর্কে কা'ব বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, যে হাদীসের ব্যাপারে ঐক্যমত আছে, এ হাদীসে বলা হয়েছেঃ

"রাসূল (সাঃ) কখনও কোন অভিযানে তাঁর সঠিক গন্তব্যের ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রকাশ করতেন না, একমাত্র সে অভিযানটি ছাড়া যেটির জন্য তিনি ভয়াবহ উত্তপ্ত আবহাওয়ায় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন; যেটি ছিল একটি দূরবর্তী স্থানে, মরুভূমিতে এবং বিশাল সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে। সুতরাং, তিনি মুসলিমদের পুরো ব্যাপারটি বর্ণনা করলেন যাতে তারা অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং তিনি তাদেরকে তাঁর গন্তব্যও জানিয়ে দিলেন।"

এ ব্যাপারে আনাসের একটি হাদীস রয়েছে যা আল-বুখারী বর্ণনা করেন,

“রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যায়িদ, জাফর ও ইবনে রুওয়াহার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানোর আগেই এ ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, **‘যায়িদ প্রথমে পতাকা হাতে নিল ও শহীদ হল; অতঃপর জাফর হাতে নিল এবং সেও শহীদ হল; তারপর, ইবনে রুওয়াহা পতাকা হাতে নিল এবং সেও শহীদ হল; একথা বলতে বলতে তিনি কাঁদছিলেন। অতঃপর, আল্লাহ্’র তরবারীর মধ্য হতে একটি তরবারী তা তুলে নিল এবং আল্লাহ্ তাদের জন্য বিজয় নির্ধারণ করলেন।”** *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৩৭৫৭)*

তথ্য সম্পর্কিত এই সমস্ত নীতির কিছু কিছু খোলাফায়ে রাশেদীনদের সময়েও প্রয়োগ করা হয়; যা কিনা ইবন আল-মুবারক এর জিহাদ সম্পর্কিত এক বর্ণনায় এসেছে; আল-হাকিম এটি তার *আল-মুসতাদরাক* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম মুসলিমের (সহীহ্ হাদীসের) শর্তানুযায়ী তিনি এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, যে ব্যাপারে আল-জাহাবী একমত পোষণ করেছেন। উক্ত হাদীসটি যায়িদ ইবন আসলাম থেকে ইবন আল-মুবারক, ইবন আসলাম আবার তার পিতা হতে, তার পিতা আবার উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি (’উমর) এ ব্যাপারে অবগত হলেন যে, আবু উবাইদাহ শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে এবং তারা তাদের দিকে সমবেতভাবে এগিয়ে আসছে। শোনার পর উমর তাঁকে লিখলেন, ‘তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক! ঈমানদারদের উপর এমন কোন বিপদ আপতিত হয় না, যেখান থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্ তা’আলা তাকে পথ করে দেন না; এবং (জেনে রাখ) একটি কঠিন সময় কখনও দু’টি সুসময়ের কাছে পরাজিত হয় না।’

‘হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।’ **[সূরা আল ইমরান : ২০০]**

তিনি বলেন: তারপর, আবু উবায়দা তাঁকে লিখেন, ‘আপনার উপরেও শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন,

‘তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।’ **[সূরা হাদীদ : ২০]**

তারপর তিনি বলেন: অতঃপর ’উমর তাঁর হাতের বইখানা নিয়ে মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন এবং মদীনার লোকদের এটা পাঠ করে শোনালেন এবং বললেন, ‘হে মদিনাবাসী! আবু উবাইদা পরোক্ষভাবে তোমাদের জিহাদের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে, যেন তোমরা এ ব্যাপারে আগ্রহী হও।”

যে বিষয়গুলো সমরবিষয়ক তথ্যের সাথে সম্পর্কিত সেগুলো হল, সমঝোতা, শান্তিচুক্তি এবং বিতর্ক বিষয়ক তথ্য যা কিনা খলীফা কিংবা তার সহকারীবৃন্দ এবং কুফর রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। সমঝোতার উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, হুদাইবিয়া’র প্রান্তরে আল্লাহ্’র রাসূল (সাঃ) এবং কুরাইশদের প্রতিনিধির সাথে প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে শান্তিচুক্তি সংঘটিত হবার পূর্বপর্যন্ত যে সংলাপ সংঘটিত হয়েছিল। এছাড়া, সরাসরি বিতর্কের উদাহরণ হিসাবে রাসূল (সাঃ) এর সাথে জাজরান থেকে আগত প্রতিনিধিদের বিতর্কের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়, যেখানে তিনি (সাঃ) তাদেরকে নিজেদের উপর আল্লাহ্’র অভিশম্পাত নাযিলের ঘোষণা দিয়েছিলেন যদি তারা (তাদের দাবির ব্যাপারে) সত্যবাদী না হয়ে থাকে। এছাড়া, রাসূল (সাঃ)এর নির্দেশক্রমে তামিমের প্রতিনিধিদের সাথে ছাবিত ইবন কায়েস ও হাস্সান এর বিতর্কের ঘটনাও উল্লেখ করা যায়।

বস্তুতঃ উপরোল্লিখিত ঘটনাগুলোর কোনটির ক্ষেত্রেই কোন প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়নি।

এছাড়া, আরও অনেক ধরনের সংবাদ বা তথ্য আছে যেগুলোর রাষ্ট্রের সাথে সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই, সেগুলোর ক্ষেত্রে খলীফার সরাসরি অনুমোদন বা নির্দেশ অপরিহার্য নয়; যেমন: প্রতিদিনকার খবর, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বিজ্ঞান বিষয়ক কিংবা, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনা ইত্যাদি। বস্তুতঃ এ ধরনের সংবাদ বা তথ্যসমূহে জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী কিংবা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে রাষ্ট্রের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এজন্য, এ ধরনের সংবাদ পরিবেশন ও প্রচার বিষয়ে রাষ্ট্রের তদারকী ও পর্যবেক্ষণ প্রথমোক্ত তথ্যসমূহের থেকে ভিন্নতর হবে।

এজন্য, রাষ্ট্রের তথ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই দু’টি প্রধান বিভাগ থাকতে হবে:

প্রথমত: এ বিভাগের কাজ রাষ্ট্রের সাথে সরাসরিযুক্ত এমন তথ্যের সাথে সম্পর্কিত, যেমন: সামরিক বিষয়সমূহ, সামরিক শিল্প বিষয়ক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক, ইত্যাদি। এ বিভাগের কাজ হল এ সম্পর্কিত তথ্যগুলো সরাসরি পর্যবেক্ষণ

করা; যেন এ ধরনের সংবাদসমূহ এ বিভাগে উপস্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রের কোন সংবাদ মাধ্যম বা অন্যকোন বিশেষ সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত না হয়।

দ্বিতীয়ত: এ বিভাগটি অন্যান্য খবরের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য নয়। রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম কিংবা, অন্যকোন বিশেষ সংবাদ মাধ্যমে এ সংক্রান্ত খবর প্রচারের জন্য কোন পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন নেই।

প্রচারমাধ্যম সমূহের অনুমোদন প্রাপ্তি

ইসলামী রাষ্ট্রে প্রচারমাধ্যমসমূহের কাজ করার জন্য কোনপ্রকার অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। বরং, রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিক যে কোন ধরনের প্রচারযন্ত্র স্থাপন করতে পারবে, সেটা প্রকাশনার মাধ্যমে হোক কিংবা, অডিও বা ভিজ্যুয়াল যাই হোক না কেন। তবে, তিনি কোন ধরনের প্রচারযন্ত্র স্থাপন করতে চান তা অবশ্যই তাকে তথ্যবিভাগে অবহিত করতে হবে।

এবং, তাকে অবশ্যই উপরোল্লিখিত নীতি অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ, রাষ্ট্রের সাথে সরাসরিযুক্ত এমন তথ্য প্রচারের পূর্বে তথ্যবিভাগের অনুমতি নিতে হবে; আর অন্যান্য খবরের ক্ষেত্রে তথ্যবিভাগের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন নেই।

সকল ক্ষেত্রে, প্রচারমাধ্যমের মালিককেই তার প্রচারিত সংবাদের দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং অন্যান্য নাগরিকের মত তাকেও জবাবাদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে, যদি তিনি তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে শারী'আহ্ আইন লঙ্ঘন করেন।

রাষ্ট্রের তথ্য নীতি

তথ্য সংক্রান্ত একটি আইন প্রকাশ করা হবে, যেখানে শারী'আহ্ আইনের আলোকে গঠিত রাষ্ট্রের তথ্যনীতির ব্যাপারে কিছু সাধারণ দিকনির্দেশনা থাকবে। ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্র এ নীতিকে অনুসরণ করবে, যেন এমন একটি পরস্পর নিবিড় সম্পর্কযুক্ত ও শক্তিশালী ইসলামী সমাজ গঠিত হয়, যা আল্লাহ্'র রজ্জুকে শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং যা থেকে ক্রমাগত উন্নত আদর্শের আলোকময় শিখা বিচ্ছুরিত হবে; যেখানে অনৈতিক, দুষ্ট ও ক্ষতিকর ধ্যান-ধারণার কোন স্থান থাকবে না; থাকবে না ভ্রান্ত পথনির্দেশনাপূর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন কোন সংস্কৃতি। এটি হবে এমন একটি ইসলামী সমাজ যা নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সকল দুষ্ট চিন্তাধারাকে নস্যাৎ করবে এবং বিচ্ছুরিত করবে ন্যায় ও সত্যাদর্শের আলোকময় শিখা এবং সকল সময়, সকল ক্ষেত্রে বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রভু, মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা জ্ঞাপন করবে।

মাজলিস আল উম্মাহ্

(উম্মাহ্'র কাউন্সিল, শূরা ও জবাবদিহিতা)

মাজলিস আল উম্মাহ্ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি কাউন্সিল বা পরামর্শ সভা, যা বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর মতামতের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং যাদের সাথে প্রয়োজন হলে খলীফা বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে পরামর্শ করবেন। আবার, অপরদিকে তারা শাসকদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করার ক্ষেত্রে উম্মাহ্'র প্রতিনিধিত্ব করবে। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কর্মকান্ডের আলোকে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, তিনি (সাঃ) আনসার ও মুহাজির'দের কিছু ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করতেন, যারা তাদের নিজ নিজ গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করতেন। এছাড়া, তিনি (সাঃ) পরামর্শদাতা হিসাবে কিছু সাহাবীকেও মনোনীত করেছিলেন, পরামর্শ কালে তিনি (সাঃ) সাধারণতঃ অন্যদের চাইতে তাঁদের মতামতকে বেশী গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন; যেমনঃ আবু বকর (রা.), উমর (রা.), হামযাহ্ (রা.), আলী (রা.), সালমান আল-ফারসী (রা.), হুজাইফা (রা.) প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ।

এছাড়া, এ বিষয়ে আরও দলিল পাওয়া যায় আবু বকরের জীবনী থেকে। প্রকৃত অর্থে, আবু বকর (রা.) আনসার ও মুহাজির'দের মধ্য হতে কিছু ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন এবং যখন কোন ঘটনা ঘটত (যে বিষয়ে পরামর্শ করা প্রয়োজন) তখন তিনি উক্ত বিষয়ে তাদের মতামত চাইতেন। আবু বকরের সময়ে শূরা কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ওলামা ও ফাত্ওয়া প্রদানে সক্ষম ব্যক্তিবর্গ। ইবনে সা'দ, আল-কাসিম হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোন ঘটনা ঘটত এবং আবু বকর মতামত প্রদানে সক্ষম ব্যক্তি ও ফকীহ্গণের সাথে আলোচনা করতে চাইতেন, তখন তিনি আনসার ও মুহাজির'দের মধ্য হতে কিছু ব্যক্তিকে ডাকতেন। আবু বকরের সময় উমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.), আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.), উবাই বিন কাব (রা.), যায়িদ বিন ছাবিত (রা.), মু'য়াজ বিন জাবাল (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ তাঁদের মতামত প্রদান করতেন। লোকেরা তাদের ফাত্ওয়া বা রায়ও গ্রহণ করত। পরবর্তীতে, উমর (রা.) যখন খলীফা হলেন তখন তিনিও এসব ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এছাড়া, মুসলিমদের পক্ষ থেকে শাসকদের জবাবদিহি করার বিষয়েও দলিল-প্রমাণ রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনদের (রা.) সময় মুসলিমরা শাসকদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করতো। বস্তুতঃ যেহেতু শূরা বা কাউন্সিলের মাধ্যমে উম্মাহ্'র মতামতের প্রতিনিধিত্ব করা অনুমোদিত; একইভাবে, এ কাউন্সিলের মাধ্যমে উম্মাহ্'র পক্ষ থেকে শাসককে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করাও অনুমোদিত। উপরোল্লিখিত সমস্ত কিছুই প্রমাণ করে যে, মতামত প্রদান ও শাসককে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করার জন্য উম্মাহ্'র পক্ষ থেকে একটি বিশেষ পরামর্শ সভা বা কাউন্সিল গঠন করা শারী'আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত, যা কিনা গঠিত হবে আল্লাহ্'র কিতাব ও রাসূল (সাঃ)এর সুন্নাহ্'র আলোকে। এটিকে "উম্মাহ্'র কাউন্সিল" বলা হবে, কারণ এ কাউন্সিল বা পরামর্শ সভাটি উম্মাহ্'র থেকে মতামত প্রদান ও শাসককে জবাবদিহি করার জন্য গঠিত হয়েছে।

রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদেরও এ কাউন্সিলের সদস্য হবার অনুমোদন রয়েছে, যেন তারা তাদের উপর শাসকদের দ্বারা কোন অন্যায়-অবিচার সংঘটিত হলে; কিংবা, তাদের উপর শারী'আহ্ আইনের অপপ্রয়োগ হলে; কিংবা, সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনপ্রকার ঘাটতি হলে বা এ জাতীয় কোন সমস্যা হলে অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

শূরার অধিকার

শূরা হল সমস্ত মুসলিমের অধিকার যা পূরণ করা খলীফার কর্তব্য। খলীফাকে পরামর্শ দেয়া তাদের অধিকার এবং খলীফার উচিত বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ বলেন,

'*কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ কর। অতঃপর যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেল, তখন আল্লাহ্'র উপর ভরসা কর।*' **[সূরা আল ইমরান : ১৫৯]**

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,

'*তারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে।*' **[সূরা আশ শূরা : ৩৮]**

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লোকদের কাছে মতামত চাইতেন এবং তাদের পরামর্শ শুনতেন। বদরের যুদ্ধের দিন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থান নিয়ে সাহাবীদের (রা.) সাথে পরামর্শ করেছিলেন, এবং ওহুদের যুদ্ধের সময় মদিনার ভেতরে না বাইরে যুদ্ধ করা উচিত এ বিষয়ে সাহাবীদের (রা.) সাথে আলোচনা করেছিলেন। বদরের যুদ্ধের দিন তিনি (সাঃ) যুদ্ধকৌশলের ব্যাপারে অভিজ্ঞ আল হাবাব ইবনুল মুনজির (রা.) এর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। ওহুদের যুদ্ধের দিন তিনি (সাঃ) সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ করেছিলেন, যদিও এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব মতামত ছিল ভিন্ন।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) মুসলিমদের সাথে ইরাকের ভূমি বিষয়ে পরামর্শ করেছিলেন। যেহেতু এটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ছিল, সেহেতু এগুলো কি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে, নাকি মালিকানা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের হাতে রেখে খারাজ প্রদানের শর্তে এ অঞ্চলের লোকদের হাতেই ভূমিগুলো ছেড়ে দেয়া হবে। তারপর তিনি তাঁর নিজের ইজতিহাদ অনুসারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং অধিকাংশ সাহাবী (রা.) এ ব্যাপারে সমর্থন দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, তিনি সে অঞ্চলের লোকদের হাতেই ভূমিগুলো ছেড়ে দেন এবং তাদের খারাজ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন।

জবাবদিহিতার অধিকারঃ

মুসলিমদের এ অধিকার রয়েছে যে, খলীফা তাদের পরামর্শ করবেন এবং সেইসাথে, তাদেরও অবশ্যই শাসকদের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ড সম্পর্কে তাদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করতে হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শাসকদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করাকে মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন; এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) মুসলিমদের অকাট্য নির্দেশের মাধ্যমে আদেশ দিয়েছেন যেন মুসলিমরা শাসকদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করে এবং অপসারিত করে, যদি তারা জনগণের অধিকার ক্ষুন্ন করে, তাদের প্রতি দায়িত্বপালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় কিংবা, জনগণের কোন বিষয় অবহেলা করে, বা, শারী'আহ্ আইন লঙ্ঘন করে, কিংবা, আল্লাহ্'র আইন ব্যতীত অন্য কোন আইন দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে। উম্মে সালামা (রা.) থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"এমন কিছু আমীর আসবে যাদের কিছু কাজের ব্যাপারে তোমরা একমত পোষণ করবে এবং কিছু কাজ প্রত্যাখান করবে। সুতরাং, যারা তাদের ভাল কাজের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করবে তারা গুনাহ থেকে মুক্তি পেল; যে মন্দ কাজকে প্রত্যাখান করল সেও নিরাপদ হয়ে গেল। কিন্তু, তার কী হল যে (মন্দ কাজকে) গ্রহণ করল এবং তা প্রত্যাখান করল না? তারা জিজ্ঞেস করলেন, 'এমতাবস্থায় আমাদের কী তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত নয়?' উত্তরে তিনি (সাঃ) বললেন, **'না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সালাত কায়েম রাখে।"** এখানে *সালাত* বলতে শারী'আহ্ আইন অনুযায়ী শাসন করাকে বোঝানো হয়েছে।

আবু বকরের খিলাফতের সময় উমর (রা.) ও তাঁর অনুসারী মুসলিমগণ মুরতাদদের বিরুদ্ধে আবু বকরের যুদ্ধের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন (যখন প্রথম মুরতাদ সম্পর্কিত সমস্যা শুরু হয়েছিল)। আল বুখারী ও মুসলিম আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

"যখন আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) ইন্তেকাল করলেন এবং আবু বকর খলীফা হলেন তখন আরবের কিছু গোত্র মুরতাদ (অর্থাৎ, ইসলাম ত্যাগ করল) হয়ে গেল। উমর বললেন, 'আপনি কিভাবে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"আমি (আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে) আদিষ্ট হয়েছি যেন মানুষের সাথে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্'র রাসূল" এ কথার স্বীকৃতি দেয় এবং নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। অতএব, যদি তারা তা করে তবে তাদের জীবন ও সম্পদ আমার নিকট হতে নিরাপদ, তবে যেটা আল্লাহ্'র আইন (অর্থাৎ, শারী'আহ্ লঙ্ঘনে প্রাপ্য শাস্তি) **তা ব্যতীত। আর, তাদের হিসাবনিকাশ তো আল্লাহ্'র কাছে।"** *(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-২৯৪৬)*

উত্তরে আবু বকর বললেন, 'আল্লাহ্'র কসম! আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করেছে। কারণ, যাকাত হল সম্পদের উপর (আল্লাহ্'র) অধিকার। আল্লাহ্'র কসম, তারা যদি কোন বাচ্চা ছাগীও যাকাত দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে দিত, এই অস্বীকৃতির কারণে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব।' তখন উমর (রা.) বললেন, 'আল্লাহ্'র কসম, তিনিই আল্লাহ্ যিনি দ্রুত আবু বকরের হৃদয়কে প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং আমি জানি তিনি সত্য বলেছেন।'

উমর (রা.) এর সময় বিলাল ইবনে রাবাহ্ এবং আল-যুবায়ের সহ অন্যান্যরাও মুজাহিদদের মাঝে ইরাকের ভূমি বন্টন না করার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। একজন বেদুইনও উমরের রাষ্ট্রের জন্য কিছু জমি সংরক্ষিত করার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখান করেছিল। আবু উবাইদ তার *আল-আমওয়াল* গ্রন্থে আমীর আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবায়ের হতে এবং ইবন যুবায়ের তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'একজন বেদুইন উমরের কাছে আসল এবং বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন, অন্ধকার যুগে এগুলো আমাদের ভূমি ছিল যেগুলোর জন্য আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। এখন আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং এগুলো আমাদেরই থাকার কথা। তাহলে, আপনি কেন এ ভূমি সংরক্ষিত করতে চাইছেন?' উমর একথা শোনার পর মাথা নাড়াতে লাগলেন এবং নিজের গোঁফে আঙুল চালাতে লাগলেন। যখন কোন বিষয় নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়তেন তখন তিনি এরকম করতেন। এমতাবস্থায় বেদুইন উমরকে আবারও প্রশ্ন করল। অতঃপর উমর বললেন, 'সম্পদের মালিক হলেন আল্লাহ্ এবং লোকেরা তাঁর দাস মাত্র। আল্লাহ্'র কসম, আমি যদি *ফি সাবিলিল্লাহর* (জিহাদের) ব্যাপারে কোনরূপ চাপ অনুভব না করতাম তাহলে এই জমির এক ইঞ্চিও রাখতাম না।' তারপর, উমর গণমালিকানাধীন সম্পদ হতে মুসলিমদের (জিহাদে ব্যবহৃত) ঘোড়ার জন্য কিছু ভূমি অধিগ্রহণ করেন। এছাড়া, (বিবাহের সময়) চারশত দিরহামের বেশী মোহরানা ধার্য না করার ব্যাপারে উমরের নিষেধাজ্ঞাকে এক মহিলা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। উক্ত মহিলা উমরকে বলেছিলেন, 'হে উমর, 'আপনার এটা বলার কোন অধিকার নেই। আপনি কি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ আয়াত শুনেননি যে,

"তোমরা যদি তাদের একজনকে রাশি রাশি ধন প্রদান করে থাকো, তবে তার মধ্য হতে কিছুই ফিরিয়ে নিও না।" **[সূরা নিসা : ২০]**

তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, 'এই মহিলা সঠিক আর উমর ভুল।'

এছাড়া, উসমানের (রা.) সাথে, যখন তিনি আমীর-উল-মু'মিনীন ছিলেন, আলী (রা.) হজ্জ ও উমরাহ্ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। আহমাদ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমরা উসমানের সাথে আল-জুফাহ্'তে থাকাকালে আল-শাম থেকে আগত একদল লোক, যাদের মধ্যে হাবীব ইবন মাসলামা আল-ফাহ্‌রী ছিলেন। উসমানকে হজ্জের সাথে (তামাত্তু) উমরাহ্'র বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: 'হজ্জের মাসে হজ্জ ও উমরাহ একসাথে না করাই উত্তম। এটা ভাল হবে যে, তোমরা দ্বিতীয়বার আল্লাহ্'র ঘরে না আসা পর্যন্ত উমরাহ'কে বিলম্বিত করে নিও। কারণ, তিনি তাঁর এ ঘরকে সৎকাজের জন্য প্রশস্ত করেছেন।' আলী এসময় এ উপত্যকায় উট চরাচ্ছিলেন। উসমানের উমরাহ্'র বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী জানার পর তিনি তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন যে পর্যন্ত না তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন: 'তুমি কি রাসূলের সুন্নাহ্'কে পাল্টে দিতে চাও এবং আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে তাঁর বান্দাদের যে বিষয়ে অনুমতি (রুখসাহ্) দিয়েছেন তা রহিত করতে চাও? তুমি এ ব্যাপারে নিষেধ করছো, অথচ যারা দূরবর্তী স্থান থেকে আসে সে সকল লোকের জন্য এটা অনুমোদিত।' একথা শুনে উসমান লোকদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, 'আমি কি তোমাদের এটা করতে নিষেধ করেছি? না, আমি তা করিনি। এটা শুধু আমার দৃষ্টিভঙ্গী এবং উপদেশ। যে কেউ চাইলে এটা গ্রহণ করতে পারে কিংবা, না চাইলে প্রত্যাখান করতে পারে।"

সুতরাং, উম্মাহ্'র কাউন্সিল বা পরামর্শ সভার পরামর্শ (শূরা) দেয়ার অধিকার রয়েছে এবং শাসকদের জবাবদিহি করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

শূরা এবং জবাবদিহিতার মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট। শূরা হল একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে এ ব্যাপারে মতামত চাওয়া এবং শোনা; আর, জবাবদিহিতা হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সমালোচনা বা বিরোধিতা করা।

উম্মাহ্'র কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন

উম্মাহ্'র কাউন্সিলের সদস্যরা নির্বাচিত, নিয়োগ প্রাপ্ত নন। জনগণের মতামতকে জোরালোভাবে উপস্থাপনের জন্য তারা হলেন জনগণের প্রতিনিধি। প্রতিনিধি তাদের দ্বারাই নির্বাচিত হওয়া উচিত যাদের প্রতিনিধিত্ব তারা করবেন এবং কোন অবস্থাতেই এ প্রতিনিধিদের জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। তাছাড়া, যেহেতু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতামত জোরালোভাবে উপস্থাপনের জন্য এবং তাদের পক্ষ থেকে শাসককে জবাবদিহি করার জন্য উম্মাহ্'র কাউন্সিল গঠন করা হয়, সেহেতু এ উদ্দেশ্য কখনও অর্জিত হবে না, যদি উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত না করে।

এছাড়া, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) যাদের সাথে পরামর্শ করতেন তাদের তিনি ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা বা সক্ষমতার ভিত্তিতে নির্বাচিত করতেন না; বরং, তাদের নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তিনি (সাঃ) দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দিতেন। প্রথমত: তারা তাদের

গোত্র বা গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন, তাদের যোগ্যতা যাই হোক না কেন। আর, দ্বিতীয়তঃ তারা আনসার আর মুহাজিরদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। কারণ, শূরা গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা। সুতরাং, যে নীতির ভিত্তিতে উম্মাহ্'র কাউন্সিলের সদস্যরা নির্বাচিত হবেন, তা হল: প্রথমতঃ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা – যা প্রতিফলিত হয়েছিল রাসূল (সাঃ) কর্তৃক গোত্র প্রধানদের নির্বাচিত করার মাধ্যমে। আর, দ্বিতীয়তঃ কোন দল বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করা – যা প্রতিফলিত হয়েছিল তিনি (সাঃ) কর্তৃক আনসার ও মুহাজিরদের প্রতিনিধি বাছাই করার ক্ষেত্রে। বস্তুতঃ অগনিত মানুষ ও দলের ক্ষেত্রে নির্বাচন ব্যতীত এ প্রতিনিধি নির্বাচন করা সম্ভব নয়। আর, তাই উম্মাহ্ কাউন্সিলের সদস্যদের অবশ্যই নির্বাচিত হতে হবে।

তবে এটা সত্য যে, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) যাদের সাথে পরামর্শ করতেন তাদের তিনি (সাঃ) নিজেই মনোনীত করেছিলেন। এর কারণ হল, মদিনা ছিল একটি ছোট অঞ্চল এবং এখানে সকল মুসলিমই তাঁর পরিচিত ছিল। বিপরীতভাবে, আমরা দেখতে পাই যে, আক্বাবার দ্বিতীয় শপথের সময় যে মুসলিমরা তাঁকে বাই'আত দিয়েছিলেন তারা তাঁর পরিচিত ছিল না বিধায় তিনি নেতা নির্বাচনের বিষয়টি তাদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন:

"তোমরা তোমাদের মধ্য হতে বারো জন নেতা নির্বাচিত করো যারা তাদের লোকেদের উপর দায়িত্বশীল।" এ ঘটনাটি কা'ব ইবন মালিকের সূত্রে সীরাত ইবন হিশামে বর্ণিত আছে।

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, যেহেতু উম্মাহ্ বা শূরা কাউন্সিলের সদস্যগণ বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং যেহেতু এ কাউন্সিল গঠনের মূল উদ্দেশ্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মতামতকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করা এবং সেইসাথে, তাদের পক্ষ থেকে শাসকদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা; এবং যেহেতু এ উদ্দেশ্য অর্জন করা কখনো সম্ভব নয় যদি না প্রতিনিধিবৃন্দ জনগণের মধ্য হতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়; সুতরাং, এটা প্রমাণিত যে, উম্মাহ্ বা শূরা কাউন্সিলের সদস্যদের অবশ্যই নির্বাচিত হতে হবে, তারা রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত হবে না।

উম্মাহ্'র কাউন্সিল নির্বাচিত করার পদ্ধতি

১. গভর্ণর (*ওয়ালী*) সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা পূর্বেই বলেছি যে, আমরা দু'টি কারণে উলাই'য়াহ্ কাউন্সিল (যা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে) নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। প্রথমতঃ উলাই'য়াহর জনগণের প্রয়োজন ও অবস্থা সম্পর্কে ওয়ালীকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। এর কারণ হল, ওয়ালীকে তার দায়িত্ব পালনে এমনভাবে সহায়তা করা যাতে উলাই'য়াহ্র জনগণের স্বস্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয় এবং সেইসাথে, তাদের প্রয়োজন পূরণ ও সেবার বিভিন্ন অনুসঙ্গ সরবরাহ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ উলাই'য়াহ্র শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে জনগণের সন্তুষ্টি ও অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। কারণ, উলাই'য়াহ্ কাউন্সিলের অধিকাংশের অভিযোগ ওয়ালীর অপসারণকে অনিবার্য করে তুলে। সুতরাং, উলাই'য়াহ্ কাউন্সিলের বাস্তবতা প্রশাসনিক – যা উলাই'য়াহ্র জনগণের অবস্থা সম্পর্কে এবং ওয়ালীর কাজের ব্যাপারে সন্তুষ্টি ও অভিযোগ অবহিতকরণের মাধ্যমে ওয়ালীকে তার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে। এ সমস্ত কিছুই ওয়ালীকে প্রতিনিয়ত তার কাজ উন্নত করতে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া, উম্মাহ্'র কাউন্সিল এর মত এই কাউন্সিলের কিছু আবশ্যিক বা নির্বাহী ক্ষমতা (mandatory powers) রয়েছে যে সম্পর্কে (উম্মাহ্'র কাউন্সিল এর আবশ্যিক বা নির্বাহী ক্ষমতা সম্পর্কে) কিছু পরে আলোচিত হবে।

২. আমরা সমগ্র উম্মাহ্'র জন্য একটি কেন্দ্রীয় উম্মাহ্ কাউন্সিল (শূরা ও জবাবদিহিতার জন্য) গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি, যা অবশ্যই উম্মাহ্'র দ্বারা নির্বাচিত হবে এবং উম্মাহ্'কে প্রতিনিধিত্ব করবে। এর আবশ্যিক ক্ষমতাগুলো পরবর্তীতে আলোচিত হবে।

৩. এর অর্থ হল উলাই'য়াহ্ কাউন্সিল এর সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচন হবে এবং উম্মাহ্'র কাউন্সিল এর সদস্যদের জন্য আরেকটি নির্বাচন হবে।

৪. নির্বাচনী প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ও জনগণকে পুনঃনির্বাচনের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য আমরা প্রথমে উলাই'য়াহ্ কাউন্সিল এর নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি; তারপর, যারা এ নির্বাচনে জয়লাভ করবে তারা নিজেদের মধ্য হতে উম্মাহ্'র কাউন্সিল এর সদস্য নির্বাচিত করবে। এর অর্থ হল, উলাই'য়াহ্ কাউন্সিল এর

সদস্যগণ উম্মাহ্ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত হবেন; আর, উম্মাহ্'র কাউন্সিল উলাই'য়াহ্ কাউন্সিল এর দ্বারা নির্বাচিত হবে। অর্থাৎ, উলাই'য়াহ্ কাউন্সিল এর শুরু ও শেষের মেয়াদকাল উম্মাহ্'র কাউন্সিল এর শুরু ও শেষের মেয়াদকাল একই হবে।

৫. উলাই'য়াহ্ কাউন্সিল থেকে যিনি উম্মাহ্'র কাউন্সিল এর সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবেন, তার শূণ্য আসনটি উলাই'য়াহ্ কাউন্সিল নির্বাচনে পরাজিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে যিনি সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তার দ্বারা পূরণ করা হবে। যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে দু'জন ব্যক্তি সমান ভোট পেয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পন্ন করা হবে।

৬. অমুসলিমগণ (*আহলুল দিম্মা*) উলাই'য়াহ্ কাউন্সিলে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচন করবে এবং তারাই আবার উম্মাহ্'র কাউন্সিলে তাদের নিজস্ব সদস্য নির্বাচন করবেন। এ সমস্ত কিছুই উলাই'য়াহ্ কাউন্সিল নির্বাচন ও উম্মাহ্'র কাউন্সিল নির্বাচনের সময়ে সংঘটিত হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা একটি আইন প্রস্তুত করেছি, যা উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহকে বিবেচনা করবে এবং উলাই'য়াহ্ কাউন্সিল ও উম্মাহ্'র কাউন্সিল নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতি ও সাবধানতা সমূহকে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করবে। এই আইনটি যথাসময়ে আলোচিত ও গৃহীত হবে, ইনশাআল্লাহ্ ।

উম্মাহ্ কাউন্সিলের সদস্যপদ

যে কোন ব্যক্তি, যে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বহন করে, যদি সে পরিণত ও সুস্থ মস্তিকের অধিকারী হয়, তবে তার উম্মাহ্'র কাউন্সিল এর সদস্য নির্বাচিত হবার এবং কাউন্সিল এর সদস্য নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে; সে ব্যক্তি নারী বা পুরুষ যে'ই হোক না কেন। এর কারণ হল, উম্মাহ্'র কাউন্সিল এর শাসন করার কোন এখতিয়ার নেই। এজন্য এটি রাসূল (সাঃ) এর সেই প্রসিদ্ধ হাদীস যা নারীদের শাসক পদে নিযুক্ত করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এটা বরং শূরা (পরামর্শ) ও জবাবদিহিতার সাথে সম্পর্কিত, যা কিনা নারী এবং পুরুষ উভয়েরই অধিকার। আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) এর নবুয়্যতের তেরতম বছরে, অর্থাৎ যে বছরে তিনি হিজরত করেছিলেন, সে বছর মদিনা থেকে ৭৫ জন মুসলিম মক্কায় আগমন করেছিলেন, যাদের মধ্যে দুই জন ছিলেন নারী; এবং তারা সকলেই তাঁকে বাই'আত দিয়েছিলেন, যা আক্বাবার দ্বিতীয় শপথ নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এ বাই'আত ছিল যুদ্ধের বাই'আত, ছিল স্বশস্ত্র সংগ্রাম ও রাজনৈতিক বাই'আত। তারা সকলে বাই'আত দেবার পর রাসূল (সাঃ) বললেন:

"তোমরা তোমাদের মধ্য হতে বারো জন নেতা (*নাকীব)* নির্বাচিত করো যারা তাদের লোকেদের উপর দায়িত্বশীল।" এটি কা'ব ইবন মালিকে সূত্রে আহমাদ বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ; এবং এটা তাঁর পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলের মধ্য হতে বারোজন নির্বাচিত করার নির্দেশ।

এখানে তিনি (সাঃ) পুরুষদের কথা বিশেষভাবে বলেননি, আবার নারীদেরকেও বাদ দেননি কিংবা, কাদের নির্বাচিত করা হবে বা কারা নির্বাচিত করবে, সে বিষয়েও কিছু বলেননি। সুতরাং, এক্ষেত্রে শারী'আহ্'র *মুতলাক্ব* (অনির্ধারিত) এর নিয়ম অনুসরণ করা হবে, যে পর্যন্ত এমন কোন দলিল পাওয়া যায় যা এ বিষয়ে কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। এছাড়া, একইসাথে এক্ষেত্রে *'আম* (সাধারণ) নির্দেশের আওতায় এ নির্দেশটিকে ধরা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন দলিলের মাধ্যমে এটি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। উপরোক্ত হাদীসের ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশটি ছিল মুতলাক্ব (অনির্ধারিত) এবং আ'ম (সাধারণ) এবং এ ব্যাপারে এমন কোন দলিল নেই যা, নির্দিষ্টকরণ বা কোনপ্রকার সীমাবদ্ধতা আরোপ করাকে নির্দেশ করে। সুতরাং, এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এখানে উক্ত দু'জন নারীকেও তাদের *নাকীব* নির্বাচন করার এবং তাদের পক্ষ থেকে *নাকীব* হিসাবে নির্বাচিত হবার অধিকার প্রদান করেছেন।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বাই'আত গ্রহণ করছিলেন, যখন তাঁর সাথে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) ও ছিলেন। এসময় তিনি (সাঃ) নারী-পুরুষ উভয়েরই বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। এই বাই'আত ইসলামের জন্য ছিল না, বরং শাসনের জন্য ছিল; আর ঐসব নারীগণ তখন মুসলিমই ছিল। হুদাইবিয়ার প্রান্তরে রিদওয়ানের বাই'আতের পর নারীগণও তাঁকে বাই'আত দিয়েছিল। আল্লাহ্ বলেন,

'হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ্'র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু।' **[সূরা মুমতাহিনা : ১২]**

এই আয়াতে বর্ণিত বাই'আতও শাসনের বাই'আত। পবিত্র কুর'আনের বর্ণনা অনুযায়ী নারীরা এখানে ঈমানদার এবং তাদের প্রদত্ত বাই'আত এই বিষয়ে যে, তারা সৎ কাজে আল্লাহ্'র রাসূলকে অমান্য করবে না।

এছাড়া, নারীদের রয়েছে প্রতিনিধিত্ব করার ও মতামত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হবার অধিকার। এর কারণ হল, তার নিজস্ব মত উপস্থাপন বা প্রকাশের অধিকার রয়েছে; সুতরাং, তার প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকারও রয়েছে। উপরন্তু, যেহেতু এ ধরনের প্রতিনিধিত্বের জন্য পুরুষ হওয়া আবশ্যিক নয়, তাই যারা তাকে নির্বাচিত করবে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারও তার রয়েছে।

এছাড়া, এটাও প্রমাণিত যে, আমাদের নেতা উমর (রা.) যখন কোন সমস্যায় পড়তেন – হোক সেটা হুকুম শারী'আহ্ সংক্রান্ত বা, শাসনকার্য সংক্রান্ত বা, রাষ্ট্রীয় কোন কাজ সংক্রান্ত, তখন তিনি এসব ব্যাপারে মতামতের জন্য মুসলিমদের দ্বারস্থ হতেন। কোন সমস্যার মুখোমুখি হলে তিনি সাধারণতঃ মদিনার মুসলিমদের মসজিদে সমবেত হতে বলতেন, এবং নারী ও পুরুষ সকলকেই তিনি আহ্বান করতেন এবং তাদের সকলেন কাছে মতামত চাইতেন। মোহরানার সীমাবদ্ধতা আরোপের ব্যাপারে যখন একজন নারী তার সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেছিল, তখন উমর তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন।

অমুসলিমদেরও মুসলিমদের মত উম্মাহ্'র কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব করার এবং তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে; যেন তারা এর মাধ্যমে তাদের পক্ষ থেকে, তাদের উপর শারী'আহ্ আইনের অপপ্রয়োগ এবং তাদের উপর পতিত শাসকের জুলুম-নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারে।

তবে, শারী'আহ্ আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অমুসলিমগণ তাদের মতামত উপস্থাপন করতে পারবে না, কেননা শারী'আহ্ আইন ইসলামী আক্বীদাহ্ থেকে উৎসারিত। বস্তুতঃ *আহ্কাম শারী'আহ্* হচ্ছে বাস্তবে প্রয়োগের লক্ষ্যে বিশদ দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে গৃহীত একগুচ্ছ শারী'আহ্ আইনের সমষ্টি, যা মানুষের জীবনের সাথে জড়িত সকল সমস্যাকে ইসলামী আক্বীদাহ্ নির্দেশিত একটি বিশেষ দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে। আর, অমুসলিমরা জীবন সম্পর্কে এমন এক বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে যা সম্পূর্ণ ভাবে ইসলামী আক্বীদাহ্ বর্হিভূত ও এর সাথে সাংঘর্ষিক; সেইসাথে, জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সংঘর্ষপূর্ণ। তাই, শারী'আহ্ আইনসংক্রান্ত বিষয়ে তাদের মতামত বিবেচনা করা হয় না।

এছাড়া, অমুসলিমদের খলীফা নির্বাচন করারও কোন অধিকার নেই; না তাদের খলীফা নির্বাচিত হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের তালিকা সংক্ষেপণে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে; কারণ, শাসনকার্য সম্পর্কিত কোন বিষয়ে তাদের অধিকার নেই। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে, যা উম্মাহ্'র কাউন্সিল এর আবশ্যিক ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত, এ সকল বিষয়ে মুসলিমদের মতোই তার মতামত জোরালোভাবে উপস্থাপনের অধিকার রয়েছে।

উম্মাহ্'র কাউন্সিলের সদস্যপদের মেয়াদকাল

উম্মাহ্'র কাউন্সিলের সদস্যপদের মেয়াদকাল সীমাবদ্ধ। কারণ, আবু বকরের (রা.) তাদের সাথে পরামর্শ করার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পরামর্শ করতেন। আবার, উমর ইবনুল খাত্তাবের (রা.) উপরও আবু বকর (রা.) তাঁর শাসনামলের শেষদিকে যাদের সাথে পরামর্শ করতেন, তাদের সাথে পরামর্শ করার ব্যাপারে কোনপ্রকার বাধ্যবাধকতা ছিল না। উমর (রা.) তাঁর শাসনামলের প্রথম বছরগুলোতে যাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন, পরের বছরগুলোতে তিনি পরামর্শের জন্য অন্যান্যদের পছন্দ করেছেন। এ ঘটনাসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, উম্মাহ্'র কাউন্সিল এর সদস্যপদ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকালের জন্য। আমরা এই মেয়াদকাল পাঁচ বছর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

উম্মাহ্'র কাউন্সিলের আবশ্যিক ক্ষমতাসমূহ

উম্মাহ্'র কাউন্সিলের আবশ্যিক ক্ষমতাসমূহ নিম্নরূপ এবং এগুলো হল:

১. ক) খলীফাকে অবশ্যই কাউন্সিলের সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং কাউন্সিলের অধিকার রয়েছে খলীফাকে এমন সব বাস্তব বিষয় ও কর্মকান্ডের ব্যাপারে পরামর্শ দেয়ার, যেগুলো আভ্যন্তরীণ নীতি বাস্তবায়নের সাথে জড়িত এবং যে সমস্ত বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা ও পর্যালোচনার কোন প্রয়োজন হয় না। যেমন: শাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি। বস্তুতঃ এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করা জনগণের জীবনকে করে আনন্দময় ও প্রশান্তিমন্ডিত। এ বিষয়গুলো ছাড়াও রয়েছে নগরসমূহের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করা, জনগণের জীবনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শত্রুর হুমকী বিদূরিত করা ইত্যাদি। এ সমস্ত বিষয়ে কাউন্সিলের মতামত গ্রহণ করা খলীফার জন্য বাধ্যতামূলক; অর্থাৎ, এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত কার্যকরী করা হবে।

খ) এছাড়া, বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় যেগুলোতে গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে, যেমন: তথ্য প্রকাশ, যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া, কিংবা, যে সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় তথ্যের দরকার হয়, যেমন: সামরিক পরিকল্পনা এবং সকল ধরনের প্রযুক্তি বা শিল্পসংক্রান্ত বিষয় – এ সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করা হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের নয়। একই কথা প্রযোজ্য হবে, অর্থনীতি, সেনাবাহিনী ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে। এ সমস্ত বিষয়ে শারী'আহ্ আইনের আলোকে খলীফার নিজস্ব মত ও ইজতিহাদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আছে, এ সমস্ত বিষয় উম্মাহ্'র কাউন্সিলের আবশ্যিক ক্ষমতার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে না। তবে, খলীফার অধিকার রয়েছে এ বিষয়সমূহ কাউন্সিলের মাধ্যমে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা এবং তাদের মতামত সম্পর্কে অবহিত হওয়া। কিন্তু, এ সকল বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করতে খলীফা বাধ্য নন।

২. আইন গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে কাউন্সিলের পরামর্শ বা মতামত জানতে চাওয়া হবে না। বরং, আইন প্রণয়ণ করা হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্'র কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ্, সাহাবীদের ইজমা' এবং সঠিক ইজতিহাদের মাধ্যমে কৃত ক্বিয়াসের ভিত্তিতে। এভাবেই বিভিন্ন বিষয়ে শারী'আহ্ আইন গ্রহণ ও কার্যকর করা হবে। তবে, খলীফা চাইলে তিনি যে আইন ও বিধিবিধান গ্রহণ করতে চান তা কাউন্সিলের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। কাউন্সিলের মুসলিম সদস্যগণ এ বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান ও বিতর্ক করতে পারেন। তবে, রাষ্ট্র কর্তৃক শারী'আহ্ আইন গ্রহণ করার যে শারী'আহ্ মূলনীতি (*উসুল*) গৃহীত হয়েছে, কোন বিষয়ে খলীফার উপস্থাপিত দলিল-প্রমাণ যদি এ মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক বা মূলনীতি বহির্ভূত হয়, তবে কাউন্সিলের (মুসলিম) সদস্যরা এ আইনের বিরোধীতা করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে, এ বিষয়টি *মাহকামাতুল মাযালিম* এর কাছে ন্যস্ত করা হবে এবং এ বিষয়ে তার প্রদত্ত সিদ্ধান্তকেই বাস্তবায়ন করা হবে।

৩. উম্মাহ্'র কাউন্সিল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কার্যকরীভাবে সংঘটিত যে কোন বিষয়ের ব্যাপারে খলীফাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করার অধিকার সংরক্ষণ করে; তা আভ্যন্তরীণ বিষয়, বৈদেশিক বিষয়, অর্থনৈতিক বিষয় বা সামরিক বিষয় যে কোন ধরনের বিষয় সম্পর্কেই হোক। যে সকল ক্ষেত্রে কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা খলীফার জন্য বাধ্যতামূলক, সে সকল ক্ষেত্রে তাকে তাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে। আর, যে সকল বিষয়ে অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করার উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই, সেক্ষেত্রে তাদের রায় মেনে নেয়া আবশ্যিক হবে না।

যদি উম্মাহ্'র কাউন্সিল ও খলীফার সাথে এমন কোন বিষয়ে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, যা ইতোমধ্যে কার্যকরী হয়ে গেছে, তবে সেক্ষেত্রে এ বিষয়টি সমাধানের জন্য মাযালিম আদালতে উপস্থাপন করতে হবে এবং এ আদালতে প্রদত্ত রায়ই বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. উম্মাহ্'র কাউন্সিল খলীফার সহকারী, ওয়ালী ও আমীলদের ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশের অধিকার সংরক্ষণ করে। এসব ক্ষেত্রে তাদের মতামত গ্রহণ করা খলীফার জন্য বাধ্যতামূলক এবং কাউন্সিলের মতামতের ভিত্তিতে খলীফাকে তাদের তৎক্ষণাৎ পদচ্যূত করতে হবে। যদি ওয়ালী বা আমীলদের উপর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি বিষয়ে

উম্মাহ্'র কাউন্সিলের সাথে সংশ্লিষ্ট উলাই'য়াহ্ কাউন্সিলের মতপার্থক্য দেখা দেয়, তবে এক্ষেত্রে উলাই'য়াহ্ কাউন্সিলের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

৫. খলীফা হিসাবে নিযুক্ত হবার সকল শর্তপূরণের মাধ্যমে যারা এ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য *মাহকামাতুল মাযালিম* কর্তৃক ছাড়পত্র পেয়েছেন, উম্মাহ্'র কাউন্সিলের মুসলিম সদস্যগণ তাদের তালিকা সংক্ষিপ্ত করতে পারেন; হতে পারে এই সংখ্যা দুই বা ছয়, যা কিনা ইতোমধ্যে খলীফা নির্বাচন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের মতামত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক এবং তাদের সংক্ষিপ্তকৃত তালিকার বাইরে কোন প্রার্থীকে বিবেচনা করা হবে না।

বস্তুতঃ এগুলোই হল উম্মাহ্'র কাউন্সিলের আবশ্যিক ক্ষমতাসমূহ। এগুলোর দলিল-প্রমাণ সম্পর্কিত আলোচনা নিম্নরূপঃ

প্রথম অনুচ্ছেদ, ক. বাস্তবতা ভিত্তিক বিষয় ও কর্মকান্ডসমূহে, যেগুলোর ব্যাপারে কোন গভীর চিন্তাভাবনা বা পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই, এ সকল ক্ষেত্রে উম্মাহ্'র কাউন্সিলের মতামত গ্রহণ করা যে খলীফার জন্য বাধ্যতামূলক তার দলিল হিসাবে বলা যায় যে, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) ওহুদের যুদ্ধের সময় মদিনার বাইরে মুশরিক শত্রুপক্ষের মুকাবিলার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ করেছিলেন, যদিও এ বিষয়ে তাঁর ও তাঁর সাহাবীদের মতামত ছিল মদিনার বাইরে না গিয়ে ভেতরে থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করা।

এ নীতিটি আরও গ্রহণযোগ্য হয়েছে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর প্রতি রাসূল (সাঃ) এর উক্তি থেকে:

"যদি তোমরা দু'জনে কোন বিষয়ে পরামর্শের মাধ্যমে একমত হও তবে আমি তোমাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করবো না।"

সুতরাং, মতামতের সাথে জড়িত বাস্তবভিত্তিক যে সমস্ত বিষয়, যেমন: নাগরিকের জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সেবাপ্রদান করা, তাদের নিরাপত্তা বিধান করা, নগরের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করা, জনগণের জন্য হুমকীস্বরূপ বিষয়গুলোকে দূরীভূত করা ইত্যাদি বিষয়ে খলীফাকে বাধ্যতামূলক ভাবে উম্মাহ্ কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ করতে হবে, যদিও এ ব্যাপারে খলীফার মতামত ভিন্ন হয়ে থাকে। এর কারণ, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) ওহুদের যুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে মেনে নিয়েই মদিনার বাইরে শত্রুপক্ষের মুকাবিলা করেছিলেন।

প্রথম অনুচ্ছেদ, খ. নীতিগতভাবে, খলীফা এ অনুচ্ছেদে আলোচিত বিষয়সমূহের ব্যাপারে বিজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ের দলিল হল, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) বদরের যুদ্ধের স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে আল-হাবাব বিন আল-মুনদির (রা.) এর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। সীরাত ইবন হিশামে বর্ণিত আছে যে,

"যখন আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) বদরের কুপের কাছাকাছি তাঁবু স্থাপন করলেন, তখন তাঁর স্থান নির্বাচনের বিষয়ে আল-হাবাব বিন আল-মুনদির সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'হে আল্লাহ্'র রাসূল! আল্লাহ্ কি আপনাকে এ স্থানে তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন যে আমরা এ স্থান ত্যাগ করতে পারবো না? নাকি, এটা যুদ্ধ ও কৌশলের ব্যাপারে আপনার নিজস্ব মতামত? তিনি (সাঃ) বললেনঃ 'এটা যুদ্ধ ও কৌশলের ব্যাপারে শুধুই একটা মতামত।' তখন আল-হাবাব বিন আল-মুনদির বললেনঃ 'হে আল্লাহ্'র রাসূল! যুদ্ধ করার জন্য এটা সঠিক স্থান নয়। এখান থেকে লোকদের সরিয়ে নিন যে পর্যন্ত না আমরা শত্রুপক্ষের কাছাকাছি অবস্থিত কুপের নিকট পৌঁছাই এবং আমরা সেখানে অবস্থান গ্রহণ করবো; তারপর আমরা কুপের পানি অন্যত্র সরিয়ে নেব, তার উপর আমরা একটি বেসিন (পাত্র সদৃশ) তৈরী করবো; তারপর উক্ত বেসিনটি পানি দিয়ে পূর্ণ করবো। তারপর, আমরা আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, যাতে আমরা পানি পান করি, কিন্তু, পান করার জন্য তারা কোন পানি না পায়।' আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) বললেনঃ 'তুমি ঠিক কথাই বলেছো।' সুতরাং, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) এবং মুসলিমরা উঠে দাঁড়ালেন এবং হাঁটতে শুরু করলেন যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষের নিকটবর্তী কুপের কাছে পৌঁছালেন এবং সেখানেই তাঁবু স্থাপন করলেন। তারপর, তিনি (সাঃ) উক্ত কুপের পানি সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাই করা হল। এরপর, একটি বেসিন তৈরী করে তা পানি দিয়ে পূর্ণ করা হল এবং বাকী কুপগুলো বন্ধ করে দেয়া হল এবং তারা তাদের পানির পাত্রগুলো উক্ত বেসিনে নিক্ষেপ করলেন।" সুতরাং, এক্ষেত্রে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) আল-হাবাবের মতামতের সাথে একমত পোষণ করেছিলেন।

এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও কৌশলই মুখ্য, এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের কোন মূল্য নেই। বরং, একজন বিশেষজ্ঞের মতামতই এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া, প্রযুক্তি সংক্রান্ত ও গভীর চিন্তাভাবনার সাথে জড়িত বিষয়গুলো যেখানে পর্যাপ্ত গবেষণা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন সে সকল ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য হবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষের মতামতের চাইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতকে অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। বস্তুতঃ এ সকল বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের কোন মূল্যই নেই। বরং, মূল্য আছে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও পান্ডিত্যের।

অর্থনৈতিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কারণ, হুকুম শারী'আহ্ অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্র, যা অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে এবং এ প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রগুলোও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এছাড়া, কখন ও কোন অবস্থায় জনগণের উপর কর ধার্য করা যাবে সেটাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং, অর্থ সংগ্রহ বা বরাদ্দের ব্যাপারে জনগণের মতামত জানতে চাওয়ার কোন প্রয়োজন এখানে নেই। একই কথা সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ, হুকুম শারী'আহ্ খলীফাকে সেনাবাহিনীর বিষয়সমূহ পরিচালনা করার অধিকার দিয়েছে এবং জিহাদের সম্পর্কিত আইনকানুনও শারী'আহ্ কর্তৃক নির্ধারণ করে দিয়েছে। সুতরাং, শারী'আহ্ নির্ধারিত বিষয়সমূহে জনগণের মতামতের কোন মূল্য নেই। একই কথা খিলাফত রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়েও প্রযোজ্য। কারণ, এ বিষয়ে মতামত প্রদান করতে হলে পর্যাপ্ত চিন্তাভাবনা, গবেষণা, পর্যালোচনা ও গভীর অর্ন্তদৃষ্টি প্রয়োজন এবং এ বিষয়টি জিহাদের সাথেও সম্পর্কিত। উপরন্তু, এ বিষয়টি যুদ্ধ ও এর কৌশলের সাথে জড়িত। সুতরাং, এ বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ কিংবা লঘিষ্ঠ কারো মতামতেরই কোন মূল্য নেই। তবে, এ বিষয়ে জনগণের সাথে পরামর্শ বা তাদের মতামত জানার জন্য খলীফার এ বিষয়সমূহকে কাউন্সিলের সামনে উপস্থাপন করার অধিকার রয়েছে। কারণ, এ বিষয়টি মুবাহ্ (অনুমোদিত) বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। তবে, বদরের প্রান্তরের মতো এক্ষেত্রে কাউন্সিলের মতামত গ্রহণ করা খলীফার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। বরং, এ সিদ্ধান্তগুলো যোগ্য ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্কিত।

'ক' ও 'খ' অনুচ্ছেদের মধ্যে পার্থক্যের নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে,

প্রায় সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন একটি গ্রামে বসবাসরত মানুষের স্বার্থরক্ষার্থে অর্থাৎ, উক্ত গ্রামের বাসিন্দাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কোন নদীর উপর যদি একটি সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তবে এক্ষেত্রে জনসাধারণের যাতায়াত সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে উম্মাহ্'র কাউন্সিলের অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করা খলীফার জন্য বাধ্যতামূলক। তবে, প্রযুক্তিগত দিক থেকে সেতু নির্মাণের উপযুক্ত স্থান এবং সর্বোত্তম প্রকৌশল ও স্থাপত্য নকশা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, যেমন: সেতুটি কি ঝুলন্ত হবে না বা ভিত্তির উপর নির্মাণ করা হবে, ইত্যাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথেই পরামর্শ করা উচিত। এক্ষেত্রে, কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ করা অবান্তর।

একইভাবে, কোন এক গ্রামে শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে, যেখানে এসব শিশুদের জন্য দূরবর্তী শহরে গিয়ে পড়াশোনা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয়, এক্ষেত্রে কাউন্সিলের অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করা খলীফার জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু, মাটির ধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে প্রস্তাবিত নকশা অনুযায়ী বিদ্যালয়টি গ্রামের কোন এলাকায় হলে ভাল হয়, কিংবা, ভবনের নকশাটি কেমন হওয়া উচিত, কিংবা, বিদ্যালয়টি রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে কিনা, বা, এর জন্য বরাদ্দকৃত জমি কি লিজ নেয়া হবে নাকি ক্রয় করা হবে, এ সমস্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শই গ্রহণ করতে হবে। যদিও খলীফা চাইলে এ বিষয়সমূহের ব্যাপারে কাউন্সিলের সাথে পরামর্শ করতে পারেন, কিন্তু, এক্ষেত্রে তাদের মতামত গ্রহণ করা তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে না।

একইভাবে, রাষ্ট্রের কোন অঞ্চল যদি একেবারে সীমান্তবর্তী এলাকায় হয় এবং শত্রুর আক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে থাকে, এক্ষেত্রে অঞ্চলটিকে সুরক্ষিত করা, শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে নিরাপদ করা, এ অঞ্চলে বসবাসরত জনগণকে শত্রুর হাতে হত্যা ও নিজভূমি হতে বিতাড়ন বা যে কোন ধরনের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষার খাতিরে কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যের মতামত গ্রহণ করা খলীফার জন্য বাধ্যতামূলক। তবে, উক্ত অঞ্চলকে সুরক্ষিত করার পদ্ধতি এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার বা তাদের সাথে যুদ্ধ করার পদ্ধতি সম্পর্কে কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যদের মতামতের পরিবর্তে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আইন প্রণয়নের একমাত্র অধিপতি হচ্ছেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

'আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই।' **[সূরা ইউসনফ : ৪০]**

'কিন্তু না, তোমার রবের কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের ভার তোমার উপর ন্যস্ত করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পায় না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেয়।' **[সূরা নিসা : ৬৫]**

'তারা আল্লাহ্'র পরিবর্তে তাদের ধর্মযাজক ও সাধুদের নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।' **[সূরা তওবাহ : ৩১]**

এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, হাদীসটি আদি ইবনে হাতীমের মাধ্যমে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন:

'আমি একদিন একটি স্বর্ণের ক্রস পরিহিত অবস্থায় নবী (সাঃ) এর সামনে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, হে আদি! এই মূর্তি ছুড়ে ফেল। তারপর, আমি তাঁকে সূরা আল-বারা'আহ্ তেলাওয়াত করতে শুনলাম, 'তারা আল্লাহ্'র পরিবর্তে তাদের ধর্মযাজক ও সাধুদের নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।' তিনি বললেন, 'তারা তাদের উপাসনা করত না, কিন্তু, তারা যে ব্যাপারে অনুমোদন দিত তাকে তারা হালাল মনে করত এবং যেটা নিষেধ করত সেটাকে হারাম মনে করত।' *(সূনানে তিরমিযী, হাদীস নং-৩০৯৫)*

সুতরাং, কাউন্সিলের অধিকাংশের মতামত, এমনকি সর্বসম্মতিক্রমেও আইনগ্রহণ করা যাবে না। বরং, এটা গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ্'র কিতাব, রাসূলের সনন্নাহ ও এগুলোর ভিত্তিতে কৃত সঠিক ইজতিহাদের মাধ্যমে। সেকারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অধিকাংশের মতামতকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং বলেছেন,

'আমি হচ্ছি আল্লাহ্'র বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল এবং কখনোই তার আদেশ অমান্য করব না।'

এর কারণ হল, এই শান্তিচুক্তি ছিল আল্লাহ্'র দেয়া একটি বিধান। এজন্য এক্ষেত্রে জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয়নি। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, আহ্কাম শারী'আহ্ গ্রহণ করা, কোন শারী'আহ্ বিধানকে কার্যকর করা এবং শারী'আহ্ বিধিবিধান ও আইনকানুন জারি করা একমাত্র খলীফার আবশ্যিক ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত, যে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে, হুকুম শারী'আহ্ গ্রহণ বা কোন আইনকানুন জারি করার পূর্বে উম্মাহ্'র মতামত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য খলীফা চাইলে এ বিষয়সমূহকে উম্মাহ্'র কাউন্সিলে উপস্থাপন করতে পারেন। যেমনটি হয়েছিল, ইরাকের যুদ্ধলব্ধ ভূমিসমূহ বন্টনের বিষয়ে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে উমর (রা.) মুসলিমদের মতামত জানার জন্য তাদের কাছে এ বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে সাহাবীরা (রা.) তাঁকে বাঁধা দেননি। মুসলিমরা তাঁকে এ ভূমি মুজাহিদদের (যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে) মধ্যে বন্টন করে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু, উমর তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ অনুযায়ী এ ভূমি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন না করে উক্ত জনপদের বাসিন্দাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন, বিনিময়ে তাদেরকে মাথাপিছু জিযিয়া প্রদানের পাশাপাশি উক্ত জমির উপর খারাজ দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাহাবীদের উপস্থিতিতে উমরের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যেখানে তাঁরা কেউ তাঁকে এ ব্যাপারে বাঁধা দেননি, প্রমাণ করে যে এ ব্যাপারে সাহাবীদের ইজমা ছিল। এটাই প্রমাণ করে যে, খলীফার এ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আছে।

এছাড়া, কোন বিষয়ে শারী'আহ্ আইন গ্রহণ সম্পর্কে, কিংবা, রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত উসুলের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে আইন গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে খলীফার সাথে উম্মাহ'র কাউন্সিলের কোনপ্রকার মতবিরোধের সৃষ্টি হলে তা মাহকামাতুল মাযালিম এর নিকট পেশ করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে, মাহকামাতুল মাযালিম এর বিচারক খলীফা কর্তৃক গৃহীত আইনটি শারী'আহ্ দলিলের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করবেন; অর্থাৎ, এর কি শারী'আহ্ দলিল-প্রমাণ আছে কিনা, কিংবা, যে দলিল তিনি উপস্থাপন করেছেন তা ঐ বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা যাচাই-বাছাই করবেন। সুতরাং, খলীফা গৃহীত কোন হুকুমের বৈধতার ব্যাপারে যদি তার সাথে উম্মাহ্ কাউন্সিলের বেশীর ভাগ সদস্যের মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়, তবে এ বিবাদ নিরসনের দায়িত্ব অবশ্যই মাহকামাতুল মাযালিম এর হাতে ন্যস্ত করতে হবে। কারণ, এটা তার বিশেষত্ব বা এ সমস্যা সমাধানে তিনিই একমাত্র যোগ্যব্যক্তি এবং এ ব্যাপারে মাযালিম এর বিচারকের রায় গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হবে।

কাউন্সিলের অমুসলিম সদস্যদের খলীফা যে সমস্ত শারী'আহ্ আইনকানুন গ্রহণ করতে চান, সে ব্যাপারে পর্যালোচনা করা বা মতামত দেয়ার কোন অধিকার নেই। কারণ, তারা ইসলামী মতাদর্শে বিশ্বাস করে না। তাদের অধিকার শুধুমাত্র

শাসকের মাধ্যমে তাদের উপর আপতিত জুলুম-নির্যাতন বা তাদের উপর শারী'আহ্ আইন অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: এটি শাসককে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করার সাথে সম্পৃক্ত সার্বজনীন শারী'আহ্ দলিল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ইবনে উমর (রা.) থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

'তোমাদের উপর এমন আমীর আসবেন তারা তোমাদের যা করতে বলবেন তা নিজেরা করবেন না। যে তাদের মিথ্যাকে বিশ্বাস করবে এবং তাদের জুলুমে সহায়তা করবে তারা আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের দলভুক্ত নই এবং সে ব্যক্তি আমার সাথে হাউজে কাউসারে অংশ নেবে না।' *(আল মুনদিরী, আল তারগীব ওয়াল তারহীব, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২০৩)*

আবু সা'ঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

'অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে হক্ব কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।' *(সূনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৩৪৪)*

আল হাকীম, আল জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেন,

'শহীদদের সর্দার হল হামযাহ্ বিন আবদুল মুত্তালিব এবং সেই ব্যক্তি যে অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে (হক্ব কাজের) আদেশ করলো এবং (মন্দ কাজ থেকে) নিষেধ করলো এবং ঐ শাসক তাকে হত্যা করল। *(আল মুনদিরী, আল তারগীব ওয়াল তারহীব, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৯)*

উম্মে সালামাহ্ (রা.) হতে মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে,

"এমন কিছু আমীর আসবে যাদের কিছু কাজের ব্যাপারে তোমরা একমত পোষণ করবে এবং কিছু কাজ প্রত্যাখান করবে। সুতরাং, তাদের ভাল কাজের ব্যাপারে যারা ঐক্যমত পোষণ করবে তারা গুনাহ থেকে মুক্তি পেল; যে মন্দ কাজকে প্রত্যাখান করল সেও নিরাপদ হয়ে গেল। কিন্তু, তার কী হল যে (মন্দ কাজকে) গ্রহণ করল, আর তা প্রত্যাখান করল না? (অর্থাৎ, সে নিরাপদ নয়)।"

এ দলিলগুলো সার্বজনীন এবং এখানে, শারী'আহ্ আইন অনুযায়ী শাসকদের জবাবদিহি করার কথা বলা হয়েছে। এই জবাবদিহিতা শাসকদের যে কোন কাজের ব্যাপারেই হতে পারে। উম্মাহ্'র কাউন্সিল কর্তৃক এই জবাবদিহিতা খলীফা, তার সহকারীবৃন্দ, গভর্ণর বা আমীলের যে কোন কাজ, যা কিনা শারী'আহ্ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক, কিংবা, মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকারক, কিংবা, তাদের ভুল সিদ্ধান্ত অথবা, জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের দিক থেকে তাদের প্রতি অবিচারসুলভ, ইত্যাদি। এ জবাবদিহিতার ব্যাপারে খলীফাকে অবশ্যই ইতিবাচক সাড়া দিতে হবে এবং তার বক্তব্য ও কাজের স্বপক্ষে উপযুক্ত দলিল-প্রমাণ হাজির করতে হবে, যেন কাউন্সিল তার সততা, যোগ্যতা ও আন্তরিকতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে। আর, যদি কাউন্সিলের কাছে তার বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও উপস্থাপিত দলিল-প্রমাণ গৃহীত না হয়, তবে বিষয়টি ভালভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। যদি বিষয়টি এমন হয়, যে ব্যাপারে কাউন্সিলের অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করা খলীফার জন্য বাধ্যতামূলক যেমনটি বলা হয়েছে **১**(ক) অনুচ্ছেদে তবে, খলীফাকে কাউন্সিলের মতামত গ্রহণ করতে হবে। যেমন: পূর্বে বর্ণিত বিদ্যালয়ের উদাহরণ থেকে বলা যায় যে, যদি খলীফাকে উক্ত গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা হয়, তবে তার জন্য এ জবাবদিহিতা বাধ্যতামূলক। আর, যদি জবাবদিহিতা হয় বিদ্যালয়ের জন্য তার বাছাইকৃত নকশা বিষয়ক, তবে এক্ষেত্রে এ জবাবদিহিতা তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে না।

আর, যারা তাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করবেন তারা যদি কোন শারী'আহ্ আইনের ব্যাপারে আইনী দৃষ্টিকোন থেকে তার বিরোধিতা করে, তবে কাউন্সিলকে অবশ্যই অন্যায় আচরণ সংক্রান্ত আদালত বা *মাহকামাতুল মাযালিম* এর কাছে বিষয়টি ন্যস্ত করতে হবে। কারণ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুর'আনে বলেন:

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্'র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে উপর যারা কর্তৃত্বশীল তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।' **[সূরা নিসা : ৫৯]**

অর্থাৎ, মুসলিমরা যদি কোন বিষয়ে কর্তৃত্বশীল কারও সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে তা অবশ্যই আল্লাহ্ ও রাসূলের কাছে সমর্পণ করতে হবে এবং এটাই শারী'আহ্'র নির্দেশ। আল্লাহ্ ও রাসূলের কাছে সমর্পণ করার অর্থ হল বিচারব্যবস্থার কাছে সমর্পণ করা, অর্থাৎ, *মাহকামাতুল মাযালিম* এর কাছে বিষয়টি ন্যস্ত করা। কারণ, এই সমস্ত ক্ষেত্রে একমাত্র আদালতেরই আবশ্যিক ক্ষমতা আছে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: এ অনুচ্ছেদের দলিল হিসাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর বাহরাইনে নিযুক্ত আমীল, আল 'আলা ইবনে আল-হাদরামীকে অপসারণ করেছিলেন। কারণ, আবদ ক্বায়েস এর প্রতিনিধিগণ তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। মুহম্মদ বিন উমরের বরাত দিয়ে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন যে,

"আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) পত্র মারফত আল 'আলা ইবন আল-হাদরামীকে 'আবদ ক্বায়েসের বিশজন প্রতিনিধিসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হবার নির্দেশ দিলেন। তিনি বিশজন লোকসহ তাঁর কাছে হাজির হলেন, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন আউফ আল-আসহাজ্জ; এবং তারপরে, এ দলের দায়িত্বে ছিল আল-মুনদির বিন সাওয়া। প্রতিনিধিবৃন্দ রাসূল (সাঃ)এর কাছে আল 'আলা হাদরামীর ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি (সাঃ) তাকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেন এবং তার স্থলে ইবান বিন সাইদ বিন আল-আস'কে নিযুক্ত করেন এবং তাকে বলেন: "আবদ ক্বায়েসের দেখাশোনা করবে এবং তাদের নেতৃস্থানীয়দের সম্মান করবে।"

এছাড়া, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) শুধুমাত্র জনগণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি উলাই'য়াহ্ থেকে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে অপসারণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "আমি তাকে তার অযোগ্যতা বা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অপসারণ করিনি।" এ সমস্ত উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, ওয়ালী বা আমীলদের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি বা উষ্মা প্রকাশের অধিকার উলাই'য়াহ্'র জনগণের রয়েছে এবং এক্ষেত্রে, খলীফাকে অবশ্যই তাদের অপসারণ করতে হবে। একইভাবে, বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে উম্মাহ্'র কাউন্সিলেরও ওয়ালী ও আমীলের ব্যাপারে তাদের অসন্তুষ্টি বা উষ্মা প্রকাশের অধিকার রয়েছে; এবং এ অভিযোগ যদি উলাই'য়াহ্ কাউন্সিল বা উম্মাহ্'র কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যদের পক্ষ থেকে আসে তাহলে খলীফাকে তৎক্ষণাৎ তাদের অপসারণ করতে হবে। আর, যদি এমন হয় যে, দুটি কাউন্সিলের মধ্যে এ বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে, তবে খলীফা উলাই'য়াহ্ কাউন্সিলের মতামতকে প্রাধান্য দেবেন। কারণ, ওয়ালী ও আমীলদের কার্য সম্পর্কে এ কাউন্সিল উম্মাহ্'র কাউন্সিলের চাইতে অনেক বেশী সচেতন ও অবগত।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: এখানে দু'টি ইস্যু রয়েছে: প্রথমটি হল মনোনীতদের তালিকা সংক্ষেপন এবং দ্বিতীয়ত, এই তালিকা সংক্ষিপ্ত করে প্রথমে ছয় এবং পরে দুইজনে নামিয়ে আনা।

প্রথম ইস্যুর ক্ষেত্রে, খোলাফায়ে রাশেদীনদের (রা.) ধারা অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই তালিকা সংক্ষেপনের দায়িত্ব সরাসরি মুসলিমদের প্রতিনিধিরা পালন করতেন অথবা তাদের পক্ষ থেকে খলীফাকে এ দায়িত্ব পালনে অনুরোধ করা হত। বনু সাঈদার প্রাঙ্গনে মনোনীতরা ছিলেন আবু বকর (রা.), উমর (রা.), আবু উবাইদা (রা.) এবং সা'দ ইবনে উবাইদা (রা.)। তাঁরা সকলের কাছেই পরীক্ষিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যেই মনোনয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। পুরো প্রাঙ্গনভর্তি লোকের সামনে এ মনোনয়ন পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে সাহাবীগণও এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে, বাই'আতের মাধ্যমে তাঁরা আবু বকরকে খলীফা হিসাবে নির্বাচিত করেন।

আবু বকরের শাসনামলের শেষের দিকে তিনি তিনমাস মুসলিমদের সাথে আলোচনা করেন খলীফার পদের ব্যাপারে। আলোচনার পর তারা খলীফা হিসাবে উমরকে মনোনীত করে অর্থাৎ, এক্ষেত্রে মনোনয়ন মাত্র একজন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়।

তালিকা সংক্ষেপনের বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় উমর (রা.) ছুরিকাঘাতে আহত হবার পর। বস্তুতঃ তখন মনোনয়ন একটি অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় মুসলিমরা তাঁর কাছে যায় এবং তাদের জন্য প্রার্থী মনোনীত করতে অনুরোধ জানায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অন্যদেরকে বঞ্চিত করে তালিকা ৬ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন; এবং এ ব্যাপারে জোরালো নির্দেশ দেন, যে ব্যাপারটি সকলের জানা আছে। এছাড়া, আলী (রা) এর মনোনয়নের সময় তিনি একমাত্র প্রার্থী ছিলেন। আর কেউ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সেকারণে তালিকা সংক্ষেপনের কোন প্রয়োজন ছিল না।

তালিকা সংক্ষেপনের এই প্রক্রিয়াটি সাধারণতঃ মুসলিমদের জনসমাবেশের সামনে সংঘটিত হত; যদি বিষয়টির বিরোধিতা করা হত, এর অর্থ হত বিষয়টি আসলে অনুমোদিত নয়। কারণ, এর মাধ্যমে (তালিকা সংক্ষেপণ) আসলে অন্যদের

মনোনীত হবার অধিকার রহিত হয়ে যায়। এর অর্থ হচ্ছে খলীফা পদপ্রার্থীদের তালিকা সংক্ষেপণের বিষয়টি সাহাবীদের ইজমা (ঐক্যমত)। সুতরাং, উম্মাহ্'র অর্থাৎ, প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য তালিকা সংক্ষেপণের কাজ অনুমোদিত; এ সংক্ষিপ্তকরণ প্রক্রিয়া সরাসরি উম্মাহ্ অর্থাৎ, তার প্রতিনিধি কর্তৃক সংঘটিত হোক বা, তাদের পক্ষ থেকে বিদায়ী খলীফাকে এ অধিকার প্রদানের মাধ্যমেই হোক।

এটা গেল তালিকা সংক্ষেপণ সংক্রান্ত বিষয়। আর, প্রার্থীদের তালিকা প্রথমে ছয়জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার বিষয়টি নেয়া হয়েছে উমর (রা.) এর কর্মকান্ড থেকে এবং পরবর্তীতে, ছয়জন থেকে দুইজনে নামিয়ে নিয়ে আসার বিষয়টি নেয়া হয়েছে আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) এর কর্মকান্ড থেকে। এছাড়া, এটা একইসাথে অধিকাংশ মুসলিম ভোটারের বাই'আতের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার যথার্থতা প্রমাণ করে। কারণ, যদি প্রার্থী দু'য়ের অধিক হত তাহলে হয়ত বিজয়ী প্রার্থী শতকরা ৩০ ভাগ ভোট পেত; যা কিনা অধিকাংশের চাইতে কম। আর যদি প্রার্থী দুইয়ের বেশী না হয় সেক্ষেত্রে বিজয়ী প্রার্থী সবসময়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটেই নির্বাচিত হবে।

উম্মাহ্ কাউন্সিলের মাধ্যমে ছয়জন এবং পরবর্তীতে দুইজন বাছাই করার ক্ষেত্রে, *মাহকামাতুল মাযালিম*'কে এটা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রার্থীগণ খলীফা পদে নিযুক্ত হবার সকল শর্তাবলী পুরণ করেছেন। কারণ, উম্মাহ্ কাউন্সিল এদের মধ্য হতেই খলীফা নির্বাচনের জন্য তালিকা সংক্ষেপণ করবে। অন্য ভাবে বলা যায় যে, প্রার্থীদের অবশ্যই নিয়োগচুক্তির সকল শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। সুতরাং, *মাহকামাতুল মাযালিম* চুক্তির শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ ব্যক্তিদের তালিকা থেকে বাদ দেবেন। এরপর, *মাহকামাতুল মাযালিম* প্রদত্ত তালিকার ভিত্তিতেই উম্মাহ্ কাউন্সিল প্রার্থীদের তালিকা সংক্ষিপ্ত করবেন।

নির্বিঘ্নে মতামত উপস্থাপন ও প্রকাশ করার অধিকার

উম্মাহ্ কাউন্সিলের প্রতিটি সদস্যের শারী'আহ্ প্রদত্ত সীমার মধ্যে থেকে নির্বিঘ্নে ও কোনপ্রকার চাপ ছাড়াই তার নিজস্ব মতামত জোরালো ভাবে উপস্থাপন করার অধিকার রয়েছে। কাউন্সিলের সদস্যরা হলেন উম্মাহ্'র মতামত উপস্থাপনের জন্য তাদের পক্ষ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি। সুতরাং, তাদের কাজ হল খলীফা, তার সহকারীবৃন্দ এবং ওয়ালী ও আমীল সহ রাষ্ট্রের সকল শাসক কিংবা, রাষ্ট্রের যে কোন বিভাগের যে কোন কর্মচারী ও জনপ্রশাসকদের কার্যাবলী সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করে তাদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা, উপদেশ প্রদান করা, তাদের কাজের ব্যাপারে মতামত উপস্থাপন করা। তারা এ কাজগুলো করবেন মুসলিমদের পক্ষ থেকে যাদের উপর সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে বাঁধা দেয়া এবং শাসকদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করাকে আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

'*তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মাহ্, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাঁধা দেবে।*' **[সূরা আলি ইমরান : ১১০]**

এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

'*তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শাসন-কর্তৃত্ব দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।*' **[সূরা হাজ্জ : ৪১]**

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ ব্যাপারে আরও বলেন,

'*আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকবে যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে আর অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং তারাই হবে সফলকাম।*' **[সূরা আলি ইমরান : ১০৪]**

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। যেমনঃ একটি হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"ঐ সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ) করবে। অন্যথায় অচিরেই তোমাদের উপর আল্লাহ্'র শাস্তি আরোপিত হবে। অতঃপর তোমরা তাঁকে ডাকবে কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না।' এটি হুযাইফার বরাত দিয়ে আহমাদ বর্ণনা করেন। *(সূনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৩৩৬)*

তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন তার হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে। তার এই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন তার মুখ দ্বারা তা প্রতিহত করে। আর. তার যদি এ সামর্থ্যও না থাকে সে যেন তার অন্তর দ্বারা তা করে (ঘৃণার মাধ্যমে); আর, এটা হলো দুর্বলতম ঈমান।" *(এ হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন আবু সা'ইদ এর সূত্রে, সহীহ্, হাদীস নং-১৭৫)*

এইসব আয়াত ও হাদীস মুসলিমদের সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করে। শাসককে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করাও এ কাজের অর্ন্তভুক্ত। কিছু কিছু হাদীসে সুনির্দিষ্ট ভাবে শাসকদের জবাবদিহি করার কথা বলা হয়েছে। আবু সা'দ এর বরাত দিয়ে উম্মে আতিয়া (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

'অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে হক্ব কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।' *(সূনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৩৪৪)*

এ হাদীসে এ কাজকে সর্বোত্তম জিহাদ হিসাবে বিবেচনা করে, শাসকের ভৎর্সনা বা সমালোচনা করা এবং তার মুখের উপর সত্য কথা উচ্চারণকে বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ ধরনের জিহাদকে প্রচন্ডভাবে উদ্ধুদ্ধ করেছেন এবং মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত আকাঙ্খিত করেছেন, যদিও এতে জীবন নাশের ঝুঁকি থাকে। ইতোমধ্যে বর্ণিত একটি সহীহ্ হাদীসে নবী (সাঃ) বলেছেন,

"শহীদদের সর্দার হামযাহ্ এবং ঐ ব্যক্তি, যে অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে (উক্ত শাসককে) হক্ব কথার উপদেশ দেয় এবং (ঐ শাসক) তাকে হত্যা করে।" *(আল মুনদিরী, আল-তারগীব ওয়াল তারতীব, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৯)*

যখন সাহাবাগণ (আল্লাহ্ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন) হুদাইবিয়ার শান্তিচুক্তির ব্যাপারে আল্লাহ্'র রাসূলের প্রচন্ড বিরোধিতা করেন, তখন তিনি (সাঃ) তাঁদের এ কাজকে তিরস্কার বা ভৎর্সনা করেননি। বরং, তিনি (সাঃ) শুধুমাত্র তাঁদের মতামতকে প্রত্যাখান করেছিলেন এবং শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা এসেছিল, যেখানে তাঁদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। তিনি (সাঃ) সাহাবীদের এজন্য ভৎর্সনা করেছিলেন যে, তাঁরা আদেশ মান্য করেনি যখন তাঁরা কুরবানীর জন্য রাখা উটগুলোকে কুরবানী করেনি, তাঁদের মাথা মুন্ডন করেনি এবং এহ্রাম ভঙ্গ করেনি। এছাড়া, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাবাব বিন মুনযির (রা.) কে বদরের যুদ্ধে ভৎর্সনা করেননি যখন তিনি নবী (সাঃ) এর সাথে তাবু স্থাপনের অবস্থান নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন, বরং তিনি (সাঃ) তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেছিলেন।

এছাড়া, অধিকাংশের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কুরাইশদের সাথে মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করেছেন, যদিও এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব মতামত ছিল ভিন্ন। এ সমস্ত ক্ষেত্রেই রাসূল (সাঃ) সকলের অভিযোগ শুনেছেন এবং পরে, তাঁর নিজস্ব মতামত দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনদের শাসনামলেও সাহাবীগণ (রা.) এই ধারা অব্যাহত রাখেন। এজন্য তাঁরাও কাউকে ভৎর্সনা করেননি। তাঁরা উমরকে (রা.) মিম্বরে দাঁড়ানো অবস্থায় ইয়েমেনী কাপড়ের বন্টন সম্পর্কে জবাবদিহি করেছিলেন। একজন নারী তাঁকে (রা.) চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, কারণ উমর (রা.) মোহরানা বৃদ্ধির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন এবং সাহাবীরাও (রা.) ইরাক বিজয়ের পর ইরাকের ভূমি বন্টনের ব্যাপারে উমরের (রা.) সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। বিশেষ করে, বিলাল (রা.) ও আল যুবায়ের (রা.) বিরোধিতার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি (রা.) তাঁদের (রা.) সাথে বিতর্ক করতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর (রা.) মতামত সাহাবীদের (রা.) বুঝাতে পারতেন ততক্ষণ আলোচনা চালিয়ে যেতেন।

সুতরাং, বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহ্'র প্রতিনিধি হিসেবে উম্মাহ্ কাউন্সিলের সদস্য কোনপ্রকার বাঁধা বা চাপ ব্যতীত তার ইচ্ছানুযায়ী মতপ্রকাশের অধিকার সংরক্ষণ করেন। তার রয়েছে খলীফা, **মু'ওয়ায়ীন** (খলীফার সহকারীবৃন্দ), ওয়ালী, আমীল ও জনপ্রশাসকদের জবাবদিহি করার অধিকার। এরা সকলেই কাউন্সিল সদস্যদের কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত জবাবদিহি করতে বাধ্য যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শারী'আহ্ আইনের সীমার মধ্যে এ কার্য সম্পাদন করেন এবং তাদের মতামত উপস্থাপন করেন।

উম্মাহ্ কাউন্সিলের অমুসলিম সদস্যগণও শারী'আহ্ নির্ধারিত সীমার মধ্যে নির্বিঘ্ন ও চাপমুক্ত অবস্থায় তাদের উপর শাসক কর্তৃক সংঘটিত সকল জুলুম-নির্যাতনের ব্যাপারে মতামত তুলে ধরার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

রাষ্ট্রের পতাকা ও ব্যানার

ইসলামী রাষ্ট্রের পতাকা (*আল-ওয়িয়্যাহ্)* ও ব্যানার (*রাইয়াত*) থাকবে যা নেয়া হয়েছে মদিনায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের উদাহরণ থেকে। এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপঃ

১. ভাষাগতভাবে পতাকা ও ব্যানারকে *'আলম* বলা হয়। *আল কামুস আল মুহীতে* উল্লেখিত আছে যে, মূলতঃ *আল-রাইয়া* অর্থ হল *আল-আলম*, যার বহুবচন হল *রাইয়াত*। এছাড়া, *আল-লিওয়া* শব্দমূল থেকে *আল-আলম* শব্দটি এসেছে যার বহুবচন হল *আল-ওয়িয়্যাহ্*। এর পাশাপাশি এইসব প্রতিটি শব্দের শারী'আহ্ নির্ধারিত অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছেঃ

- পতাকা *(লিওয়া)* হবে সাদা, যেখানে কাল অক্ষরে লেখা থাকবে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদ উর রাসূলুল্লাহ্'*। এটা সেনাবাহিনীর আমীর বা নেতার সাথে বাঁধা থাকবে। এটা তার অবস্থানের নিদর্শন হিসেবে থাকবে এবং এটি তার সাথে সাথে যাবে। এ বিষয়ে দলিল হল, মক্কাবিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি সাদা পতাকা উড়িয়েছিলেন। এ হাদীসটি জাবিরের সূত্রে ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া, আন-নাসায়ী আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উসামা বিন যায়েদকে সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন তখন তিনি নিজ হাতে উসামার পতাকা বেঁধে দেন।

- আর, ব্যানার (*রাইয়া*) হবে কাল যাতে সাদা অক্ষরে লেখা থাকবে *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদ উর রাসূলুল্লাহ্'*। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের আমীরগণ এটা বহন করবেন (রেজিমেন্ট, ডিটাচমেন্ট এবং অন্যান্য সামরিক ইউনিটসমূহ)। এ বিষয়ে দলিল হল, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন খায়বারের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তখন ঘোষণা করেছিলেনঃ **"আগামীকাল আমি এমন একজনকে রাইয়া প্রদান করবো যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং তারপর তিনি এটি আলীকে দিলেন।"** এই হাদীসের ব্যাপারে সকলের ঐক্যমত আছে (*মুত্তাফিকুন 'আলাইহি*)। তখন আলীকে একটি ডিভিশন বা রেজিমেন্টর নেতা হিসাবে ধরা হয়েছিল। এছাড়া, আল-হারিছ বিন হাস্‌সান বিন আল-বকরী বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, **"আমরা মদিনাতে এলাম এবং রাসূল (সাঃ) কে মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখলাম, যখন বিলাল তাঁর সামনে তলোয়ার পরিহিত অবস্থায় দন্ডায়মান ছিল। রাসূল (সাঃ) এর সামনে কিছু কাল পতাকা ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এগুলো কিসের পতাকা?" তারা বলল, "আমর ইবনুল 'আস এইমাত্র অভিযান থেকে এসেছেন।" "সেখানে কিছু কাল পতাকা ছিল" –** একথাটির অর্থ হল, সেনাবাহিনী অনেক পতাকা বহন করছিল, যদিও এর নেতৃত্বে ছিল একজন, যিনি ছিলেন আমর ইবনুল 'আস। এটা নির্দেশ করে যে, সেনাবাহিনীর একটি মাত্র পতাকা (*ইলওয়া*) থাকবে, কিন্তু, ব্যানার অনেক থাকতে পারে। সুতরাং, পতাকা *(লিওয়া)* হল সেনাবাহিনী প্রধানের চিহ্ন (*'আলম*) বা প্রতীক; আর, ব্যানার (*রাইয়া*) হল সৈন্যদলের প্রতীক (*'আলম*)।

২. পতাকা *(লিওয়া)* সেনাবাহিনীর আমীরের সাথে বাঁধা থাকবে – যা সেনাপ্রধানের প্রধান কার্যালয়ের প্রতীক হিসাবে নির্দেশিত হবে। তবে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের আমীর, হোক তিনি সেনাবাহিনীর আমীর অথবা তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত কেউ, তাকে যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য ব্যানার (*রাইয়া*) প্রদান করা হবে। একারণে ব্যানারকে (*রাইয়া*) যুদ্ধের জননী বলা হয়, কারণ যুদ্ধরত নেতাগণ যুদ্ধের ময়দানে এটি বহন করে থাকে।

   সুতরাং, প্রকৃত অর্থে যখন যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তখন যুদ্ধের প্রতিটি আমীর এর জন্য একটি করে ব্যানার থাকবে – যার প্রচলন অতীতে ছিল। ব্যানারকে উচ্চে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেতাদের শক্তিমত্তা প্রকাশিত হত। যুদ্ধের ঐতিহ্য অনুসারে এ বিষয়টিকে একটি প্রশাসনিক নির্দেশ হিসাবে পালন করা হত ।

   আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) জা'ফর, যায়িদ ও ইবন রুওয়াহা'র মৃত্যুসংবাদ সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে ফিরে আসার আগেই ঘোষণা করেছিলেনঃ

“যায়িদ ব্যানার (রাইয়া) তুলে নিল, এবং নিহত হল; এবং তারপর, জা’ফর তা তুলে নিল এবং সেও নিহত হল। এবং তারপর, ইবন রুওয়াহা তা নিল এবং সেও নিহত হল।” *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩৫৭৫)*

এছাড়া, যুদ্ধের সময় যদি যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে খলীফা থাকেন, তবে পতাকা *(লিওয়া)* ও ব্যানার *(রাইয়া)* দু’টোই বহন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সীরাত ইবনে হিশামে *গাজওয়া বদর* (বদরের যুদ্ধ) সম্পর্কে কিছু বর্ণনা আছে যে, সেখানে পতাকা ও ব্যানার দু’টোই ছিল।

আর, যুদ্ধ শেষে শান্তির সময় সাধারণতঃ ব্যানারগুলোকে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট, রেজিমেন্ট, ডিভিশন এবং ব্যাটেলিয়ানের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হয় এবং তারা এগুলো বহন করে, যা কিনা আল-হারিছ ইবন হাস্‌সান আল-বকরী বর্ণিত হাদীসে আমর ইবনুল ’আস এর বাহিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৩. ইসলামে খলীফা হলেন সেনাবাহিনীর প্রধান। এজন্য, আইনত পতাকা তার কার্যালয়ের উপরে উত্তোলিত থাকবে; অর্থাৎ, তার বাসভবনের উপরে। কারণ, এ পতাকা সেনাপ্রধানের সাথে বাঁধা থাকবে। এছাড়া, প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খলীফার বাসভবনের উপর ব্যানার উত্তোলন করাও অনুমোদিত; কারণ, খলীফা রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানেরও প্রধান। এছাড়া, রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বিভাগের ও স্থাপনার ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র ব্যানার উত্তোলিত হবে। কারণ, পতাকা শুধুমাত্র সেনাপ্রধানের প্রতীক, যা তার অবস্থানকে নির্দেশ করে।

৪. পতাকা সাধারণতঃ সূচালো লাঠির শেষ মাথায় বাঁধা অবস্থায় থাকবে। সেনাবাহিনীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এটি সেনাবাহিনীর আমীরকে দেয়া হবে। সুতরাং, এটা বাঁধা থাকবে প্রথম বাহিনী, দ্বিতীয় বাহিনী কিংবা, আল-শামের বাহিনী, ইরাকের বাহিনী, আলিপ্পোর বাহিনী অথবা বৈরুতের বাহিনী, ইত্যাদি বাহিনীসমূহের প্রধানদের সাথে।

মূলতঃ বর্শার শেষ মাথায় পতাকা প্যাঁচানো অবস্থায় থাকবে এবং প্রয়োজন ব্যতীত এটি খোলা হবে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, খলীফা বাসভবনের উপর এটি উত্তোলিত থাকবে তার গুরুত্ব বা মর্যাদা বোঝানোর খাতিরে। একই কথা প্রযোজ্য হবে শান্তির সময় সেনাবাহিনীর অন্যান্য আমীরদের অবস্থানের ক্ষেত্রে, যেন উম্মাহ্ তাদের সেনাবাহিনীর শৌর্যবীর্য ও প্রভাবপ্রতিপত্তি অনুভব করতে পারে। কিন্তু, এ বিষয়টি যদি নিরাপত্তার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, যেমনঃ এর ফলে যদি শত্রুপক্ষ আমীরদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হয়, তবে, মূল নিয়মে ফিরে যেতে হবে; অর্থাৎ, এটি পেঁচানো অবস্থায় থাকবে এবং প্রয়োজন ব্যতীত খোলা হবে না।

ব্যানারের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এটি বাতাসে পত্‌পত্ করে উড়ার জন্য মুক্ত রাখা হবে, যেভাবে এখন পতাকা ব্যবহার করা হয়। এজন্য এটিকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের উপরে উত্তোলন করা হবে।

সংক্ষেপে পুরো বিষয়টিকে এভাবে বলা যায়ঃ

প্রথমতঃ সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রেঃ

১. প্রকৃত যুদ্ধের সময় পতাকা সেনাবাহিনীর আমীরের সাথে সংযুক্ত থাকবে। মূলনীতি অনুযায়ী, সাধারণতঃ এটি খোলা হবে না বরং বর্শার মাথায় প্যাঁচানো অবস্থায় থাকবে। নিরাপত্তা সম্পর্কিত ইস্যুগুলো বিবেচনায় রেখে এটিকে প্রসারিত করা যেতে পারে। যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধক্ষেত্রের আমীর একটি ব্যানার বহন করবে। যদি খলীফা রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন তাহলে ব্যানার এর সাথে পতাকাও বহন করা যাবে।

২. শান্তির সময় সেনাবাহিনীর আমীরদের সাথে পতাকা প্যাঁচানো অবস্থায় থাকবে। তবে, তারা যেখানে অবস্থান করবেন সেখানে পতাকা উত্তোলন করা যাবে। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ, রেজিমেন্ট, ব্যাটালিয়ন ইত্যাদি ব্যানার উত্তোলন করবে। প্রত্যেক বিভাগ, রেজিমেন্ট, ব্যাটালিয়নের জন্য আবার নির্দিষ্ট ব্যানার থাকতে পারে যেন তাদের প্রশাসনিকভাবে আলাদা করা যায় – যা মূল ব্যানারের সাথে উত্তোলন করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য বিভাগ (departments) ও স্থাপনাগুলোতে ব্যানার উত্তোলন করা হবে; কিন্তু, সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে শুধুমাত্র খলীফার বাসভবনে পতাকা উত্তোলন করা হবে। এছাড়া,

প্রশাসনিক দৃষ্টিকোন থেকে খলীফার বাসভবনে ব্যানারও উত্তোলন করা হবে; কারণ, খলীফা রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানেরও প্রধান। সাধারণ জনগণ শুধুমাত্র তাদের বাসভবন, স্কুল-কলেজ কিংবা, অন্যান্য স্থাপনাসমূহে ব্যানার উত্তোলন করতে পারবে; বিশেষ করে উৎসবের দিনগুলোতে, যেমনঃ ঈদ, বিজয়ের উৎসব ইত্যাদি।

খিলাফত রাষ্ট্রের সঙ্গীত

অন্যান্য জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্র থেকে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্রকে আলাদা করার জন্য বিশেষ কোন শ্লোগাণ বা সঙ্গীত গ্রহণ করা শারী'আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত (*মুবাহ্*) একটি বিষয়। অতীতে মুসলিমদের নির্দিষ্ট শ্লোগাণ ছিল, যা তারা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুউপক্ষকে মুকাবিলা করার সময় ব্যবহার করতো। রাসূল (সাঃ) এর সময়ই এ বিষয়টি প্রচলিত ও অনুমোদিত ছিল। খন্দক ও বনু কুরাইযা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলিমদের শ্লোগাণ ছিল 'হা মীম, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না'। আর, বনু মুসতালিক এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের শ্লোগাণ ছিল 'তোমরা, যারা সাহায্যপ্রাপ্ত, মৃত্যু বহন করে আনো, মৃত্যু বহন করে আনো' ইত্যাদি।

এছাড়া, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি, এগুলো মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমত হিসাবে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য এবং এ বিষয়গুলো দলিল অনুযায়ী ইবাহাহ্ বা মুবাহ (অনুমোদিত) বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং, মানুষ যা চায় বলতে পারে, যা চায় দেখতে পারে কিংবা, কোন বিষয়ে আবেগাপ্লুত হতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কোন শারী'আহ্ দলিল থাকে।

সুতরাং, ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি নির্দিষ্ট শ্লোগাণ বা সঙ্গীত গ্রহণ করা অনুমোদিত, যার মাধ্যমে তারা আবেগাপ্লুত হবে এবং যা দিয়ে তারা অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে নিজেদের পৃথক করবে। অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হবে এবং খলীফা যখন আন্যান্য রাষ্ট্রে সফর করবেন তখন এটি তাকে সঙ্গ দেবে, অর্থাৎ, এ শ্লোগাণটি ব্যবহার করা হবে। এছাড়া, এটি জনগণকে আবেগাপ্লুত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমনঃ সমাবেশ, গণজমায়েত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা, সম্প্রচার কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শ্লোগাণ ব্যবহার করার পদ্ধতির মধ্যে থাকবেঃ ব্যাপক শোরগোল, নাসিক্যের আওয়াজ ব্যবহার করে বা, না করে নিম্নস্বরে বা উচ্চস্বরে কথা বলা, ইত্যাদি; এসবই শারী'আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত। কারণ, অতীতে সাধারণতঃ মুসলিমরা (রাসূলের (সাঃ) সময়েও) বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে তাদের আবেগ প্রকাশের লক্ষ্যে উত্তেজিত ভঙ্গীতে কবিতা আবৃত্তি করতো।

খিলাফত রাষ্ট্রের জন্য একটি শ্লোগাণ বা সঙ্গীত গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনানুসারে এটি ব্যবহার করা হবে; বিশেষ করে খলীফা যখন অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন তখন এটি ব্যবহৃত হবে। এছাড়া, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে উম্মাহ্'র এটি ব্যবহার করবে। আল্লাহ্'র ইচ্ছায় যখন দ্বিতীয়বার নবুয়্যতের আদলে খিলাফত আসবে, তখন রাষ্ট্রের শ্লোগাণ বা সঙ্গীতের ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মনে রাখতে হবেঃ

১. এতে উল্লেখিত থাকবে, রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত সুসংবাদ অনুযায়ী দ্বিতীয়বার খিলাফত ফিরে আসার ভবিষ্যতদ্বাণী পূর্ণ হবার কথা এবং আবারও উকাবের ব্যানার তথা রাসূলু (সাঃ) এর ব্যানার উত্থিত হওয়ার কথা।

২. এতে উল্লেখিত থাকবে, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত সেই সুসংবাদের কথা যে, যখন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন এ পৃথিবী তার সমস্ত সম্পদ উজাড় করে দেবে, আসমান তার সমস্ত রহমত বর্ষিত করবে এবং সমগ্র পৃথিবী জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতনে পরিপূর্ণ হবার পর আবারও ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ হবে।

৩. এতে উল্লেখিত থাকবে, খিলাফত রাষ্ট্রের শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর সমগ্র বিশ্বব্যাপী এর জয়যাত্রা এবং সত্য ও ন্যায়ের আলোকদ্যুতি চর্তূদিকব্যাপী বিস্তারের কথা; বিশেষ করে তিনটি পবিত্র ভূমিতেঃ অর্থাৎ, যে ভূমিগুলোতে মসজিদ-উল-হারাম, মসজিদ-উল-নববী এবং মসজিদ-উল-আক্সা, যেখান থেকে ইহুদীদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করা হবে।

৪. এটি শেষ হবে, এ উম্মাহ্'র পূণরায় শ্রেষ্ঠ উম্মাহ্ হিসাবে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা দিয়ে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দেখতে চেয়েছেন; যেখানে তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন, যিনি তাদের স্বীয় রহমত, ক্ষমা ও করুণার মাধ্যমে জান্নাতুল ফেরদৌস প্রদান করে সম্মানিত করবেন।

৫. এতে অবশ্যই তাকবীর ধ্বনিটি পুনঃ পুনঃ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। কারণ, ইসলাম ও মুসলিমদের জীবনে তাকবীর ধ্বনির রয়েছে বিশেষ প্রভাব। বস্তুতঃ তাকবীরই হচ্ছে সেই ধ্বনি যা মুসলিমদের বিজয় উৎসবে, অবকাশ যাপনের দিনগুলোতে, কিংবা, যে কোন অনুষ্ঠানে কার্যকরীভাবে এবং তাদের মুখ থেকে সবসময় উচ্চারিত হবে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে এই বইয়ের সূচীপত্রে এ রকম একটি সঙ্গীত একদিন সংযুক্ত করা হবে এবং আল্লাহ্’র ইচ্ছায় এর পরিবেশন পদ্ধতিও যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে, ইন্‌শাআল্লাহ্ ।

আমাদের শেষদোয়া হল শুধুই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা করা, যিনি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ও মহান প্রতিপালক।

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ

web: www.khilafat.org
www.hizb-ut-tahrir.info